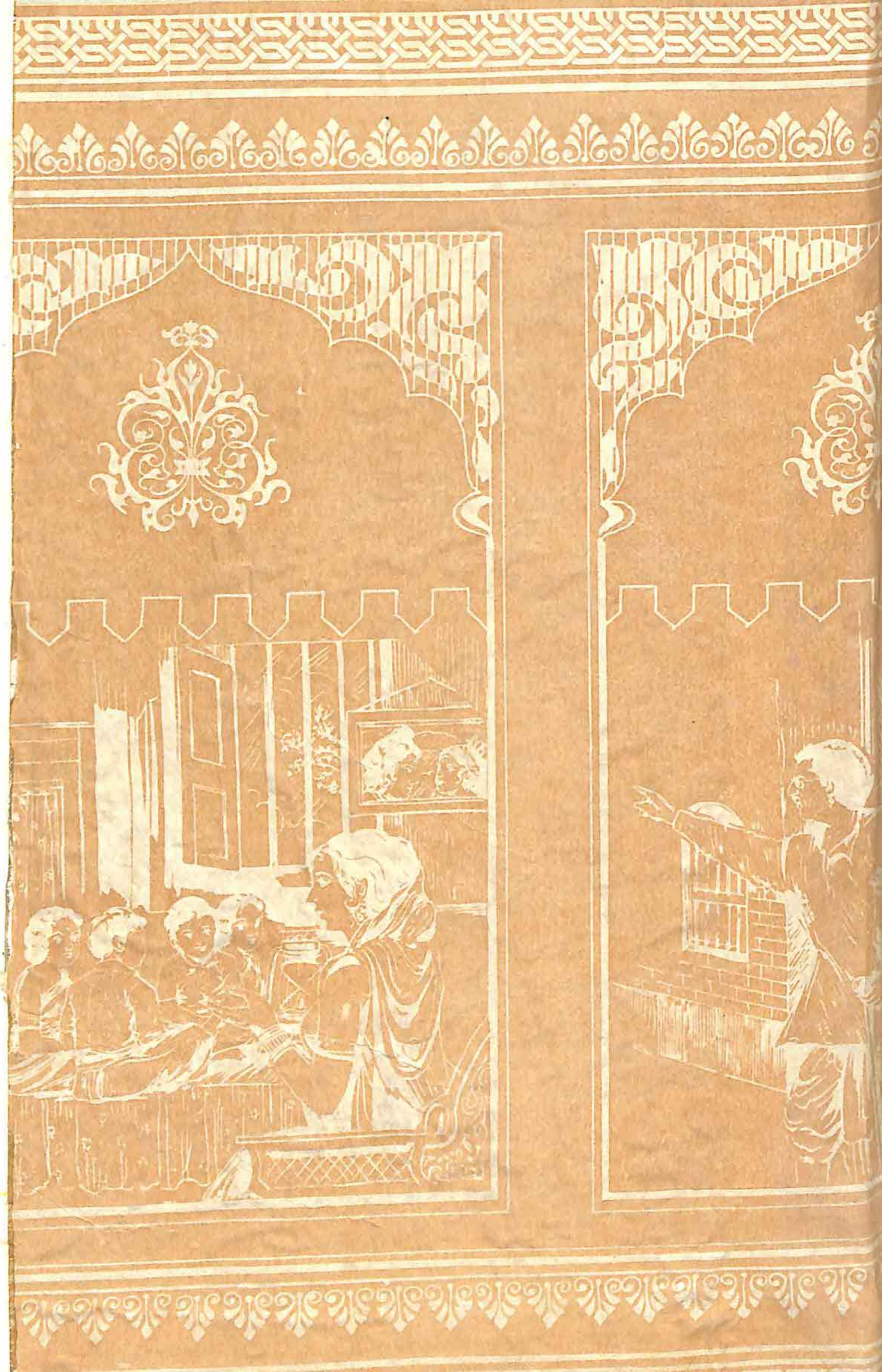
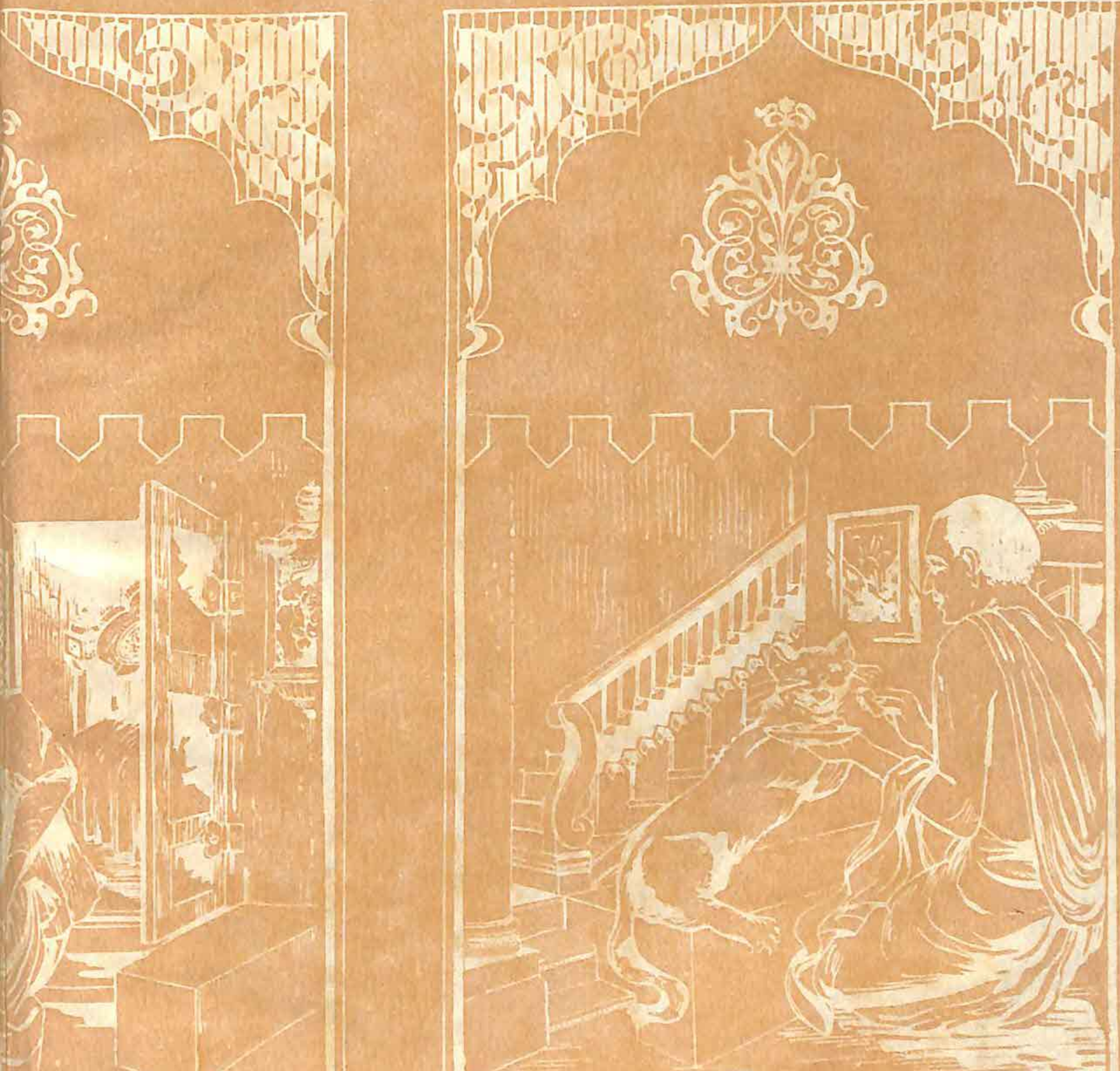
সব সেরা কিশোর গল্প







কিশোর-কিশোরীদের জন্য

৪'৪
৮২৭

সেরা কিশোর গল্প

লেখক-তালিকা :

ত্রৈলোক্যনাথ উপেন্দ্রকিশোর যোগীন্দ্রনাথ সুকুমার রায় রাধারাণী দেবী প্রেমেন্দ্র মিত্র শিবরাম চক্রবর্তী সমরেশ বসু লীলা মজুমদার সতীকান্ত গুহ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ নলিনী দাস সুভাষ মুখোপাধ্যায় গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় শিশির মজুমদার মহাশ্বেতা দেবী অজেয় রায় পূর্ণেন্দু পত্রী নবনীতা দেব সেন ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় দিব্যেন্দু পালিত অরূপরতন ঘোষ দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় প্রণব সেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় শেখর বসু দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায় সুধীন্দ্র সরকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশাপূর্ণা দেবী।

সম্পাদনা :

সুশান্ত সরকার

প্রচ্ছদ :

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : শুভ দোলযাত্রা, ১৩৯৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : বইমেলা ১৯৮৯
প্রকাশক : বুলবুল সাহা
বুলবুল প্রকাশন
৮ বি/১, ট্যামার লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রক : ইমেজ প্রসেস
৩১, ডাঃ ধীরেন সেন সরণি, কলি-৬

মুদ্রক : ডায়নামিক প্রিন্টার্স
২৪এ বাগমারী রোড
কলকাতা-৭০০ ০৫৪

ফটোকম্পোজিং : শ্রীমতী ইন্দিরা ভট্টাচার্য
সুপার কমিউনিকেটরস প্রাঃ লিঃ
১২, বিনয় বাদল দীনেশ বাগ
কলিকাতা-১

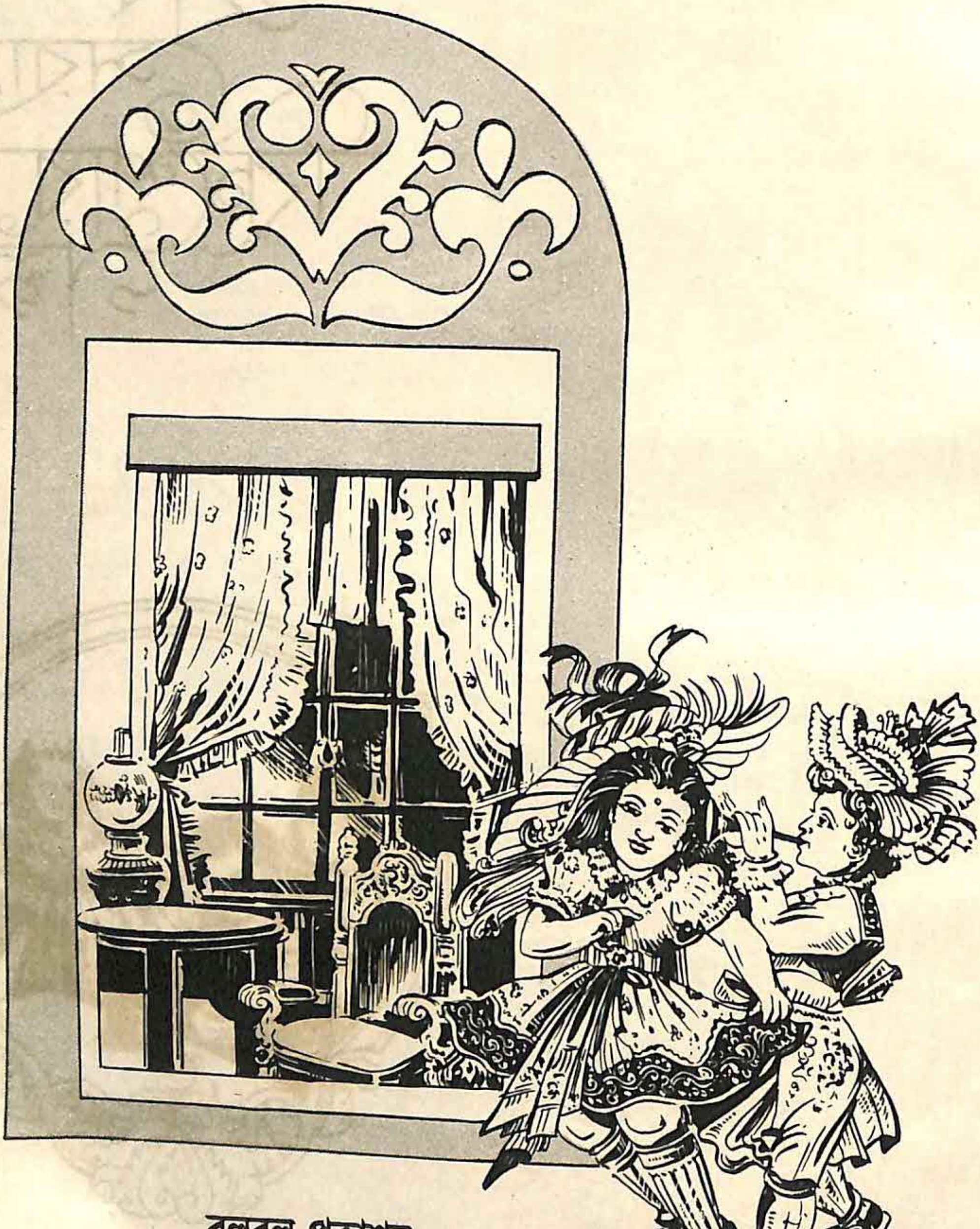
সার্বিক তত্ত্বাবধান
বি· রায়চৌধুরী
কম্পু কলার
৬এ, আশুতোষ শীল লেন, কলি-৬

মূল্য : পঁচিশ টাকা

Acc no. - 15034

সব সেরা কিশোর গল্প





বুলবুল প্রকাশন

৮ বি/১, ট্যামার লেন, কলকাতা-৯

সব সেরা কিশোর গল্প

ছোট বলি ঘৃণা করি রাখি যারে দূরে—
কাল সে উঠিতে পারে সবার উপরে ।
নাহি জানি জীবনের কোন্ পথ দিয়া,
বিধাতা আনেন তারে সুন্দর করিয়া ।
জ্ঞান প্রেম, লভি কত শুভ ইচ্ছা লয়ে,
সে রহে তাঁহারি কাজে চিরমগ্ন হয়ে ।
ফুটন্ত ফুলের মত ফুটিয়া [illegible]
গুণের সৌরভ সেও জগতে ছড়ায় ।

সুকুমার রায়

শ্রীচরণেষু

ছোটোদের ছোটো খিদের মাপে বাংলা ভাষার সুপথ্য যত জমেছে, সে-তুলনায় সুপরিণত সবল মনের ভারি খোরাক এখনো তেমন জোটেনি। এর কারণ—কেউ হয়তো বাঁকা ঠোঁটে বলবেন—আমাদের জাতিগত ছেলেমানুষী এখনো ঘোচেনি ; কিন্তু আমি বলবো এই শৈশবাসিদ্ধি শান্তশীল গৃহস্থ বাঙালির চিত্তবৃত্তিরই অন্যতম প্রকাশ।...এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে সারা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনো-কোনো বুদ্ধি, মহত্তম কোনো-কোনো মন...

বুদ্ধদেব বসু

প্রকাশকের নিবেদন

সুধী,

ত্রৈলোক্যনাথ থেকে শুরু করে প্রথিতযশা ৩৫ জন লেখকের কিশোর গল্পের উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন এটি। বিষয়-বৈচিত্র্যে এ সঙ্কলন অভিনব। এতে যেমন আছে ভূতের গল্প, কল্পবিজ্ঞানের গল্প, তেমনি আছে রূপকথার গল্প, হাসির গল্প, মজার গল্প, গোয়েন্দা-গল্প। আর ঘনাদা, হর্ষবর্ধন, তিনুকাকা, গোগোল এরাও একসঙ্গে এখানে উপস্থিত। আনন্দ দানই এ সঙ্কলনের উদ্দেশ্য। তবে এ থেকে কেউ যদি শিক্ষনীয় কিছু পান অবাক হবো না। কারণ এ বিষয়ে সঙ্কলন প্রস্তুতের সময় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন সম্পাদক। এ বইটি সম্বন্ধে ছোটদের ও বড়দের সমান আগ্রহী করবে।

বাঙলার কিশোর সাহিত্য গর্ব করবার মতো ঘটনা এবং এই কিশোর সাহিত্যকে নিয়ে সঙ্কলন করাটা নতুন কিছু নয়। আসলে আমরা আর পাঁচটা সঙ্কলনের মতো এ সঙ্কলন করতে চাইনি। আমাদের সঙ্কলনের বিশেষত্ব পাঠক মাত্রেরই চোখে পড়বে। পাঠকের প্রতি আমাদের আস্থা আছে। কেবল এটুকুই বলার যে, দু'খণ্ডেই প্রবীণ ও নবীন লেখকবৃন্দ পাশাপাশি থাকবেন। এ ব্যাপারে সম্পাদকের যত্ন আমাদের অবাক করেছে। কৃতজ্ঞ তাঁদের প্রতি—যাঁরা ছাপার কাজে সর্বদা পাশে থেকে সহায়তা করেছেন, তাঁরা হলেন ;—সর্বশ্রী নারায়ণ সেন, মৈনাক চট্টোপাধ্যায়, উত্তম সাহা, শ্যামলকান্তি দাশ, অলক দাস, সুকুমার গুপ্ত, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, হীরালাল দত্তগুপ্ত, পার্থসারথি হোড় ও রঞ্জিত ভট্টাচার্য।

অতি স্বল্প সময়ে দিবারাত্রির পরিশ্রমে সবগুলি ছবি এঁকে বইটির আলঙ্কারিক রূপদান করেছেন বন্ধুবর শিল্পী বিমল পাল। আমি তাঁর কাছেও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমাদের দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ চলছে। কথা মতো পুজোর আগে তা প্রকাশ হবে। এ ধরনের একটি কাজ করতে পেরে প্রকাশক হিসেবে আমি গর্বিত।

বুলবুল সাহা
৩. ২. ৮৮

সম্পাদকের নিবেদন

যারা বয়সে অল্প তাদেরও মনের খোরাক প্রয়োজন। এই প্রয়োজন থেকেই এ জাতীয় সাহিত্যের উৎপত্তি। অবশ্য প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, ছোটরা যে সাহিত্য পড়ে আর পড়তে ভালোবাসে, তা মুখ্যত কি গৌণত ছোটদের জন্য নয়, বড়দের জন্যই লেখা হয়েছিলো। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, আরব্য উপন্যাস, রবিনসন ক্রুশো, গালিভার ইত্যাদির উদাহরণ টেনে 'উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ ছেলেরা আত্মসাৎ ক'রে নেয়,' বলেছেন। তাঁর মন্তব্য, 'এ সবের কোনটিই আদিতে শিশুদের জন্য রচিত হয় নি।' অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরী এ জাতীয় সাহিত্যের পৃথক সত্তাকে স্বীকার করেন নি। যদিও স্বয়ং তিনিও এ জাতীয় সাহিত্য রচনা ক'রেছেন। সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'আষাঢ়ে ছড়া' তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রমথ চৌধুরীর এরকম অনেক লেখাই সন্দেশের পৃষ্ঠাতে ছড়ানো আছে। তবু যে-সমস্ত উদাহরণ টেনে এ জাতীয় সাহিত্যের পৃথক সত্তাকে তিনি অস্বীকার করতে চেয়েছেন—তাতে আপত্তির কিছু দেখি না এবং এ উদাহরণ আরও অনেক বাড়ানো যায়। কিন্তু অনেক দিন হলো এ মতের পরিবর্তন হয়েছে। অনেক দিন হ'লো বিশেষ একটি বয়সের দিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্য রচিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ঠাকুর পরিবার, রায় পরিবার প্রভৃতি ঘরানার কথা মনে পড়বে। মনে পড়বে, বালক, শিশু, শিশুসাথী, মুকুল, ধ্রুব, সন্দেশ, মৌচাক, শুকতারা, আনন্দমেলা প্রভৃতি পত্রিকার জন্মের কারণের কথা।

প্রশ্ন উঠবে, শিশু কাদের বলবো ? অর্থাৎ তার বয়সের সীমা কি ? শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ অনেকেই এ বিষয়ে যে হিসেব দিয়েছেন তা সব সময় এক নয়। প্রশ্ন উঠবে, কিশোর-ই বা কাদের বলবো ? প্রশ্ন উঠবে, শিশু-সাহিত্য ও কিশোর-সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য কি ? ইংরেজিতে সুবিধে হলো, Juvenile Literature বলতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তমনস্ক ছোটদের সাহিত্যকে বোঝায়—বাঙলায় যা শিশু-সাহিত্য ও কিশোর-সাহিত্য। শিশু-সাহিত্য ও কিশোর-সাহিত্য যদিও নির্বিশেষ ছোটদের সাহিত্য তবুও সূক্ষ্ম তফাত বোধহয় থেকে গেছে। সেই হিসেবে এ সঙ্কলনে উপেন্দ্রকিশোর, যোগীন্দ্রনাথ ও রাধারানী দেবীর গল্প ছাড়া আর সবই কিশোর সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে।

যাই হোক, কিশোর বা শিশুমন এক বিপুল রহস্যের খনি। এই খনির সন্ধান যাঁর অজানা তাঁর পক্ষে আর যাই হোক—এ জাতীয় সাহিত্য রচনা কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু এ সমস্ত কথা অনেকেই মানছেন না এবং নির্বিচারে যে-কোনও লেখাতে শিশু বা কিশোর সাহিত্যের লেবেল এঁটে দিচ্ছেন।

দেখা যাচ্ছে, বড়দের সাহিত্য রচনা করতে না পেরে অনেকেই ছোটদের সাহিত্যে ঝুঁকে পড়ছেন। রঙিন ছবিতে ও আধুনিক যন্ত্রের ঝকঝকে ছাপাতে অভিভাবকেরাও বিভ্রান্ত হচ্ছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার, শিশু ও কিশোরদের সরল মনেও যুক্তির একটা নিজস্ব দিক আছে এবং সেই নিজস্ব যুক্তির দিকে সাহিত্যকে উত্তীর্ণ হতে হবে। বস্তুত এ জাতীয় সাহিত্য কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনার ফল নয়, তা আমাদের জাতীয় সাহিত্যেরই একটি উজ্জ্বল দিক। প্রসঙ্গত এখানে একটি কথা বলা দরকার। ছোটদের জন্য গোয়েন্দা কাহিনী নামে বাজারে যা চালু আছে তার অনেকগুলোই অপরাধপ্রবণতাকে কৌশলে উসকে দেয়। কোনও কারণে যদি বড়দের বই বাজেয়াপ্ত হতে পারে—ইত্যাদি কারণে ছোটদের বই বাজেয়াপ্ত হয় না কেন ?

যাই হোক, এবার সঙ্কলনটি প্রসঙ্গে দুয়েকটি কথা সবিনয়ে জানিয়ে রাখতে চাই। ঘোষণা অনুযায়ী সঙ্কলনটিকে প্রথম খণ্ড হিসেবে নিবেদন করছি। মনে হতে পারে, এই খণ্ডে এমন অনেক লেখক বাদ পড়ে গেলেন যাঁরা ছোটদের সাহিত্য রচনায় এক একটি স্তম্ভ। কথা দিচ্ছি, তাঁরা সব দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৫ জন লেখকের মধ্যে জায়গা করে নেবেন। মনে হতে পারে, 'তাঁরা সব' প্রথম খণ্ডে গেলেই ভালো হ'তো। কিন্তু এটা কোনও নিয়ম হ'তে পারে না যে, অমুক লেখক ব'লেই তাঁকে প্রথম খণ্ডে চলে যেতে হবে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে যাঁরা যাবেন তাঁরা সব দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক হবেন ! আসলে দু'টো খণ্ডেই আমরা প্রবীণ ও নবীণ লেখকদের পাশাপাশি রাখতে চেয়েছি।

আমাদের সঙ্কলনের জবাবদিহি এরকম :—

১। লেখক-বৈচিত্র্য ও বিষয়-বৈচিত্র্য পাশাপাশি দু'টো জায়গাকেই আমরা ধরতে চেয়েছি।

২। এই সঙ্কলনের মধ্য দিয়ে এ জাতীয় সাহিত্যের কোনও বিবর্তনকে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে না।

৩। যোগাযোগ ও অনুমতির অভাবে, ইচ্ছে সত্ত্বেও কাউকে কাউকে এ খণ্ডে রাখা সম্ভব হ'লো না।

৪। নির্ভেজাল আনন্দদানই এ সঙ্কলনের উদ্দেশ্য। অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য এর মধ্য দিয়ে খোঁজার চেষ্টা করা হয় নি।

৫। লেখকের জন্ম সালানুসারে সূচি সাজানো হয়েছে। আর লেখক-পরিচিতি বর্ণানুক্রমিক করা হয়েছে।

৬। লেখক নয়—লেখাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। প্রয়োজনে লেখকের মতামতকে গ্রহণ করেছি। তবে 'সেরা' বা শ্রেষ্ঠ' শব্দ যেহেতু আপেক্ষিক অতএব শেষ বিচারের ভার পাঠককেই নিতে হবে।

৭। প্রথম পৃষ্ঠায় উপেন্দ্রকিশোরের 'ছোট বলি কারে ?' কবিতাটি ছাপানো হয়েছে। এটি সন্দেশ পত্রিকার ২য় বর্ষের আশ্বিন সংখ্যায় ছাপা হয়েছিলো।

এ সঙ্কলন যে-সমস্ত জীবিত লেখকদের সহযোগিতায় এবং যাঁরা আজ ইহলোকে নেই তাঁদের আত্মীয়বর্গের আন্তরিক সহমর্মিতায় প্রকাশ পেলো তাঁদের প্রত্যেকের প্রতিই রইলো আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। শ্রী প্রণব সেন, শ্রীমতী উমা দে, শ্রীমতী লতিকা ঘোষ, শ্রী পার্থ ঘোষ, শ্রী শুভ মুখোপাধ্যায়, শ্রী তরুণ দাস, শ্রী সন্দীপ দত্ত, শ্রী শ্যামলকান্তি দাস, শ্রী বিকাশকান্তি সাহা, শ্রী অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী ঘনশ্যাম চৌধুরী, শ্রী গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক তাতে কৃতজ্ঞতা জানানোটা অবান্তর। এখন বইটি যাদের জন্য করা তারা খুশি হলেই আমাদের পরিশ্রমের কিছুটা কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। আর সুকুমার রায়ের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করা হ'লো।

দোল পূর্ণিমা, ১৩৯৪ **সুশান্ত সরকার**

সূচি

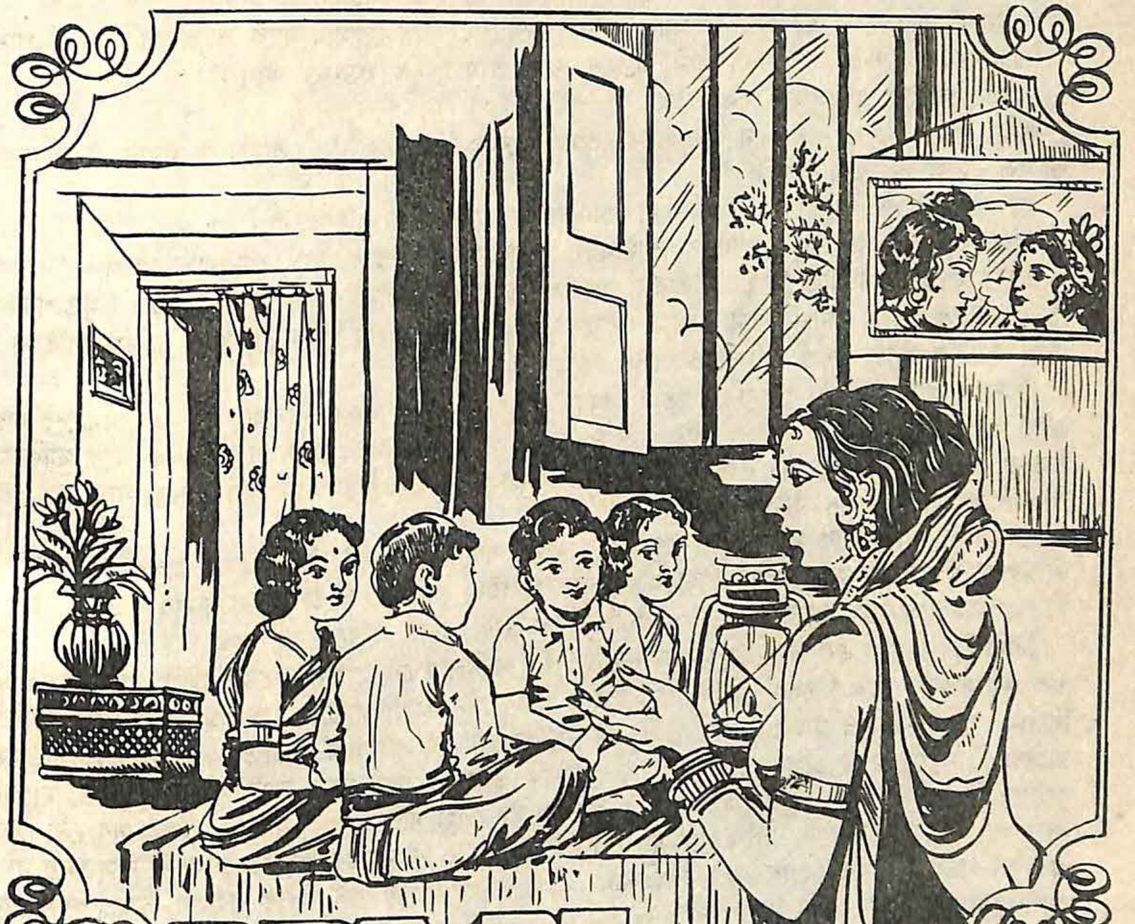
সব সেরা

কিশোর গল্প

[প্রথম খণ্ড]

অলঙ্করণ / বিমল পাল

বুলবুল প্রকাশন



পূজার ভূত

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায় : ভয়ঙ্কর বাড়ী

আমার নাম তারক। কলিকাতায় আমি বোর্ডিংয়ে থাকি। পূজার সময় আমি বাড়ী আসিয়াছি। আমার নিজের বাড়ী নয়, মামার বাড়ী। মামার বাড়ীতেই আমরা মানুষ হইয়াছি। আমি ও আমার ভগিনী প্রভা। শামীমাসী আমাদিগকে মানুষ করিয়াছে। আমার মাকেও সে মানুষ করিয়াছিল। শামীমাসী সদগোপের মেয়ে।

সন্ধ্যার সময় আমরা শামীমাসীকে ঘিরিয়া বসিলাম। আমি, প্রভা, আর আমার মামাতো ভাই ও ভগিনীগণ। আমি বলিলাম,—"শামীমাসী, আজ তোমাকে একটি গল্প বলিতে হইবে। কেমন মেঘ করিয়াছে। দেখ! কেমন অন্ধকার হইয়াছে। কেমন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আর বাতাসের একবার জোর দেখ। গাছের পাতার ভিতর দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া চলিতেছে। যেন রাগিয়া কি বলিতেছে। এই অন্ধকারে এমন

দুর্যোগের সময় ভূত-প্রেত সব বাহির হয়। বাপরে! গা যেন শিহরিয়া উঠে।"

শামীমাসী বলিল,—"এই পূজার সময়—এইরূপ দুর্যোগের সময় তোমার মাকে লইয়া আমি বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম। এখনও সে কথা মনে করিলে ভয়ে আমার বুক ধড়ফড় করে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হইয়াছিল শামীমাসী ?"

শামী উত্তর করিল,—"না, সে কথা এখন তোমাদিগকে আমি বলিব না। তোমরা ছেলেমানুষ! সে কথা শুনিলে তোমাদের ভয় করিবে।"

আমরা সকলেই বলিলাম,—"সে কথা শুনিলে আমাদের ভয় করিবে না।"

যাহা হউক, অনেক জেদা-জেদের পর শামীমাসী সে গল্প বলিতে সম্মত হইল। শামীমাসী বলিল,—"তারক ও প্রভার মায়ের নাম সীতা ছিল। সীতার মা, অর্থাৎ তোমাদের মাতামহীর নাম তারামণি ছিল। মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে বলিয়া যান—"শামী! আমার কাছে তুই সত্য কর যে, সীতাকে তুই কখন ছাড়িয়া যাবি না। সীতা পাঁচ বৎসরের শিশু পৃথিবীতে তাহার আর কেহ নাই।"

সীতাকে আমি দিদিমণি বলিয়া ডাকিতাম। আমি বলিলাম,—"মাঠাক্‌রুণ! দাদাবাবু (অর্থাৎ তোমাদের মার ভাই) ও দিদিমণি কোথায় কাহার কাছে থাকিবে, তাহা আমি জানি না। দিদিমণি যাহাদের কাছে থাকিবে, তাহারা যদি আমাকে ছাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে তোমার গায়ে হাত দিয়া আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি যে, দিদিমণিকে আমি কখন ছাড়িব না।"

তোমাদের মাতামহীর মৃত্যু হইল, তোমাদের মামা, যাহার এই বাড়ী তিনি তখন বালক। লেখাপড়া শিখাইবার নিমিত্ত একজন আত্মীয় তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন। সীতা তাহার মামার বাড়ীতে গেল। সীতার মামা আমাকে ছাড়াইলেন না। আমি দিদিমণিকে মানুষ করিতে লাগিলাম।

দিদিমণির মামারা এক সময়ে খুব বড়মানুষ ছিলেন। শুনিলাম যে, তাহার মাতামহ জগমোহন রায়চৌধুরী এক জন দুর্দ্দান্ত লোক ছিলেন। দিদিমণিকে লইয়া আমি যখন তাঁহার বাড়ীতে যাইলাম, তখন তিনি জীবিত ছিলেন না। দিদিমণির মামাও দেশে থাকিতেন না, পশ্চিমে কোথায় কর্ম করিতেন। দিদিমণিকে বাড়ীতে রাখিয়া তিনি সে স্থানে চলিয়া গেলেন। সে বাড়ী কি ভয়ঙ্কর! তিন মহল বাড়ী, বাহির বাড়ীতে, মাঝের বাড়ীতে,ভিতর বাড়ীতে, একতলায় দোতলায় কত যে ঘর তাহা গণিতে পারা যায় না। কিন্তু সব ভোঁ ভোঁ, দেখিলেই যেন ভূতের বাড়ী বলিয়া মনে হয়; বাহিরের বাড়ীতে কি মাঝের বাড়ীতে জনপ্রাণী বাস করে না। এত বড় বাড়ীতে আমরা কেবল ছয় জন রহিলাম; (১) তোমার মায়ের পিসী অলক ঠাক্‌রুণ, তাঁহার বয়স প্রায় আশী হইয়াছিল, আর তিনি সম্পূর্ণ কালা ছিলেন। (২) আর একজন ব্রাহ্মণী, তাঁহার নাম সহচরী, তাঁহারও বয়স বড় কম হয় নাই। তিনি রন্ধন করিতেন। (৩) একজন চাকর, তাহার নাম পিতেম। (৪) পিতেমের স্ত্রী, তাহার নাম বিলাসী। (৫) তাহার পর আমি ও (৬) তোমাদের মা, আমার দিদিমণি সীতা। বাড়ীর ভিতর দোতালায় তিনটি ঘরে আমরা ছয় জনে বাস করিতে লাগিলাম। প্রথম অলক ঠাক্‌রুণ ও সহচরীর ঘর; তাহার পার্শ্বে আমার ও দিদিমনির ঘর। তাহার পার্শ্বে পিতেম ও বিলাসীর ঘর। পশ্চিম দিকে এই তিনটি ঘর ছিল। উত্তর ও পূর্বদিকে অনেক ঘর পড়িয়াছিল। বিলাসীর ঘরের পার্শ্বে আর একটি ঘর লইয়া আমি দিদিমণির খেলাঘর বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। বাটীর চারিদিকে অনেক দূর পর্যন্ত আঁব, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি নানা গাছের বাগান ছিল। বাগানের ভিতর চারি পাঁচটি পুকুর ছিল। উত্তর দিক ভিন্ন বাটীর আর চারিদিকে গ্রাম ছিল। কিন্তু সে মিথ্যা গ্রাম, ম্যালেরিয়া জ্বরের উপদ্রবে অনেক লোক মরিয়া গিয়াছে; অনেক লোক ঘরদ্বার ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। বাটীর উত্তর দিকে মাঠ যতদূর দেখিতে পাই, ততদূর মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। শ্মশানের ন্যায় সেই বাড়ীতে গিয়া আমি মনে করিলাম, "ওমা! এ বাড়ীতে আমি কি করিয়া থাকিব, ভয়েই মরিয়া যাইব।"

"যাহা হউক, যেখানে আমার দিদিমণি সেখানে সব ভালো—সেইখানেই আলো,—সেইখানেই সুখ। দিদিমণির দৌড়াদোড়ি, দিদিমণির খেলা, দিদিমণির কথা, দিদিমণির হাসিতে সেই শ্মশানভূমি, যেন স্বর্গতুল্য হইল। এমন যে অলকঠাক্‌রুণ, যাহার গোমড়া মুখ দেখিলে ভয় হয়, দিদিমণিকে দেখিলে তাঁহারও মুখ যেন একটু উজ্জ্বল হইত, তাঁহারও মুখে যেন একটু হাসি দেখা দিত। দিদিমণির যেমন রূপ, তেমনি গুণ। তেমন ফুটফুটে, দুধে আলতার রং আমি আর কোন মেয়ের দেখি নাই। কেমন পুরন্ত গাল দুইটি, কেমন ছোট্টো হাঁ টুকু। কেমন টুকটুকে ঠোঁট, কেমন পটল-চেরা ঢুলু ঢুলু উজ্জ্বল চক্ষু, কেমন কাল কাল চক্ষুর পাতা, কেমন সরু

সরু চকচকে রেশমের মত নরম চুল ! হা কপাল ! সে দিদিমণিকে ছাড়িয়া এখনও আমি প্রাণ ধরিয়া বাঁচিয়া আছি। তারপর দিদিমণি যখন কথা কহিত, তখন প্রাণ যেন শীতল হইত, প্রাণের ভিতর দিদি আমার যেন সুধা ঢালিয়া দিত।

দিদিমণিকে লইয়া আমি সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলাম। একবার এই সময় ঘোরতর দুর্যোগ করিয়াছিল। বাহিরে বাতাস হু হু করিয়া বহিতেছিল। দিদিমণিকে লইয়া আমি দুই প্রহর শুইয়া আছি। সহসা বাহির-বাড়ীতে বেহালার শব্দ হইল। রাত্রি তখন প্রায় দুই প্রহর হইয়াছিল। আমি মনে করিলাম যে, এত রাত্রিতে আমাদের বাড়ীতে বেহালা বাজায় কে ? বাহির-বাড়ীতে তো কেহ বাস করে না।

পরদিন আমি বাহির-বাড়ীতে গিয়া চারিদিক দেখিলাম। জনপ্রাণীকেও সে স্থানে দেখিতে পাইলাম না। পোড়ো ভাঙ্গা বাড়ীর যেরূপ অবস্থা হয়, বাহির-বাড়ীর সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

সে দিন বিলাসীকে একবার একেলা পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিলাসী ! কাল রাত্রিতে বাহির-বাটীতে বেহালা কে বাজাইতেছিল ?"

আমার কথা শুনিয়া বিলাসীর মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে উত্তর করিল, —"বেহালা ! বেহালা আবার কে বাজাইবে ? ও বাতাসের শব্দ।"

বিলাসীর কথায় আমার প্রত্যয় হইল না। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, সে আমার নিকট কোন বিষয় গোপন করিতেছে।

বিলাসী পুনরায় বলিল,—"যাহা হউক, দিদিমণিকে তুমি সদর-বাড়ীতে যাইতে দিও না। সাপ খোপ কি আছে না আছে, কাজ কি ওদিকে গিয়া।"



আরও কিছুদিন গত হইয়া গেল। একবার নয়, আরও অনেকবার আমি সেই বেহালার শব্দ শুনিতে পাইলাম। যখনই রাত্রিকালে বাদলা ও দুর্যোগ হয়, তখনই বাহির-বাড়ীতে কে যেন প্রাণপণে বেহালা বাজায়। কেবল বেহালা নহে, সে বৎসর পূজোর সময় মহা-অষ্টমীর রাত্রিতে বাহির-বাড়ীতে আমি শাঁকঘন্টার শব্দও শুনিয়াছিলাম, ধূপ-ধূনার গন্ধও পাইয়াছিলাম। বলিদানের সময় যেমন একজন ভক্ত বিকট স্বরে মা মা বলিয়া চীৎকার করে, সে শব্দ শুনিয়াছিলাম। এ সমুদয় ব্যাপারের অর্থ কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত বৃদ্ধা সহচরীকে, পিতেমকে, বিলাসীকে আমি বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু কেহই আমাকে বলে নাই। "ও কিছু নয়," এই কথা বলিয়া সকলে প্রকৃত তত্ত্ব আমার নিকট গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

এইরূপে সে স্থানে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। কত শতবার আমি সেই বেহালার শব্দ শুনিতে

পাইলাম। পুনরায় পূজার সময় আসিল। মহাষ্টমীর দিন দুই প্রহরের সময় দিদিমণি, পিতেম ও বিলাসীর সহিত গ্রামের ভিতর পূজা দেখিতে গিয়াছিল। আমি বিদেশী লোক, আমাকে কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই, সেজন্য আমি তাহাদের সঙ্গে যাই নাই। পূজা দেখিয়া বেলা পাঁচটার সময় দিদিমণি ফিরিয়া আসিল। বিলাসী আমাকে বলিল,—"যদু ভড়ের বাড়ী পূজার এবার খুব ধুম। আহা! কি চমৎকার প্রতিমা করিয়াছে। আর শামীদিদি, ভড়গিন্নী তোমাকে অনেক করিয়া যাইতে বলিয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"আচ্ছা, বিলাসী! তবে আমি একবার মাকে দেখিয়া আসি। তুই ভাই দেখিস, যেন দিদিমণি কোথাও না যায়।"

এই কথা বলিয়া আমি ভড়েদের বাড়ী ঠাকুর দেখিতে যাইলাম। ভড়গিন্নী আমাকে অনেক আদর করিলেন। অনেকগুলি খই মুড়কি, নারিকেল-সন্দেশ, রসকরা—আরও কত কি আমার কাপড়ে বাঁধিয়া দিলেন। ফিরিয়া আসিতে আমার সন্ধ্যা হইয়া গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায় : আয় না ভাই

বাড়ী আসিয়া তাড়াতাড়ি আমি বিলাসীর ঘরে যাইলাম। দিদিমণিকে সে স্থানে দেখিতে পাইলাম না।

বিলাসী বলিল,—"বোধ হয় অলক ঠাক্‌রুণের ঘরে আছে।" রুদ্ধশ্বাসে সে ঘরে আমি দৌড়িয়া যাইলাম। গঅলক ঠাক্‌রুণ ও সহচরী দুইজনেই তখন সে ঘরে ছিল। দিদিমণিকে দেখিতে না পাইয়া সহচরীকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। সহচরী উত্তর করিলেন,—"কৈ! সীতা ত এ ঘরে আসে নাই।"

এই কথা শুনিয়া প্রাণ আমার উড়িয়া গেল। পুনরায় আমি বিলাসীর ঘরে যাইলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি বিলাসীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম।

বিলাসী কাঁদিতে লাগিল। সে বলিল—"এইমাত্র আমার ঘরের বারান্দায় সে খেলা করিতেছিল। ঘরের ভিতর আমি কাজ করিতেছিলাম। বোধ হয়, অন্য কোন ঘরে সে খেলা করিতেছে।"

এমন সময় পিতেম আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার কান্না ও বিলাসীকে ভর্ৎসনার শব্দ শুনিয়া সহচরীও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রদীপ হাতে লইয়া সকলে মিলিয়া আমরা বাড়ী আতিপাতি করিয়া খুঁজিতে লাগিলাম। ভিতরবাড়ী খুঁজিয়া মাঝের বাড়ী, তাহার পর সদরবাড়ীর সকল ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম ; কিন্তু কোন স্থানে দিদিমণিকে দেখিতে পাইলাম না। মাথা খুঁড়িয়া বুক চাপড়াইয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। আমি ভাবিলাম যে, হয় গহনার জন্য দিদিমণিকে কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে, কিংবা পুষ্করিণীতে পড়িয়া সে ডুবিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ী ওলট-পালট করিয়া অবশেষে আমরা বাগান ও পুকুরের ধারগুলি মনোযোগের সহিত দেখিলাম। কিন্তু কোন স্থানে দিদিমণির চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলাম না। শেষে পিতেম আমাকে বলিল,—"তোমাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার মন কেমন করিয়াছিল, তোমাকে খুঁজিবার নিমিত্ত নিশ্চয় সে পূজা-বাড়ীর দিকে গিয়াছে। আমি এখনই তাহাকে আনিতেছি।" এই কথা বলিয়া পিতেম গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।



কিন্তু তা বলিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের বাড়ী ও বাগানের উত্তর দিকে দূর পর্যন্ত মাঠ ছিল। দিদিমণিকে খুঁজিবার নিমিত্ত বিলাসী ও আমি সেই মাঠের দিকে যাইলাম। মেঘ করিয়াছিল, খুব অন্ধকার হইয়াছিল। তাহার উপর এখন আবার বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে সম্মুখে আমরা এক প্রকার সাদা কি দেখিতে পাইলাম। বিলাসীর বড় ভয় হইল। সে বলিল,—"দিদি, ঐ দেখ একটি শাকচূর্ণী আসিতেছে। এখনি আমাদের খাইয়া ফেলিবে। আর গিয়া কাজ নাই এস, বাড়ী ফিরিয়া যাই। এতক্ষণে দিদিমণি বাড়ী আসিয়া থাকিবে।"

কোন উত্তর না দিয়া বিলাসীর আমি হাত ধরিলাম, আর সেই সাদা জিনিসের দিকে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলাম। সেও অন্য দিক হইতে আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। বিলাসী তাহাকে চিনিতে পারিল। সে আমাদের প্রতিবেশী একজন কৃষক ! কাপড় ঢাকা তাহার বুকের উপর কি ছিল। আমরা কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে সে বলিল,—"তোমাদের মেয়েটি মাঠের মাঝখানে গাছতলায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। কি করিয়া সে মাঠের মাঝখানে আসিয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি দেখিতে পাইয়া এখন তোমাদের বাড়ী লইয়া যাইতেছি।"



তাড়াতাড়ি দিদিমণিকে আমি তাহার কোল হইতে আপনার কোলে লইলাম। কিন্তু দিদিমণির সর্ব শরীরই ঠাণ্ডা দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি ভাবিলাম, সে মরিয়া গিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে আম তাহার নাকে ও বুকে হাত দিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, নাক দিয়া অল্প অল্প নিশ্বাস পড়িতেছে। আর বুক অল্প অল্প ধুক্ ধুক্ করিতেছে। তাহা দেখিয়া প্রাণে আমার কতকটা আশা হইল। তাড়াতাড়ি মাঠ পার হইয়া আমরা বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অনেক তাপসেক করিতে করিতে দিদিমণির চেতনা হইল। সেই চন্দ্রমুখে মধুর হাসি দেখা দিল, সুধামাখা দুই একটি কথা দিদিমণির মুখ হইতে বাহির হইল। অল্প গরম দুধ আনিয়া সহচরী তাহাকে খাইতে দিলেন। তাহার সেই পদ্ম চক্ষু দুইটি ঘুমে বুজিয়া গেল। সে রাত্রিতে দিদিমণিকে আমরা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।

দূরে মাঠের মাঝখানে একেলা সেকি করিয়া গিয়াছিল, পরদিন সেই কথা দিদিমণিকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম। দিদিমণি বলিলেন,—"বারান্দায় আমি খেলা করিতেছিলাম। তাহার পর যে ঘরে আমার খেলা-ঘর আছে, আমি তাহার ভিতর যাইলাম। সেই ঘরের জানালার ধারে যেই দাঁড়াইয়াছি, আর দেখি না ঠিক তাহার নীচেতে বাগানে একটি মেয়ে রহিয়াছে। মেয়েটি আমার মত বড়, কিন্তু খুব সুন্দর। উপর দিকে আমার পানে চাহিয়া সে বলিল,—"সীতা ! নেমে আয় না ভাই, আমরা দুই জনে খেলা করি।" আমি বলিলাম,—"না ভাই, ! এখন আমি নীচে নামিয়া যাইতে পারিব না। সন্ধ্যা হইয়াছে, এখন নীচে নামিবার সময় নয়। বিলাসী আমাকে বকিবে, তাহার পর শামী আসিয়া আমাকে বকিবে। কাল সকালবেলা তুমি আসিও, দুই জনে তখন অনেকক্ষণ খেলা করিব।" মেয়েটি বলিল,—"এখনও তেমন সন্ধ্যা হয় নাই, এখনও অনেক আলো রহিয়াছে। এই দেখ আমার মাথা দিয়া রক্ত পড়িতেছে, তবুও দেখ আমি খেলা করিতেছি। আয় না ভাই।"



তবুও আমি নামিলাম না। নীচে নামিতে মেয়েটি আমাকে বার বার বলিতে লাগিল। শেষে সে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল, বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। নীচে নামিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া আমি তাহার কাছে যাইলাম। কিছুক্ষণ বাগানের ভিতর আমরা দুই জনে খেলা করিলাম। এক স্থানে অনেকগুলি রজনীগন্ধা ফুল ফুটিয়াছিল, তাহা আমরা তুলিলাম। সাদা টগর ফুল ফুটিয়া আর একটি গাছে আলো করিয়াছিল। নীচে হইতে যত পারিলাম, সেই টগর ফুলও আমরা তুলিলাম। কেমন করিয়া জানিনা,

তাহার পর বাগান পার হইয়া আমরা মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কেমন করিয়া জানি না, সেই মেয়েটির সঙ্গে অনেক পথ চলিয়া ক্রমে মাঠের মাঝখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে একটি গাছ ছিল। সেই গাছতলায় একটি মেয়ে মানুষ বসিয়া কাঁদিতেছিল। আমার মাকে স্বপ্নের ন্যায় আমার মনে পড়ে। সে মেয়ে-মানুষটি ঠিক আমার মায়ের মত। সেই রকম রং, সেই রকম মুখ, সেই রকম চুল, সেই রকম কথা। আদর করিয়া তিনি আমাকে কোলে লইলেন, আমার মুখে তিনি কত চুমা খাইলেন। কোলে বসাইয়া আমার মাথায় তিনি হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার পর কি হইল, আর আমার মনে নাই।"

তৃতীয় অধ্যায় : বালিকা ভূত

দিদিমণির এই কথা শুনিয়া সহচরী পিতেমকে চক্ষু টিপলেন। তাহার পর তিনি বিলাসীর গা টিপিলেন। ইহার মানে আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —"সে মেয়েটি কে? সে তো বড় দুষ্ট মেয়ে দেখিতেছি। তাহাকে আর বাগানে আসিতে দেওয়া যাইবে না।"

আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া সহচরী বলিলেন,—"এ বিষয় অলক ঠাক্‌রুণকে জানাইতে হইবে। তিনি যেরূপ বলেন, সেইরূপ করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া সহচরী সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে, পিতেমকে ও বিলাসীকে অলক ঠাক্‌রুণের ঘরে ডাকিতে পাঠাইলেন। দিদিমণিকে কোলে লইয়া আমি পিতেম ও বিলাসীর সঙ্গে সেই ঘরে যাইলাম। অলক ঠাক্‌রুণ থুড়-থুড়ে বুড়ী হইয়াছিলেন। তিনি অধিক কথা বলিতে পারিতেন না। তাঁহার হইয়া সহচরী আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"অলক ঠাক্‌রুণ তোমাকে বলিতে বলিলেন যে, সে মেয়েটি মানুষ নহে। তাহার মা, যাঁহাকে সীতা গাছতলায় দেখিয়াছিল, তিনি অলক ঠাক্‌রুণের ভাইঝি, সীতার মাসী। অনেক দিন হইল তিনি ও তাঁহার কন্যা অপঘাত-মৃত্যুতে মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গতি হয় নাই, এখন তাঁহারা এরূপ হইয়া আছেন। তাঁহারা সর্বদা, বিশেষত ঝড় বাতাস বাদলার দিনে, আর এই পূজার সময়, বাড়ীর চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ান। পিতেম, বিলাসী আর তুমি শামী, তোমাদের সকলকে অলক ঠাক্‌রুণ বলিতেছেন যে, সীতাকে তোমরা খুব সাবধানে রাখিবে, নিমিষের নিমিত্ত তোমরা তাহাকে চক্ষের আড়াল, করিবে না। সে মেয়েটা এবার যদি সীতাকে ভুলাইয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আর তোমরা সীতাকে পাইবে না।"

এই কথা শুনিয়া আমার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। কি করিয়া মেয়েকে ভূতের হাত হইতে বাঁচাইব, সেই ভাবনায় আমি আকুল হইয়া পড়িলাম। তোমার মামার তখনও কর্ম্ম-কাজ হয় নাই, একদিন গিয়া দাঁড়াই, এক বেলা এক মুঠা কেহ যে ভাত দেয়, এমন স্থান ছিল না। কাদায় গুণ ফেলিয়া দিদিমণিকে লইয়া কাজেই আমাকে সেই ভয়ানক বাড়ীতে থাকিতে হইল। কিন্তু সেই দিন হইতে দিদিমণিকে আমরা নিমিষের জন্যও চক্ষুর আড়াল করিতাম না হয় আমি, না হয় বিলাসী, না হয় পিতেম, কেহ না কেহ সর্বদা তাহার কাছে থাকিত। কিন্তু মাঝে মাঝে জানালায় দ্বারে দাঁড়াইয়া দিদিমণি আমাদিগকে বলিত,—"ঐ সেই মেয়েটি আসিয়াছে ঐ আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। শামী, তুই আমাকে সুন্দর বলিস, কিন্তু ওর পানে একবার চাহিয়া দেখ। আহা! কি চমৎকার রূপ। কেবল ওর পানে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। ঐ দেখ, আবার আমাকে ডাকিতেছে। আমি যাইতেছি না বলিয়া আহা! মেয়েটি ঐ দেখ কতই না কাঁদিতেছে। তাহার কাপড় সে আমাকে দেখাইতেছে, তাহার কাপড় হইতে জল পড়িতেছে। এ আবার কি? হাত দিয়া সে আপনার মাথা আমাকে দেখাইতেছে। আহা! মেয়েটির মাথায় কে মারিয়াছে, মাথা গাল বহিয়া রক্ত পড়িতেছে। শামী একবার আমাকে ছাড়িয়া দে। আমি উহার কাছে যাই, উহাকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আনি। তুই উহার মাথায় ঔষধ দিয়া দিবি। আমার ঐ কাপড়খানি আমি উহাকে পরিতে দিব। যাই ভাই, যাই!"



এররূপ বলিলে তাড়াতাড়ি আমি তোমার মাকে গিয়া কোলে লইতাম। উপর হইতে বাগানের দিকে আমি চাহিয়া দেখিতাম, কিন্তু আমি কিছু দেখিতে পাইতাম না। কি করিব ! ঘরের দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া মেয়েকে কোলে লইয়া, ভয়ে জড়সড় হইয়া আমি বসিয়া থাকিতাম।

এইরূপে অতি কষ্টে আমরা সেই বাড়ীতে দিনপাত করিতে লাগিলাম। পুনরায় পূজার সময় আসিল। এই সময় দিদিমণি সেই মেয়েটাকে ঘন ঘন দেখিতে লাগিল। বাগানের দিকে জানালা এখন আমি সর্বদাই বন্ধ করিয়া রাখিতাম। তথাপি দিদিমণি বলিত,—"শামী ! জানালা খুলিয়া দে। মেয়েটি নীচে আসিয়াছে, সে আমাকে ডাকিতেছে। শামী ! তোর পায়ে পড়ি একবার জানালা খুলিয়া দে, একবার তাহাকে আমি দেখি।"

মহাষ্টমীর দিন মেয়েকে লইয়া আমি বড়ই বিব্রত হইলাম। সে দিন ভয়ানক দুর্যোগ হইয়াছিল। সীতাকে কোলে লইয়া আমি ঘরে বসিয়া ছিলাম। এখন আর বাহিরে নয়, সে দিন দিদিমণি সেই মেয়েটিকে বাড়ীর ভিতরেই দেখিতে লাগিল। আমি দ্বার বন্ধ করিয়াছিলাম তথাপি দিদিমণি বলিতে লাগিল, "ও শামী মেয়েটি আজ বাড়ীর ভিতর আসিয়াছে, ঘরের বাহিরে আমাদের ঘরের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। ছাড়িয়া দে শামী ! আমি একবার তাহার কাছে যাই। একবার তাহাকে না দেখিলে মরিয়া যাইব।"

এই বলিয়া দিদিমণি হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল ! কি যে করি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মেয়ে লইয়া আমি অলক ঠাক্‌রুণের ঘরে যাইলাম। সে স্থানে সহচরী উপস্থিত ছিলেন। আমি বলিলাম,—"আজ বাছা, আমাদের খাওয়া দাওয়াতে কাজ নাই। সকলে মিলিয়া এস,আজ আমরা মেয়েকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকি তা না করিলে দিদিমণিকে আজ আমরা বাচাতে পারিব না, সেই দুষ্ট মেয়েটা আসিয়া দিদিমণিকে নিশ্চয় আজ লইয়া যাইবে।"

সহচরী অলক ঠাক্‌রুণকে সকল কথা বলিলেন। অলক ঠাক্‌রুণ আমার কথায় সম্মত হইলেন। পিতেম ও বিলাসীকে ডাকিয়া দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া দিদিমণিকে ঘিরিয়া সকলে আমরা অলক ঠাক্‌রুণের ঘরে বসিয়া রহিলাম।

বলাবাহুল্য যে ইতিপূর্বে এই বিড়ম্বনা নিবারণের জন্য অনেক প্রতিকার করা হইয়াছিল। গয়াতে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছিল । শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা হইয়াছিল, রোজা আনিয়া ঝাড়ান ও ভূত নামানো হইয়াছিল, দিদিমণির অষ্টাঙ্গে কবচ, মাদুলি ও নেকড়ার পুঁটলি বাঁধা হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

চতুর্থ অধ্যায় : বিষম মহাষ্টমী

সকলে ঘিরিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সেই মহাষ্টমীর সমস্ত দিন দিদিমিণি বড়ই ছট্‌ফট্ করিয়াছিল। "ঐ সেই মেয়েটি আসিতেছে, সে আমাকে ডাকিতেছে, তাহার কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে, তাহার মাথা দিয়া রক্ত পড়িতেছে ; দাও আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তাহার কাছে যাই," এই বলিয়া দিদিমণি বার বার কাঁদিতেছিল, আর আমার কোল হইতে উঠিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া বার বার বাহিরে পলাইতে চেষ্টা করিতেছিল। অতি কষ্টে আমি তাহাকে ধরিয়া রাখিতেছিলাম।



সন্ধ্যার পর দিদিমণি ঘুমাইয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম যে, এইবার বুঝি আমাদের বিপদ কাটিয়া গেল, আর বুঝি কোন উপদ্রব হইবে না। কিন্তু আমরা কেহ নিদ্রা যাইলাম না, ঘরে দুইটা আলো জ্বালাইয়া সকলে জাগিয়া বসিয়া রহিলাম।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। এমন সময় সহসা বাহির-বাটীতে সেই বেহালা বাজিয়া উঠিল। কেবল বেহালা নহে, তাহার সঙ্গে ঢাক-ঢোল, শাঁক-ঘণ্টা কাঁসর-ঘড়িও বাজিয়া উঠিল। সেই সকল বাজনা ছাপাইয়া বলিদানের সেই ভয়ানক মা মা চীৎকারে আমাদের যেন কানে তালা লাগিতে লাগিল, আতঙ্কে আমাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, ভয়ে আমাদের শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। হতভোম্বা হইয়া আমরা বসিয়া আছি, এমন সময়

ধড়মড় করিয়া দিদিমণি উঠিয়া বসিল। আমরা কিছু বলিতে না বলিতে চোঁৎ করিয়া সে দ্বারের নিকট গিয়া খিল খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর আমরা তাহাকে ধরিতে না ধরিতে রুদ্ধশ্বাসে বাহির-বাড়ীর পূজার দালানের দিকে সে দৌড়িল। "ও মা, কি হইল, সর্বনাশ হইল।" এই কথা বলিতে বলিতে অলক ঠাক্‌রুণ ছাড়া আর সকলেই আমরা তাহার পশ্চাৎ দৌড়িলাম। কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। দিদিমণি আমাদের আগে আগে গিয়া বাহির-বাড়ীর পূজার দালানে গিয়া উপস্থিত হইল। সে স্থানের অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমরা জ্ঞানহারা হইলাম। এখন আর সে ভাঙ্গা জনশূন্য বাড়ী নাই। খুব ধূম-ধামের দুর্গোৎসব হইলে যেরূপ হয়, সে স্থানে এখন সেইরূপ হইয়াছে। দালানের মাঝখানে প্রতিমা রহিয়াছে—বৃহৎ প্রতিমা, নানা সাজে সুসজ্জিত। প্রতিমার চারিদিকে নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার আয়োজন রহিয়াছে। সম্মুখে পুরোহিতগণ বসিয়া আছেন। এক পার্শ্বে এক জন চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। সম্মুখের প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, ধূপধূনার গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া আছে। দালানে, উঠানে, সকল স্থানে ঝাড় লণ্ঠন জ্বলিতেছে। ফল কথা, এমন ধূমধামের পূজা আমি কখন দেখি নাই।

দিদিমণি কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দালান পার হইয়া দালানের পূর্বদিকে চলিয়া গেল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আমরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। দালানের পূর্বদিকে একটি ঘর ছিল। সেই ঘরের ভিতর তক্তপোষের উপর এক জন বৃদ্ধ বসিয়া ছিলেন। তাহার বামহাতে বেহালা, আর দক্ষিণ হাতে যা দিয়া বাজায় তাই ছিল। একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক মাটীতে বসিয়া বৃদ্ধের পা দুইখানি ধরিয়া কি বলিতেছেন। সেই স্ত্রীলোকের পার্শ্বে সাত আট বৎসরের এক বালিকা দাঁড়াইয়া ছিল।



দিদিমণি বরাবর গিয়া সেই ঘরের দ্বারের এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। খপ করিয়া আমি গিয়া দিদিমণির হাত ধরিয়া ফেলিলাম। তাহার পর আমরা সকলেই সেই দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলাম।

যে স্ত্রীলোক বৃদ্ধের পা ধরিয়া ছিলেন, তিনি এখন কাঁদ-কাঁদ মৃদু মধুরস্বরে বলিলেন,—"বাবা, অপরাধ করিয়াছি সত্য! কিন্তু আমি তোমার কন্যা। শত অপরাধ করিলে, কন্যাকে ক্ষমা করিতে হয়! এই মেয়েটিকে লইয়া আমি এখন কোথায় যাই।"

বৃদ্ধ অতি নিষ্ঠুর ভাষায় বলিলেন,—"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, তোর আমি মুখ দেখিব না। কালামুখ লইয়া এ বাড়ী হইতে এখনই দূর হইয়া যা।"

স্ত্রীলোক উত্তর করিলেন,—"বাবা! আমি কোনরূপ দুষ্কর্ম করি নাই, স্বামীর ঘরে গিয়াছি, এই মাত্র।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"তুই দূর হ, আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ।" স্ত্রীলোকটি অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, আমি দূর হইতেছি, কিন্তু আমার কন্যাটি তো কোন অপরাধ করে নাই! ইহাকে আমি তোমার নিকট রাখিয়া যাইতেছি। পাতের হাতের দুইটি ভাত দিয়া ইহাকে প্রতিপালন করিও।"

সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ আরও জ্বলিয়া উঠিলেন,—"তোর ঝাড় আমার এ বাড়ীতে থাকিতে পারিবে না। দূর দূর, এখনি দূর হ।"

স্ত্রীলোক ও তাহার কন্যা সত্বর দূর হইতেছে না, তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ রাগে অন্ধ হইয়া পড়িলেন। ধৈর্য্য ধরিতে

না পারিয়া তিনি সেই বেহালার বাড়ী কন্যার মাথায় মারিয়া বসিলেন। কন্যার মাথা হইতে দর দর ধারায় রক্ত পড়িতে লাগিল। গাল বাহিয়া সেই রক্ত মাটীতে পড়িল।

এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া সেই স্ত্রীলোক তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষু দিয়া তাঁহার যেন আগুনের ফিন্‌কি বাহির হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—"বাবা! তুমি এ কাজ করিলে!!! যাহা হউক, আমি তোমাকে কিছু বলিব না। কিন্তু আজ হইতে তোমার লক্ষ্মী ছাড়িল।"

এই কথা বলিয়া মেয়েটির হাত ধরিয়া স্ত্রীলোকটি সেই ঘর হইতে বাহির হইলেন। তাহার পর দালানের ভিতর দিয়া উঠানে গিয়া নামিলেন। তাহার পর উঠান পার হইয়া বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

যেই তিনি বাড়ীর বাহির হইলেন, আর বৃদ্ধ ভয়ানক চীৎকার করিয়া সেই তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িলেন। সেই সময় ঝাড় লণ্ঠন সব নিবিয়া গেল। প্রতিমা, পুরোহিত, লোক-জন সব অদৃশ্য হইয়া পড়িল। ঢাকঢোলের কলরব সব থামিয়া গেল।

অন্ধকারে আমি পিতেমের কথা শুনিতে পাইলাম। পিতেম বলিল,—"শামী! সীতা তোমার কাছে কাছে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"হাঁ, আমি তাহাকে ধরিয়া আছি।"

পিতেম পুনরায় বলিল,—"তবে চল, ঘরে চল।"

পঞ্চম অধ্যায় : পূর্ব-বিবরণ

সকলে পুনরায় অলক ঠাক্‌রুণের ঘরে যাইলাম। সীতা তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল। সে রাত্রিতে আর কোন উপদ্রব হইল না।

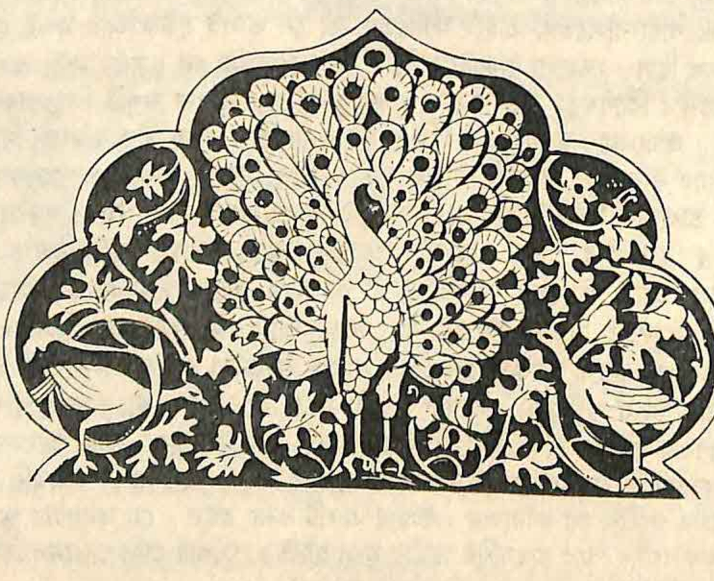
কিন্তু সে রাত্রিতে আমাদের নিদ্রা হইল না। আমরা সকলে বসিয়া রহিলাম। পিতেম তখন আমাকে সকল কথা বলিল। পিতেম বলিল,—

"ঐ যে বৃদ্ধ দেখিলে, উনি বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন। উঁহার নাম জগমোহন রায়চৌধুরী ছিল। উনি বড় দুর্দ্দান্ত লোক ছিলেন। একবার যাহা বলিতেন, তাহাই করিতেন, তা সে ভালই হউক আর মন্দই হউক। পৃথিবীতে তাঁহার কেবল একটি সখ ছিল। বেহালা বাজাইতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। সময় নাই, অসময় নাই, সর্বদাই তিনি বেহালা বাজাইতেন। বিশেষতঃ ঝড় বাতাস বাদলার রাত্রিতে তাঁহার সখটি কিছু প্রবল হইত। অলক ঠাক্‌রুণ তাঁহার ভগিনী। জগমোহন রায়ের এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। পুত্র সীতার মামা, যিনি এখন পশ্চিমে কাজ করেন। বড় কন্যার নাম ছিল রামমণি, যাঁহার ভূতকে সীতা মাঠের মাঝখানে গাছতলায় দেখিয়াছিল। ছোট মেয়ের নাম ছিল তারামণি, তিনি সীতার মা। রায় চৌধুরী বড়মানুষ লোক, কোন পুরুষে কন্যা শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতেন না। কিন্তু রামমণির এক তেজস্বী পুরুষের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে,—"ঘর-জামাই হইয়া আমি কিছুতেই থাকিব না।" আপনার স্ত্রীকে তিনি নিজের বাড়ী লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু কর্ত্তা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শ্বশুর-জামাতায় ঘোর বাদ-বিসম্বাদ বাধিয়া গেল। অবশেযে কর্ত্তা এক দিন রামমণিকে ডাকিয়া জামাতার সমক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ইহাকে চাও—না আমাকে চাও।" রামমণি উত্তর করিলেন,—"বাবা! তুমি পিতা বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের পতিই সর্বস্ব।" এই উত্তর শুনিয়া কর্ত্তা ঘোরতর রাগিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—"বটে! তবে এখনি আমার বাড়ী হইতে দূর হও। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ হইতে আমি তোমার মুখ দেখিব না।" রামমণি শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। নয় দশ বৎসর স্বামীর ঘর করিলেন। তাঁহার একটি কন্যা হইল। সে কন্যাটির ভূত সীতাকে মাঠে লইয়া গিয়াছিল। নয় দশ বৎসর পরে রামমণির স্বামীর মৃত্যু হইল। পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত তিনি একটি পয়সাও রাখিয়া যান নাই। রামমণি ঘোর বিপদে পড়িলেন।



পিতাকে কয়েকখানি পত্র লিখিলেন । পিতা কোন উত্তর দিলেন না । অবশেষে ভাবিলেন,—"পূজার সময় লোকের মন নরম হয় । এই পূজার সময় বাবার পায়ে গিয়া পড়ি, তাহা হইলে তিনি বোধ হয় ক্ষমা করিবেন ।" পূজার সময় কন্যাকে লইয়া রামমণি পিতার বাটীতে আসিলেন । তাহার পর তোমরা এইমাত্র যাহা দেখিলে, অষ্টমীর দিন সত্য সত্যই সেই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছিল । কন্যার হাত ধরিয়া রামমণি চলিয়া গেলেন । পক্ষাঘাত রোগ হইয়া কর্ত্তা তৎক্ষণাৎ মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন । অল্পক্ষণ পরে তুমুল ঝড় উঠিল, সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল । পর দিন সকলে দেখিল যে, রামমণি ও তাঁহার কন্যা দুইজনেই মাঠের মাঝখানে গাছতলায় মরিয়া পড়িয়া আছেন । কর্ত্তা আরও কয়েক মাস জীবিত রহিলেন । কিন্তু সেই দিন হইতেই আর তিনি কথা কহিতে পারেন নাই, কি উঠিয়া বসিতে পারেন নাই । সেই তাঁহার লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল । জমিদারী, টাকা কড়ি কিরূপে কোথায় যে উড়িয়া গেল, তাহা কেহ বলিতে পারে না । ঘর-জামাই রাখার অহঙ্কারও সেই সঙ্গে দূর হইল । সে জন্য সীতার মাকে শাশুড়ী পাঠাইতে আর কোন আপত্তি রহিল না । কর্ত্তা রামমণি ও তাঁহার কন্যা—তিন জনেই এখন ভূত হইয়া আছেন । কতবার গয়াতে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছিল । কিন্তু কোন ফল হয় নাই ।"

পরদিন প্রাতঃকালে আমি ভাবিলাম যে, ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, সেও স্বীকার ; তবু সীতাকে লইয়া সে বাড়ীতে আর আমি থাকিব না । সীতার ভাই, তোমার মামাকে আমি পত্র লিখিলাম । ভাগ্যক্রমে এই সময় তাঁহার একটি কর্ম্ম হইয়াছিল । তিনি আসিয়া আমাকে ও সীতাকে তাঁহার নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন । কিছুদিন পরে সীতার বিবাহ হইল । তাহার পর তুমি ও প্রভা হইলে । কিছুদিন পরে তোমার পিতার কাল হইল । অল্পদিন পরে দিদিমণিও তাঁহার সঙ্গে স্বর্গে গেলেন । দিদিমণিকে হারাইয়া কি করিয়া আমি যে প্রাণ ধরিয়া আছি তাহাই আশ্চর্য্য । যাহা হউক, তোমাদের দুইজনকে পাইয়া আমি শোক অনেকটা নিবারণ করিতে পারিয়াছি । মা দুর্গা তোমাদিগকে আর যত ছেলেপিলেকে বাঁচাইয়া রাখুন ।



ঝানু চোর চানু

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

ছেলেবেলা থেকেই চানু শয়তানের একশেষ, আশপাশের লোকজন তার জ্বালায় অস্থির। চানুর বাবা বড় গরিব ছিল, চানু ভাবল—বিদেশে গিয়ে টাকা পয়সা রোজগার করে আনবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ, একদিন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। খানিক দূর গিয়েই বনের ভিতর দিয়ে একটা নির্জন রাস্তা—চানু সেই রাস্তা ধরে চলল। সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যার সময় পথের ধারেই একটি কুঁড়েঘর ছিল, সেখানে এসে উপস্থিত।

ঘরের ভিতর আগুনের পাশে একটি বুড়ি বসে ছিল, চানুকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই বাপু তোমার?'

চানু বলল, 'চাইব আর কি, কিছু খাবার দাবার চাই, আর একটি বিছানা চাই।'

বুড়ি বলল, 'সরে পড় বাপু, এখানে কিছু পাবে না। আমার ছয়টি ছেলে, সারা দিন খেটেখুটে তারা এখনই বাড়ি ফিরবে। তোমাকে এখানে দেখতে পেলে তারা তোমার গায়ের চামড়া তুলে ফেলবে।'



চানু। 'সেটা আর বেশি কথা কি ? এই ঠাণ্ডায় বাইরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মরার চাইতে গায়ের চামড়া তুলে ফেলবে সেইটাই বরং ভাল।'

বুড়ি দেখল সে সহজ লোকের পাল্লায় পড়েনি ; কি আর করে, তখন চানুকে পেট ভরে খেতে দিল। শুতে যাবার সময় চানু বুড়িকে বলল, 'দেখো বুড়ি ! তোমার ছেলেরা এসে যদি আমার ঘুম ভাঙায় তা হলে কিন্তু বড্ড মুশকিল হবে বলছি।'

পরের দিন ঘুম ভাঙলে পর চানু দেখল ছয় জন অতি বদ-চেহারার লোক তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে—সে তাদের দেখে গ্রাহ্যও করল না।

দলের সর্দারটি তখন চানুকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে হে বাপু ?' কি চাও এখানে ?'

চানু। 'আমার নাম সর্দার চোর, আমার দলের জন্য লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমরা যদি চালাক চতুর হও তা হলে তোমাদের অনেক বিদ্যা শিখিয়ে দেব।'

সর্দার বলল, 'আচ্ছা বেশ, তুমি তা হলে এখন উঠে একটু খাও-দাও, তারপর দেখা যাবে এখন কে সর্দার।'

বিছানা থেকে উঠে সকলের সঙ্গে বসে চানু খেল। ঠিক তারপরই সকলে দেখল একটা সুন্দর ছাগল সঙ্গে নিয়ে একজন কৃষক বনের পাশে যাচ্ছে। তখন চানু বলল, 'আচ্ছা, তোমাদের কেউ কোনরকম জবরদস্তি না করে শুধু ফাঁকি দিয়ে ঐ লোকটার ছাগলটা নিয়ে আসতে পার ?' একজন একজন করে সকলেই বলল, 'না ভাই, আমারা কেউ তা পারব না।'

চানু। 'ব্যস, তা হলেই দেখো আমি তোমাদের সর্দার কিনা—আমি এখনি ছাগলটা নিয়ে আসছি।' এই বলে সে তখনই বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে রাস্তার মোড়ে তার ডান পায়ের জুতোটা রেখে রাস্তার ধারে বনের ভিতর চুপ করে লুকিয়ে রইল।

খানিক পরেই সেই কৃষক এসে প্রথম জুতোটা দেখে মনে করল, 'খাসা জুতোটা পড়ে রয়েছে, কিন্তু এক পাটী দিয়ে কি হবে, আর এক পাটীও থাকলে ভাল হত।'

খানিক দূরে এগিয়ে গিয়ে কৃষক আর-এক পাটী জুতো দেখে ভাবল, 'আমি কি বোকা, ও পাটীটা যদি নিয়ে আসতাম। যাই, তা হলে ওটা নিয়ে আসি গিয়ে।' একটা গাছে ছাগলটা বেঁধে সে চলল জুতো আনতে। এদিকে চানু কিন্তু ছুটে গিয়ে আগেই সেটা নিয়ে এসেছে। তারপর কৃষক ছাগলটাকে বেঁধে রেখে যখন চলে গেল তখন চানুও বাঁ পায়ের জুতোটা নিয়ে ছাগলটার বাঁধন খুলে সেটাকেও নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে বুড়ির কুটিরে এসে উপস্থিত।

কৃষক গিয়ে প্রথম জুতোটাও পেল না, ফিরে এসে পরের জুতোটাও পেল না, তার উপর আবার যখন দেখল যে ছাগলটিও সেখানে নেই, তখন সে ভাবল, এখন করি কি ? গিন্নিকে যে বলে এসেছি বাজারে ছাগলটা বেচে তার জন্যে একখানা গায়ের চাদর কিনে নিয়ে যাব ! যাই তা হলে, চুপচাপ গিয়ে আর-একটা জন্তু নিয়ে আসি, তা নইলে যে ধরা পড়ে যাব—গিন্নি ভাববে আমি বোকার একশেষ।

এদিকে চানু ছাগল নিয়ে বুড়ির বাড়িতে যখন গেল তখন সেই চোরেরা ত একেবারে অবাক ! চানুকে কত করে, জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কিছুতেই সে বলল না কি করে সেই ছাগল আনল।

খানিক বাদেই সেই কৃষক একটা মোটাসোটা সুন্দর ভেড়া নিয়ে এসে উপস্থিত। চানু বলল, 'যাও দেখি, কে জবরদস্তি না করে ভেড়াটা আনতে পার।' ছয় চোরের সকলেই অস্বীকার করল। তখন চানু বলল, 'আচ্ছা, দেখি আমি পারি কি না, আমাকে একটা দড়ি দাও দেখি।' দড়ি নিয়ে চানু বনের ভিতর ঢুকে পড়ল।

এদিকে কৃষকটি তার ছাগল চুরির কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে চলেছে, মোড়ের কাছেই এসে দেখে গাছের ডালে একটা মড়া ঝুলছে। মড়া দেখেই তার গায়ে কাঁটা দিল, 'রক্ষা করো বাবা ! খানিক আগে তো এখানে মড়া-টরা কিছু দেখতে পাইনি !' সামনের মোড়ে গিয়ে কৃষক দেখল আর একটা মড়া গাছের ডালে ঝুলছে। 'রাম রাম রাম—এ হল কি ? আমার মাথাটা গুলিয়ে যায়নি ত ?' কৃষক তাড়াতাড়ি চলল। কিন্তু কি সর্বনাশ ! রাস্তার আর-একটা মোড়ে গিয়ে দেখে সেখানেও একটা মড়া ঝুলছে ! পর পর তিন-তিনটে মড়া এতটা কাছাকাছি ঝুলছে দেখে তার মনে সন্দেহ হল—'নাঃ, এ কখনই হতে পারে না। আমারই বোধ করি মাথা খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, দেখে আসি আগের মড়া দুটো এখনো গাছে ঝুলছে কি না।' কৃষক সবে মাত্র মোড়টা ফিরেছে তখন ডালের মড়া চট করে নেমে এসে বাঁধন খুলে ভেড়াটাকে নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে একেবারে বুড়ির বাড়ি গিয়ে হাজির।

এদিকে কৃষক গিয়ে দেখল মড়া-টরা কিছুই গাছে ঝুলছে না। ফিরে এসে দেখল তার ভেড়াটাও নেই, কে জানি দড়ি খুলে চম্পট দিয়েছে। তখন তার মনটা কেমন হল তা বুঝতেই পার! বেচারি মাথা খুঁড়তে লাগল—'হায়, হায়! কার মুখ দেখে আজ বেরিয়েছিলাম, এখন গিন্নি কি বলবে? সমস্ত সকালটাই মাটি হয়ে গেল, ছাগল ভেড়া দুটোই গেল; এখন করি কি? একটা কিছু এনে বাজারে বিক্রি করে গিন্নির শাল না কিনলেই চলবে না। আসবার সময় দেখেছিলাম ষাঁড়টা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, যাই, সেটাই নিয়ে আসি—গিন্নিও দেখতে পাবে না।'

চানু যখন চোরদের বাড়ি ভেড়া নিয়ে গিয়ে উপস্থিত, তখন চোরদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। সর্দার চোরাটি বলল, 'আর-একটা যদি এরকম চালাকি খেলতে পার তাহলে তোমাকেই আমাদের সর্দার করব।'

ততক্ষণে কৃষকটিও ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত, চানু বলল, 'যাও ত, জবরদস্তি না করে কে ষাঁড়টা ফাঁকি দিয়ে আনতে পার?' কেউ যখন ভরসা পেল না তখন সে বলল, 'আচ্ছা দেখি, আমি পারি কি না।' চানু বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।



কৃষকটি খানিক দূর এগিয়ে বনের মধ্যে একটা ছাগলের ডাক শুনতে পেল। ঠিক তার পরেই একটা ভেড়াও ডেকে উঠল। আর তাকে রাখে কে! একটা গাছে ষাঁড়টাকে বেঁধে রেখে ছুটল বনের ভিতর। কৃষক যত যায় ততই শোনে এই একটু আগেই ডাকছে, দেখতে দেখতে প্রায় আধ মাইল দূরে চলে গেল। তখন হঠাৎ সব চুপচাপ, ভেড়া ছাগলের ডাক আর শুনতে পাওয়া গেল না। এদিক-সেদিক খুঁজে খুঁজে কৃষক একেবারে হয়রান হয়ে গেল—কোথা বা ছাগল আর কোথাই বা ভেড়া। বেচারি কাহিল হয়ে আবার ফিরে এল। কিন্তু কি সর্বনাশ! এসে দেখে ষাঁড়টিও সেখানে নেই। বন উলট পালট করে ফেলল, কিছুতেই আর ষাঁড়ের খোঁজ পেল না।

চানু যখন ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত তখন আর কথাটি নেই। চোরেরা চানুকে তাদের সর্দার করল। তাদের আনন্দ দেখে কে, সমস্তটা দিন আমোদ করেই কাটিয়ে দিল। লুটপাট করে চোরেরা যা-কিছু আনত একটা গহ্বরের মধ্যে সব লুকিয়ে রাখত, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তারা চানুকে নিয়ে সেই সমস্ত টাকাকড়ি সব দেখিয়ে দিল—চানুই যে এখন তাদের সর্দার, তাকে সব না দেখালে চলবে কেন।

দলের সর্দার হবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে চোরেরা একদিন চানুকে বাড়ির জিম্মার রেখে চুরি করতে গেল। খালি বাড়ি, চানু সেই শয়তান বুড়িকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তুমি যে এদের ঘর-সংসার দেখ, এরা তোমাকে তার দরুন কিছু বকশিশ-টকশিশ দেয় না?'



বুড়ি। 'বকশিশ দেয়, না ওদের মাথা দেয়!'

চানু। 'বটে, কিচ্ছু দেয় না। আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে ঢের টাকা দেব।' বুড়িকে সঙ্গে করে চানু টাকার ঘরে গেল। জন্মেও বুড়ি এত ধন কোনদিন দেখে নি—মুখ হাঁ করে সেই রাশি রাশি টাকা মোহরের দিকে বুড়ি খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বুড়ির আহ্লাদ আর ধরে না। হাঁটু গেড়ে মাটিতে পড়ে দুই হাতে টাকাগুলো ঘাঁটতে লাগল। সময় বুঝে চানুও তার পকেট বোঝাই ত করলই, তারপর একটা থলে মোহর দিয়ে ভর্তি করে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের দিক থেকে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিল—বুড়ি সেই টাকার ঘরেই আটকা পড়ে রইল।

বেরিয়ে এসেই চানু সুন্দর একটা পোশাক পরলে, তারপর সেই ছাগল, ভেড়া আর ষাঁড়টাকে নিয়ে একেবারে সেই কৃষকের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। কৃষক তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির দরজায়ই বসে ছিল, তারপর সেই

হারানো জন্তুগুলিকে দেখে আহ্লাদে লাফিয়ে উঠল।

চানু বলল, 'এ জন্তুগুলো কার বলতে পার কি ?'

'এই বনের ভিতর চরে বেড়াচ্ছিল ! আচ্ছা, ছাগলটার গলায় একটা থলে ঝুলছে, তাতে দশটা মোহর রয়েছে—ওগুলিও কি তোমাদের ?

'না মশায়। আমরা গরিব দুঃখী লোক, মোহর কোথা পাব ?'

'আচ্ছা, মোহরগুলোও তোমরা নাও, আমার কিছু দরকার নেই।' মোহরগুলি নিয়ে দুই হাত তুলে কৃষক চানুকে আশীর্বাদ করল।

সমস্ত দিন চলে চানু প্রায় সন্ধ্যার সময় তার বাড়িতে এসে উপস্থিত, বাড়ির ভিতর গিয়ে দেখল তার মা-বাবা বসে আছেন। চানু বলল, 'ভগবান আপনাদের ভাল করুন, আজ রাতটা আপনাদের বাড়ি থাকতে পারি কি ?'

'আপনার মত ভদ্রলোক কি এখানে থাকতে পারবেন ? আমরা যে বড্ড গরীব।'

চানু আর চুপ থাকতে পারল না, 'বাবা, তুমি কি তোমার ছেলেকেও চিনতে পারছ না ?'

চানুর মা-বাবা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইল, তারপর চানুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এমন সুন্দর পোশাক তুমি কোথা পেলে বাবা ?'

চানু। 'পোশাক দেখেই অবাক হয়ে গেলে, তা হলে এই টাকাগুলো দেখে কি করবে ? এই বলে চানু পকেট খালি করে সব মোহর টেবিলের উপর রাখল।

এতগুলো মোহর দেখে চানুর বাবার বড্ড ভয় হল। চানু তখন সব কথা খুলে বলল—তার আশ্চর্য বুদ্ধির কথা শুনে চানুর মা-বাপের আনন্দ আর ধরে না।

পরের দিন সকালে চানু বাবাকে বলল, 'বাবা, যাও জমিদারবাড়ি। বলো গিয়ে আমি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

চানুর কথা শুনে তার বাবার চোখ বড় হয়ে গেল, 'বলিস কিরে বেটা ! তা হলে যে আমার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেবে।'

'না ! তুমি বোলো যে আমি সর্দার চোর, আমার মত ঝানু চোর দুনিয়ায় নেই, জবরদস্ত ও ওস্তাদ চোরদের ফাঁকি দিয়ে লাখ টাকা রোজগার করে এনেছি। দেখো বাবা, যখন দেখবে জমিদারের মেয়েও সেখানে আছে তখনই এ-সব কথা বোলো।'

'আচ্ছা, এত করে যখন বলছ যাচ্ছি, কিন্তু কিছু হবে বলে মনে হয় না।' প্রায় দুই ঘণ্টা পরে চানুর বাবা ফিরে এল। চানু বলল, কি করে এলে বাবা ?'

'নেহাত মন্দ নয়। মেয়েটি যে বড় অনিচ্ছুক তা ত মনে হল না, বোধ করি বাবাজি তুমি এর আগেও তার কাছে এ প্রস্তাবটি করেছ—না ? যা হোক, জমিদারমশায় বললেন আসছে রবিবারে তাঁরা একটি হাঁস ভেজে খাবেন, তুমি যদি কড়া থেকে হাঁসটা বে-মালুম চুরি করতে পার, তা হলে তিনি তোমার কথা ভেবে দেখবেন।'

'এ আর তেমন শক্ত কাজ কি ? দেখা যাবে এখন।'

রবিবার দিন জমিদার এবং বাড়ির সকলে রান্নাঘরে রয়েছেন—হাঁস ভাজা হচ্ছে, এমন সময় রান্নাঘরের দরজা খুলে গেল। একটা অতি কুৎসিৎ বুড়ো ভিখারি, পিঠে তার একটা মস্ত থলে ঝুলছে, সে এসে রান্নাঘরের দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'জয় হোক বাবা ! আপনাদের খেয়ে-দেয়ে কিছু থাকলে আমি বুড়ো ভিখারি কিছু খেতে পাব কি ?

জমিদারমশায় বললেন, 'অবশ্যি পাবে। রান্নাঘরের দাওয়ায় একটু বোসো।'

জানালার পাশে একজন লোক বসেছিল। খানিক পরে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, মস্তবড় একটা খরগোশ ছুটে বাগানের দিকে যাচ্ছে—এটাকে মারলে হয় না ?'

জমিদার ধমক দিয়ে বললেন, 'খরগোশ মারবার ঢের সময় মিলবে এখন চুপ করে বসে থাকো।'

খরগোশটা বাগানে গিয়ে ঢুকল। ভিখারি পোশাক-পরা চানু থলের ভিতর থেকে আর-একটা খরগোশ ছেড়ে দিল। একটু পরেই চাকর আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবু বাবু, খরগোশটা এখনো রয়েছে—এখনো চেষ্টা করলে মারা যায়।'

আবার জমিদার ধমক দিলেন, 'চুপ করে থাকো বলছি।'

খানিক বাদে চানু আরো একটা খরগোশ থলে থেকে বের করে ছেড়ে দিল। চাকরও চেঁচিয়ে উঠল—আর

যায় কোথা ! একজন একজন করে সবকটি চাকর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে খরগোশের পেছনে তাড়া করল, জমিদারমশায়ও বাদ পড়লেন না ।

খরগোশ তাড়িয়ে সকলে ফিরে এসে দেখে ভিখারিও নেই, কড়ার মধ্যে হাঁসও নেই ।

জমিদারমশাই বললেন, 'আচ্ছা ফাঁকিটা দিয়েছে চানু, সত্যি সত্যি আমাকে জব্দ করেছে ।'

একটু পরেই চানুদের বাড়ি থেকে একজন চাকর এসে জমিদারমশায়কে বলল, 'আজ্ঞে, আমার মনিব বলে পাঠিয়েছেন, আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ি গিয়ে খাবেন ।'

জমিদার বড় চমৎকার সাদাসিধে লোক ছিলেন, মনে একটুও অহংকার ছিল না । স্ত্রীকে ও মেয়েকে নিয়ে চানুদের বাড়ি গেলেন এবং সকলের সঙ্গে বসে নানারকমের ভাল ভাল খাবার জিনিসের সঙ্গে তাঁর সেই হাঁস ভাজাটিও খেলেন । চানুর চালাকির কথা বলে জমিদারমশায় হাসতে হাসতে পাঁজরে ব্যথা ধরিয়ে ফেললেন । মেয়েটি ত আগে থেকেই চানুকে পছন্দ করত, এখন তার পোশাক দেখে এবং তার আদব-কায়দা দেখে মনে মনে আরো খুশি হল ।

খাওয়া দাওয়ার পর জমিদার বললেন, 'চানু, শুধু হাঁস চুরি করেই আমার মেয়ে পাবে না । কাল রাত্রে আমার আস্তাবল থেকে আমার ছয়টি ঘোড়া যদি চুরি করতে পার তা হলে দেখা যাবে এখন । ছজন সহিস কিন্তু ছয়টি ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাহারা দেবে মনে রেখো ।'

চানু বলল, 'আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব এখন ।'

সোমবার রাত্রে জমিদারের আস্তাবলে ছয়জন সহিস ছয়টি ঘোড়ার পিঠে বসে আছে । বেজায় ঠাণ্ডা, রক্ত যেন জমে যেতে চায় ; তাই প্রত্যেকের জামার পকেটে একটি করে মদের বোতল, খানিক পরে পরে একটু করে মদ খেয়ে গা গরম করে নিচ্ছে । ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না, তাই সকলে মিলে মহা গল্প জুড়ে দিল—চানুর জন্য আস্তাবলের দরজা খোলাই রেখেছিল । রাত যত বেশি হতে লাগল ঠাণ্ডাও যেন বাড়তে লাগল । মদে আর শানায় না, গায়ে কাঁপুনি ধরে গেল । এমন সময় ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে একটা কদাকার বুড়ি এসে দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'বাবা সকল, শীতে জমে গেলাম, এক মুঠো খড় দাও ত, আস্তাবলের এককোণে রাতটা পড়ে থাকি, তা না হলে বুড়ো মানুষ—শীতে মরেই যাব ।' বুড়ির পিঠে ছয়টা থলে, মুখে প্রায় দু আঙ্গুল লম্বা দাড়ি—চেহারাটি কুৎসিতের একশেষ ।

বুড়ি আস্তাবলের দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'লক্ষ্মী বাপ আমার, বুড়ো মানুষ শীতে মরে গেলাম, ঐ কোণটাতে একটু জায়গা দাও, একমুঠো খড় নিয়ে পড়ে থাকব এখন ।'

সহিসরা ভাবল, এলই বা বুড়ি বেচারি শীতে জমাট বেঁধে গেল—'ও ত আর কোনো অনিষ্ট করবে না ।' আস্তাবলের কোণে খড় পেতে বুড়ি বেশ আরামে বস । সহিসেরা দেখল বুড়ি খানিক পরেই একটা কালো বোতল বের করে একটু মদ খেল—তার মুখে আর হাসি ধরে না, যেন সে খুবই আরাম বোধ করেছে । সহিসদের বুড়ি বলল, 'বাবা, তোমাদের সব বোধ করি শেষ করে ফেলেছ, তা আমার কাছে ঢের আছে । তবে কিনা তোমরা পাছে কিছু মনে কর তাই তোমাদের দিতে ভরসা পাচ্ছি না ।' একে বেজায় শীত, তার উপরে সত্যি সত্যি তাদের মদ শেষ হয়ে গেছে, বুড়ির কথা শুনে সহিসরা যেন হাতে চাঁদ পেল—'সে কি বুড়িমা, তুমি যদি দাও তা হলে ত বেঁচে যাই—ঠাণ্ডায় মরে গেলাম ।'



বুড়ির বোতলটি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল, তবুও সহিসদের শীত গেল না । শয়তান বুড়ি তখন আর-একটি বোতল বের করে তাদের দিল । এ বোতলটার মদের সঙ্গে কি মেশানো ছিল, খাবা মাত্র সব কটা সহিস ঘোড়ার পিঠে গদির উপরে বসেই নাক ডাকিয়ে ঘুম দিল ।

তখন বুড়ি উঠে সব কটা সহিসকে খড়ের উপর শুইয়ে ঘোড়াগুলোর পায়ে মোজা পরিয়ে দিল । তারপর সবগুলিকে নিয়ে একেবারে চানুদের বাইরের একটা ঘরে গিয়ে হাজির ।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জমিদারমশায় প্রথমেই কি দেখলেন ? তার বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়েই চানু ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে আর তার ঘোড়ার পিছনে পিছনে অপর পাঁচটা ঘোড়াও চলেছে ।

জমিদারমশায় অবাক হয়ে রইলেন, মনে মনে বললেন, 'গোল্লায় যা তুই চানু, আর যাদের চোখে ধুলো দিয়েছিল সে বেচারাও গোল্লায় যাক ।' আস্তাবলে গিয়ে সহিস বেটাদের জাগাতে জমিদারমশায়কে বেগ পেতে হয়েছিল ।

সকালবেলা জমিদারমশায় খেতে বসেছেন, চানুকেও ডেকে এনেছেন, খেতে খেতে চানুকে বললেন, 'কতগুলো বোকা পাঁঠার চোখে ধুলো দিয়েছ। এতে এমন বাহাদুরি নেই। আচ্ছা, আজ বেলা একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত আমি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সামনে ঘুরে বেড়াব, নিও দেখি বাপু আমার ঘোড়াটা চুরি করে! তা হলে বুঝব তুমি বাহাদুর এবং আমার জামাই হবার উপযুক্ত।'

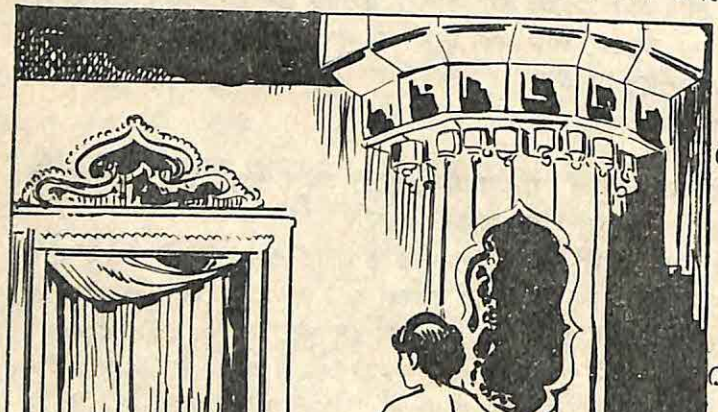
চানু মাথা নিচু করে উত্তর করল, 'যে আজ্ঞে, একবার চেষ্টা করে দেখব এখন।'

একটার পর থেকে জমিদার ঘোড়ায় চড়ে পাইচারি করে করে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন, তিনটে বেজে গেল, চানুর টিকিটিও দেখতে পেলেন না। মনে করলেন এবারে বাড়ি ফিরে যাবেন, এমন সময় তাঁর একটা চাকর পাগলের মত উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে হাজির—'কর্তা শিগ্‌গির বাড়ি যান, মা ঠাকুরনকে বুঝি বা আর দেখতে পেলেন না; সিঁড়ির উপর থেকে তিনি পড়ে গেছেন। বোধ করি হাত-পা সব ভেঙে গেছে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আমি চললাম ডাক্তারের বাড়ি।

জমিদারের চোখ বড় হয়ে গেল, 'বলিস কিরে বেটা, কি সর্বনাশ। ডাক্তারের বাড়ি যে ঢের দূর—তুই আমার ঘোড়াটা নিয়ে ছোট শিগ্‌গির।' ঘোড়ায় চড়ে চাকর তখন ডাক্তারের বাড়ি ছুটল।

জমিদারমশাই হোঁচট খেতে খেতে বাড়ি এসে উপস্থিত। বাড়ি এসে দেখলেন সাড়া শব্দ কিছু নেই, সব চুপচাপ। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বাড়ির ভেতর গেলেন, সেখানে বসবার ঘরে গিন্নি আর মেয়ে দিব্যি আরাম করে বসে আছেন। ততক্ষণে জমিদারমশায়ের চৈতন্য হল। তিনি বুঝতে পারলেন এ-সব চানু বেটারই চালাকি—বেটা তাঁকে আচ্ছা ঘোল খাইয়েছে।

খানিক পরেই দেখলেন, চানু তাঁর ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। সেই চাকর বেটার কিন্তু আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। চাকর তার জন্য একটুও কেয়ার করে না, নাইবা করল তার চাকরি—চানু যে তাকে দশটা মোহর দিয়েছিল তা দিয়ে তার অনেক দিন চলবে।



পরের দিন চানু এসে জমিদার বাড়ি উপস্থিত, জমিদার বললেন, 'তুমি বাপু এবারে নেহাত ফাঁকি দিয়েছ, ওতে তোমার উপর আমার বড্ড রাগ হয়েছে। যাই হোক আজ রাত্তিরে যদি আমাদের বিছানার থেকে চাদরখানা চুরি করতে পার তা হলে কালকেই বিয়ের আয়োজন করব।'

চানু বলল, 'আজ্ঞে আচ্ছা, একবার চেষ্টা করে দেখব, কিন্তু এবারও যদি ফাঁকি দেন তা হলে কিন্তু আপনার মেয়েকেই চুরি করে নিয়ে যাব।'

রাত্রে জমিদার আর তাঁর গিন্নি শুয়েছেন, দিব্যি জ্যোৎস্না, কাঁচের জানলার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরে পড়েছে। জমিদারমশায় দেখলেন হঠাৎ যেন একটা মাথা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে যাচ্ছিল; তাঁদের দেখতে পেয়েই আবার সরে পড়ল।

জমিদার গিন্নিকে বললেন—'দেখলে ত? এ বেটা নিশ্চয় চানু।' তারপর বন্দুকটা হাতে করে নিয়ে বললেন 'দেখো, আমি বেটাকে এখনি চমকে দিচ্ছি।'

বন্দুক দেখেই জমিদার গিন্নি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কর কি, চানুকে গুলি করবে না কি?'

জমিদার বললেন, 'আরে না, তুমি কি পাগল হলে নাকি? বন্দুকে কি আর গুলি পুরেছি—শুধু বারুদ।'

খানিক পরেই আবার জানালায় মাথা উঁকি মারল, দড়াম করে জমিদার বন্দুক ছেড়ে দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন ধপ করে কি নীচে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লেগেছে।

জমিদার গিন্নি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হায় ভগবান, বেচারি বোধ করি মরে গেছে, আর নাহয় জন্মের মত খোঁড়া কানা হয়ে থাকবে।'

জমিদার মশায় কেমন জানি থতমত খেয়ে গিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন—দরজা খোলাই পড়ে রইল।

জমিদার মশায় বোধ করি তখনো বাইরের জানালার কাছে পৌঁছাননি, কিন্তু গিন্নিঠাকরুন শুনলেন কর্তা ফিরে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'শিগগির বিছানার চাদরখানা দাও, বেটা মরেনি বোধ হয়, কিন্তু বেজায় রক্ত পড়ছে—একটু পরিষ্কার করে বেঁধে ঠেঁধে ওকে নিয়ে আসব।'

গিন্নিঠাকরুন একটানে চাদরখানা বিছানা থেকে তুলে দরজায় ছুঁড়ে দিলেন। চাদর নিয়ে জমিদার মশায় আবার ছুটলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য সেই মুহূর্তেই তিনি ফিরে এসে ঘরে উপস্থিত—সে সময়ের মধ্যে বাগানে জানালার কাছে গিয়ে ফিরে আসা একেবারে অসম্ভব।

ঘরে ঢুকেই জমিদার রেগে মেগে বলতে লাগলেন—'বেটা পাজি চানু, তোকে ফাঁসি দেওয়া দরকার।'

কর্তার কথা শুনে গিন্নি অবাক হয়ে বললেন—'বেচারির বেজায় লেগেছে আর তুমি কিনা তাকে গালাগালি দিচ্ছ!'

'ওর বাস্তবিক লাগাটাই উচিত ছিল। বেটার বদমাইশি দেখেছ? খড় দিয়ে একটা মানুষ বানিয়ে সেটাকে কাপড়-চোপড় পরিয়ে এনে জানালায় ধরেছিল।'

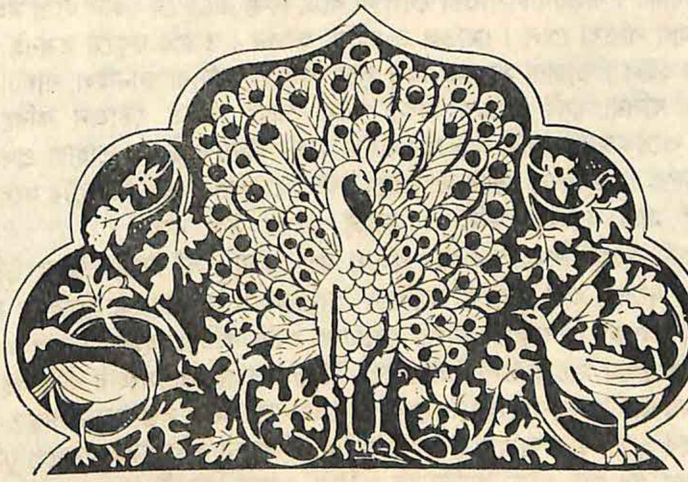
'কী ছাই মাথা মুণ্ডু বলছ, আমি বুঝতেই পারছি না। খড়ের মানুষ হলে তার রক্ত মুছবার জন্য আবার বিছানার চাদর চেয়ে নিয়ে গেল কেন?

'বিছানার চাদর—বলছ কি? আমি ত বিছানার চাদর-টাদর চাইতে আসি নি।'

'চাদর চাইতে আস আর না আস আমি সে-সব কিছু জানি না। তুমি এসে দরজায় দাঁড়িয়ে চাদর চাইলে আর আমিও তোমাকে দিয়েছি।'

গিন্নির কথা শুনে জমিদার মশায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—'কি ভীষণ শয়তান রে বাবা চানু—ওর সঙ্গে আর পেরে উঠব না। কাল সকালেই বিয়ের বন্দোবস্ত করতে হবে দেখছি।'

এরপর চানুর সঙ্গে জমিদার কন্যার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর চানু খুব ভাল হয়ে গেল—তার মত জামাই সচরাচর মেলে না। জমিদার মশায় এবং তাঁর গিন্নি শতমুখে চানুর সুখ্যাতি করেন আর লোকের কাছে বলেন—'আমার ঝানু চোর চানু।'





একবার দাক্ষিণাত্যে, নর্মদা নদীর তীরে, কোন এক গ্রামে বাঘের উপদ্রব আরম্ভ হয়। স্থানীয় বনে জঙ্গলে বাঘ এত বেশি যে, সাধারণতঃ গ্রামবাসীরা বাঘের নামে তেমন ভয় পায় না। সে আসে রাত্রিযোগে, কদাচিৎ-কদাচিৎ দু' একটা ছাগল, ভেড়া বা বাছুর লইয়া পলায়ন করে, কিন্তু সেবার একদিন সকালে চারিদিকে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। কি ব্যাপার ? গ্রামের মোড়লের একটা প্রকাণ্ড হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড়কে পাওয়া যাইতেছে না। খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল। ষাঁড়টাকে পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু রাত্রে যে কোন ব্যাঘ্র মহাপ্রভু তাহাকে লইয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। মোড়ল ত চটিয়া আগুন। তাহার হুকুমে তখনই একদল বলিষ্ঠ লোক বাঘের সন্ধানে বাহির হইল। তাহারা সন্ধ্যার একটু পূর্বে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, বাঘটা খুব বড়। সে নদীর ধারে একটা ঝোপে বসিয়া সেই ষাঁড়ের মাংস পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতেছে।

অমনি বাছা বাছা কয়েকজন শিকারী অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা প্রথমে আগুন জ্বালাইয়া, চীৎকার করিয়া বাঘটাকে সেই ঝোপ হইতে তাড়াইয়া দিল। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে ঝোপের কাছাকাছি একটা গাছের উপর মাচা বাঁধিয়া ফেলিল। গাছটা তেমন উচ্চ নহে।

সন্ধ্যার পর একজন ওস্তাদ্ শিকারী একটা প্রকাণ্ড বর্শা লইয়া সেই মাচার উপর উঠিয়া বসিল। অস্ত্রটি একেবারে ক্ষুর-ধার। দলের আর সকলে কতকটা আড়ালে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। শিকারীকে কেবলমাত্র তাহার স্থির লক্ষ্য ও কব্জীর জোরে বাঘটাকে হত্যা করিতে হইবে। অস্ত্র ফস্‌কাইলে আর রক্ষা নাই। ক্রোধোন্মত্ত বাঘ তখন মাচার উপরে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার প্রাণসংহার করিবেই। যাহা হউক, রাত্রি আন্দাজ বারোটার সময় বাঘটা খাদ্যের লোভে সেই ঝোপের ধারে অতি সন্তর্পনে উপস্থিত হইল। মানুষের গন্ধ পাইলেও তাহার ক্ষুধার জ্বালা এত অধিক যে, সে এদিক্-ওদিক্ না তাকাইয়াই ঝোপে ঢুকিয়া আহার করিতে বসিল। অন্ধকার তখন খুব গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ওস্তাদ শিকারী পাতার মর্মর শব্দ শুনিয়াই বাঘের আগমন বুঝিতে পারিল। তারপর স্থির দৃষ্টিতে অন্ধকার ঝোপের দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে বাঘের চোখ দুইটি



দেখিতে পাইয়াই, সে সজোরে বর্শা নিক্ষেপ করিল। এমনি তাহার হাতের কায়দা যে, অস্ত্রটা বাঘের পায়ের হাড় পর্যন্ত এফোঁড় ওফোঁড় না করিয়া ছাড়িল না। বাঘ রাগে উত্তেজিত হইয়া গর্জন করিতে করিতে সম্মুখের দিকে দিল এক প্রচণ্ড লাফ। সেই এক লাফে শিকারী যে গাছে ছিল, একেবারে ঠিক তাহার উপরে আসিয়া পড়িল। গাছটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের পা হইতে বর্শাটিও খুলিয়া গেল। শিকারীর ত চক্ষুস্থির। তাহার হাতে অন্য কোন অস্ত্র ছিল না।

এদিকে বাঘের গর্জন শুনিবামাত্র দূরের লোকেরা ঢাক-ঢোল পিটাইয়া ও আগুন জ্বালাইয়া সেই দিকেই ছুটিয়া আসিল।কোথায় সরিয়া পড়িল। কাছাকাছি অনেক আগুন দেখিয়া আহত বাঘ কোথায় সরিয়া পড়িল। কাছাকাছি অনেক ঝোপ্-ঝাপ্ খোঁজা হইল, কিন্তু বাঘের মৃতদেহ কোথাও পাওয়া গেল না। সে যে বেশি রকম জখম হইয়াছে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। সেই রাত্রির মত সকলে গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

মোড়ল কিন্তু নিরস্ত্র হইবার পাত্র নহে। এবার অন্য উপায়ে বাঘকে হত্যা করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই উপায়টি এ দেশের বন্য জাতেরা প্রায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। কোথাও বাঘের অত্যাচার আরম্ভ হইলে, গ্রামবাসীরা তাহার ভুক্তাবিশিষ্ট মাংসে একপ্রকার তীব্র বিষ মাখাইয়া রাখে। সেই মাংস আহার করিয়া ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বিষের কার্য আরম্ভ হয়। বাঘ অত্যন্ত কাবু হইয়া পড়ে। তাহার বুক ও জিব শুকাইয়া আসে। সে তখন নিকটবর্তী জলাশয়ে গিয়া দারুণ পিপাসা দূর করিবার চেষ্টা করে। এইভাবে অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে করিতে বাঘের মৃত্যু হয়।

এরূপ ঘটনা মোড়ল অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এ ক্ষেত্রেও সেই উপায়ে বাঘটা নিহত করিবে, স্থির ছিল। ষাঁড়ের তখনও কতকটা অবশিষ্ট ছিল। সে বিশেষভাবে জানিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মাংসের কিছুমাত্র বাকি থাকিবে, ততক্ষণ বাঘ কোথাও নড়িবে না। সেইটুকু নিঃশেষ করিয়া তবে অন্যত্র যাইবে। পরদিন সকালে মোড়লের পরামর্শ মত সেই ভয়ানক বিষ ষাঁড়ের ছিন্নভিন্ন মাংসে মাখাইয়া রাখা হইল ; এবং সে নিজে সন্ধ্যার পরে ঝোপের কাছাকাছি নদীর ধারে, একটা গাছে বন্দুক লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

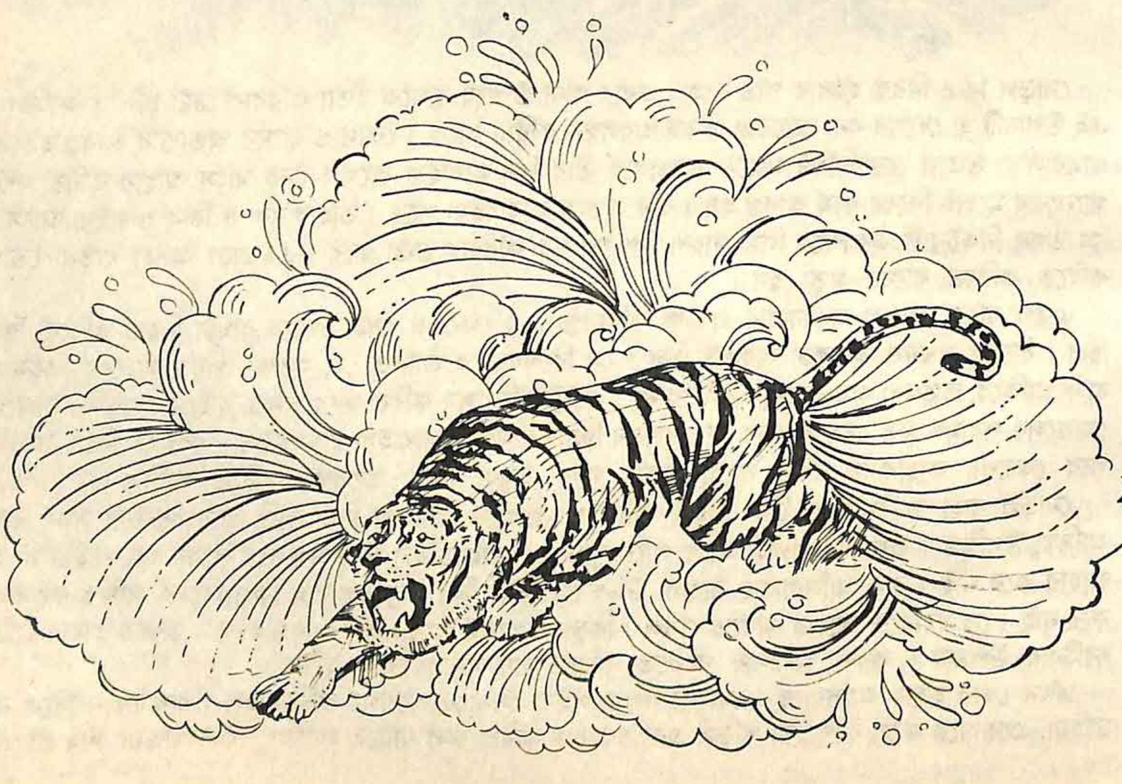
মোড়ল যাহা ভাবিয়াছিল, ঠিক তাহাই ঘটিল। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া রাত্রি প্রায় তিনটার সময় বাঘ আসিয়া উপস্থিত। কয়েকটা শৃগাল আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল কিন্তু সম্ভবতঃ বিষের গন্ধ পাইয়া মাংস আহার করে নাই। বাঘ আসিবামাত্র তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। ক্ষুধিত বাঘ কিন্তু বিষের অস্তিত্ব কল্পনাও করে নাই। সে মহানন্দে আহার করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরেই বিষের কার্য আরম্ভ হইল। তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিবার উপক্রম। করুণ আর্তনাদ করিতে করিতে সে নদীর দিকে ছুটিল।

তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে। মোড়ল বন্দুক লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল। বাঘ কোন দিকে না চাহিয়া, একেবারে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং চক্ চক্ করিয়া জল খাইতে লাগিল। জল খাওয়া শেষ হইলে,

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে আর একটা ঝোপের কাছে গিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। বুকের জ্বালা এদিকে বাড়িয়াই চলিয়াছে, সে আবার জল খাইতে ছুটিল।

বাঘের এই যাতনার অবস্থা দেখিয়া মোড়লের আর রাগ রহিল না। গুলি করিয়া সে তাহার কষ্টের লাঘব করিতে মনস্থ করিল কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মোড়ল বন্দুকের ঘোড়া টিপিবার পূর্বেই, একটা বৃহৎ কুমীর আসিয়া বাঘের ঘাড় কামড়াইয়া ধরিল। তারপর মরণাপন্ন বাঘে ও কুমীরে কি ভীষণ লড়াই! মোড়ল বন্দুক নামাইয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিল। লড়াইয়ের উত্তেজনায় বাঘ কিছুকালের জন্য সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল।

কুমীর বাঘের থাবার আঘাত অগ্রাহ্য করিয়া, তাহাকে জলের ভিতর টানিতে চেষ্টা করিতেছিল; বাঘও প্রাণপণ বলে জল তোলপাড় করিয়া, কুমীরকে ডাঙায় তুলিবার জন্য ব্যস্ত। একবার দুইটাই ডুবিয়া যায়; পরক্ষণেই আবার বাঘ মাথা তুলিয়া উঠে। কুমীর কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তাহার কামড় ছাড়ে নাই। শেষে কুমীরেরই জিত হইবার উপক্রম হইল। বিষের জ্বালা এবং কুমীরের আক্রমণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া বাঘ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল। ইহার পর কুমীর যেই মাথা তুলিয়া বাঘকে জলের তলে টানিতে যাইবে, মোড়ল অমনি নিমেষমধ্যে অব্যর্থ গুলির আঘাতে তাহাকে বিনাশ করিল। মোড়ল পরের গুলিতে বাঘকেও সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দিল।





এক ছিল রাজা।

রাজা একদিন সভায় বসেছেন—চারিদিকে তাঁর পাত্রমিত্র আমির ওম্‌রা সিপাই শান্ত্রী গিজ্ গিজ্ করছে—এমন সময় কোথা থেকে একটা দাঁড়কাক উড়ে এসে সিংহাসনের ডান দিকে উঁচু থামের উপর বসে ঘাড় নিচু ক'রে চারিদিক তাকিয়ে, অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলল "কঃ"।

কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ এ রকম গম্ভীর শব্দ—সভাশুদ্ধ সকলের চোখ এক সঙ্গে গোল হয়ে উঠল—সকলে একেবারে হাঁ ক'রে রইল। মন্ত্রী এক তাড়া কাগজ নিয়ে কি যেন বোঝাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বক্তৃতার খেই হারিয়ে তিনি বোকার মত তাকিয়ে রইলেন। দরজার কাছে একটা ছেলে বসেছিল, সে হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল, যে লোকটা চামর দোলাচ্ছিল, চামরটা তার হাত থেকে ঠাই করে রাজার মাথার উপর পড়ে গেল। রাজা মশাইয়ের চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছিল, তিনি হঠাৎ জেগে উঠেই বললেন, "জল্লাদ ডাক।"

বলতেই জল্লাদ এসে হাজির। রাজা মশাই বললেন "মাথা কেটে ফেল।" সর্বনাশ! কার মাথা কাটতে বলে! সকলে ভয়ে নিজের নিজের মাথায় হাত বুলাতে লাগল। রাজা মশায় খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে আবার তাকিয়ে বললেন, "কই মাথা কই?" জল্লাদ বেচারা হাত জোড় করে বলল, "আজ্ঞে মহারাজ কার মাথা?" রাজা বললেন "বেটা গোমুখ্যু কোথাকার, কার মাথা কিরে! যে ঐ রকম বিট্‌কেল শব্দ করেছিল তার মাথা।" শুনে সভাসুদ্ধ সকলে হাঁফ ছেড়ে এমন ভয়ানক নিশ্বাস ফেলল যে, কাকটা হঠাৎ ধড়ফড় ক'রে সেখান থেকে উড়ে পালাল।

তখন মন্ত্রীমশাই রাজাকে বুঝিয়ে বললেন, যে ঐ কাকটাই ওরকম আওয়াজ করেছিল। তখন রাজা মশাই বললেন, "ডাকো, পণ্ডিত, সভার যত পণ্ডিত সবাইকে।" হুকুম হওয়া মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাজ্যের যত পণ্ডিত সব সভায় এসে হাজির।

Accno- 15034

তখন রাজা মশাই পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে একটা কাক এসে আমার সভার মধ্যে আওয়াজ করে গোল বাধিয়ে গেল, এর কারণ কি বলতে পার ?"

কাক আওয়াজ করল তার আবার কারণ কি ! পণ্ডিতেরা সকলের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। একজন ছোকরা পণ্ডিত খানিকক্ষণ কাঁচুমাচু করে জবাব দিল,—"আজ্ঞে, বোধ হয় তার খিদে পেয়েছিল।"



রাজা মশাই বললেন. "তোমার যেমন বুদ্ধি ! খিদে পেয়েছিল, তা সভার মধ্যে আসতে যাবে কেন ? এখানে কি মুড়ি মুড়কি বিক্রি হয় ! মন্ত্রী, ওকে বিদেয় ক'রে দাও—" সকলে মহা তম্বী ক'রে বললে, "হাঁ, হাঁ, ওকে বিদেয় করুন।"

আর একজন পণ্ডিত বললেন "মহারাজ, কার্য থাকলেই তার কারণ আছে—বৃষ্টি হলেই বুঝবে মেঘ আছে, আলো দেখলেই বুঝবে প্রদীপ আছে, সুতরাং বায়স পক্ষীর কণ্ঠনির্গত এই অপরূপ ধ্বনিরূপ কার্যের নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকবে, এতে আশ্চর্য কি ?"

রাজা বললেন, "আশ্চর্য এই যে তোমার মতো মোটা বুদ্ধি লোকেও এই রকম আবোল তাবোল বকে মোটা মোটা মাইনে পাও। মন্ত্রী, আজ থেকে এঁর মাইনে বন্ধ কর।" অমনি সকলে হাঁ হাঁ করে উঠলেন "মাইনে বন্ধ কর।"

দুই পণ্ডিতের এরকম দুর্দশা দেখে সবাই কেমন ঘাবড়ে গেল। মিনিটের পর মিনিট যায়, কেউ আর কথা কয় না। তখন রাজা মশাই দস্তুর মতো খেপে গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, এর জবাব না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন সভা ছেড়ে না ওঠে। রাজার হুকুম—সকলে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। ভাবতে ভাবতে কেউ কেউ ঘেমে ঝোল হয়ে উঠল, চুলকিয়ে চুলকিয়ে কারো কারো মাথায় প্রকাণ্ড টাক পড়ে গেল। বসে বসে সকলের খিদে বাড়তে লাগল—রাজা মশাইয়ের খিদেও নেই, বিশ্রামও নেই—তিনি বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

সকলে যখন হতাশ হয়ে এসেছে, আর মনে মনে পণ্ডিতদের "মূর্খ অপদার্থ নিষ্কর্মা" ব'লে গাল দিচ্ছে, এমন সময় রোগা সুঁটকো মতো একজন লোক হঠাৎ বিকট চীৎকার ক'রে সভার মাঝখানে পড়ে গেল। রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্র উজির নাজির সবাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কী হলো, কী হলো ?"

তখন অনেক জলের ছিটা পাখার বাতাস আর বলা কওয়ার পর লোকটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বলল, "মহারাজ, সেটা কী দাঁড়কাক ছিল ?" সকলে বলল, "হাঁ-হাঁ-হাঁ, কেন বল দেখি ?" লোকটা আবার বলল, "মহারাজ, সে কি ঐ মাথার উপর দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে বসেছিল—আর মাথা নিচু ক'রে ছিল, আর চোখ পাকিয়েছিল আর 'কঃ' ক'রে শব্দ করেছিল ?" সকলে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে বললে, "হাঁ, হাঁ—ঠিক ঐ রকম হয়েছিল।" তাই শুনে লোকটা আবার ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল—আর বলতে লাগল, "হায়, হায়, সেই সময়ে কেউ আমায় খবর দিলে না কেন ?"



রাজা বললেন, "তাই তো, একে তোমরা তখন খবর দাওনি কেন ?" লোকটাকে কেউই চেনে না, তবু সে কথা বলতে সাহস পেল না সবাই বললে, "হ্যাঁ ওকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল"—যদিও কেন খবর দেবে, আর কী খবর দেবে, একথা কেউই বুঝতে পারল না। লোকটা তখন খুব খানিকটা কেঁদে তারপর মুখ বিকৃত ক'রে বলল "দ্রিঘাংঞ্চু"। সে আবার কি ! সবাই ভাবল, লোকটা খেপে গেছে।

মন্ত্রী বললেন, "দিঘাংঞ্চু কি হে ?" লোকটা বলল, "দিঘাংঞ্চু নয় দ্রিঘাংচু।" কেউ কিছু বুঝতে পারল না—তবু সবাই মাথা নেড়ে বলল" ও !" তখন রাজা মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কি রকম হে।" লোকটা বললে, "আজ্ঞে আমি মূর্খ মানুষ আমি কি অত খবর রাখি, ছেলেবেলা থেকে দ্রিঘাংচু শুনে আসছি, তাই জানি দ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে, তখন তাকে দেখতে দেখায় দাঁড়কাকের মতো। সে যখন সভায় ঢোকে

তখন সিংহাসনের ডান দিকের থামের উপর ব'সে মাথা নিচু করে, দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে, চোখ পাকিয়ে 'কঃ' ব'লে শব্দ করে। আমি তো আর কিছু জানি না—তবে পণ্ডিতেরা যদি জানেন।" পণ্ডিতেরা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বললেন "না, না, ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়নি।"

রাজা বললেন, "তোমায় খবর দেয়নি ব'লে কাঁদছিলে, তুমি থাকলে করতে কী ?"

লোকটা বলল, "মহারাজ, সে কথা বললে লোকে যদি বিশ্বাস না করে, তাই বলতে সাহস হয় না।"

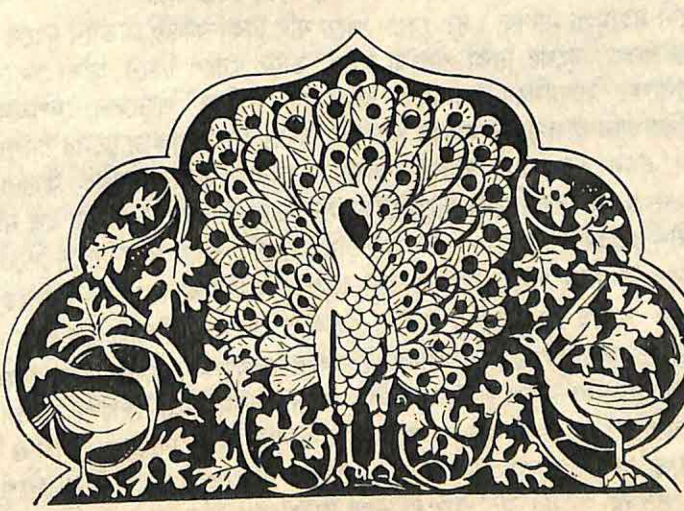
রাজা বললেন "যে বিশ্বাস করবে না, তার মাথা কাটা যাবে—তুমি নির্ভয়ে ব'লে ফেল।" সভাসুদ্ধ লোক তাতে হাঁ হাঁ ক'রে সায় দিয়ে উঠল।

লোকটা তখন বলল "মহারাজ, আমি একটা মন্ত্র জানি, আমি যুগজন্ম ধরে বসে আছি দ্রিঘাংচুর দেখা পেলে সেই মন্ত্র যদি তাকে বলতে পারতাম তা হলে কি যে আশ্চর্য কাণ্ড হত তা কেউ জানে না। কারণ, তার কথা কোনো বইয়ে লেখেনি। হায় রে হায়, এমন সুযোগ আর কি পাব ?" রাজা বললেন, "মন্ত্রটা আমায় বলত।" লোকটা বলল "সর্বনাশ ! সে মন্ত্র দ্রিঘাংচুর সামনে ছাড়া কারুর কাছে উচ্চারণ করতে নেই। আমি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি—আপনি দু'দিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালে উঠে সেটা পড়ে দেখবেন। আপনার সামনে দাঁড়কাক দেখলে, তাকে আপনি মন্ত্র শোনাতে পারেন, কিন্তু খবরদার, আর কেউ যেন তা না শোনে—কারণ, দাঁড়কাক যদি দ্রিঘাংচু না হয় আর তাকে মন্ত্র বলতে গিয়ে অন্য লোকে শুনে ফেলে, তা হ'লেই সর্বনাশ !"

তখন সভা ভঙ্গ হল। সভার সকলে এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিল, তাঁরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ; সকলে দ্রিঘাংচুর কথা, মন্ত্রের কথা আর আশ্চর্য ফল পাওয়ার কথা বলাবলি করতে করতে বাড়ি চলে গেল।
তারপর রাজা মশাই দু'দিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালবেলা—সেই লোকটার লেখা কাগজখানা খুলে পড়লেন। তাতে লেখা আছে—

"হল্‌দে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাট্‌কেল চিৎ পটাং
মুস্কিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।"

রাজা মশাই গম্ভীরভাবে এটা মুখস্থ ক'রে নিলেন। তারপর থেকে তিনি দাঁড়কাক দেখলেই লোকজন সব তাড়িয়ে তাকে মন্ত্র শোনাতেন, আর চেয়ে দেখতেন কোনো রকম আশ্চর্য কিছু হয় কি না ! কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি দ্রিঘাংচুর কোনো সন্ধান পাননি।



রাজপুত্র আর দুই বন্ধু



রাধারাণী দেবী

এক রাজপুত্র। তাঁর দুই বন্ধু। মন্ত্রি-পুত্র আর কোটাল-পুত্র। তিন বন্ধুতে পরামর্শ করলেন দেশভ্রমণে যাবেন। সঙ্গে বেশি টাকাকড়ি নিলেন না চোর-ডাকাতের ভয়ে। লোক-লস্কর সৈন্য-সামন্ত নিলেন না, দেশ-বিদেশে সব রকমের লোকের সঙ্গে মেলা-মেশার বাধা হবে বলে। সাথে রইলো সামান্য টাকা-কড়ি আর সাপের মাথার একখানি মহামূল্য মাণিক। দূর দেশে গিয়ে যদি টাকা-কড়ির অভাবে দুঃখে কষ্টে পড়েন, তাহ'লে এই মাণিকখানি বিক্রি করলে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাবে, তাতে দেশে ফিরে আসা চলবে। কাউকে কিছু না জানিয়ে সাধারণ পথিকের সাদাসিধে পোযাকে তিন বন্ধু বেরিয়ে পড়লেন দেশভ্রমণের পথে।

সাপের মাথার মাণিকখানি রাজপুত্রের মাথার পাগড়ীর তলায় ঘন কোঁকড়া চুলের রাশির নিচে অতি গোপনে লুকিয়ে রাখা হোলো এমন ভাবে যে, পাগড়ী খুললেও চুলের তলায় মাণিক কারুর নজরে পড়বে না।

তিন বন্ধু মিলে ক—ত যে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ালেন, তার আর সীমা-সংখ্যা হয় না। কত সমুদ্র—কত পাহাড়—কত নদ-নদী—প্রান্তর পার হয়ে—কত মরুভূমি ডিঙিয়ে তাঁরা দেশে-দেশে দিকে-দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কোনও দেশ দেখলেন পাহাড়-পর্বতে বনে-জঙ্গলে আঁধার আব্ছা,—কত সিংহ বাঘ হাতী কুমীর সে দেশের জলে-স্থলে ঘুরে বেড়ায়। মানুষদের চেহারা কোথাও দৈত্যের মতন! কোথাও বা ঘন কালো রঙের পাথরে খোদাই চেহারার মানুষ দেখলেন। আবার কোথাও দেখলেন চাঁদের মতো দেহের বর্ণ, অতি সুন্দর মানুষ! রূপোলী ঝরণা হ্রদ-নদী সবুজ মাঠ আর ফুল-ফলের বনে সমস্ত দেশখানি যেন ছবির মত আঁকা! কোনও দেশে বা হাজার রংয়ের পাখী হাজার স্বরে হাজার সুরে গান গাইছে! কোথাও রৌদ্র-উজ্জ্বল উত্তপ্ত মরুভূমির দেশ, কোথাও আবার বরফে ঢাকা হিমের দেশ। মানুষগুলিও যেন সে দেশে তুষার দিয়ে গড়া। তুষারের মত ধবধবে তাদের গায়ের রং, ঝাপসা নীল আকাশের মতো চোখ, সোনার-বরণ কেশ, গোলাপ

ফুলের পাপড়ির মত ঠোঁট।

নানাদেশ ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত তিন বন্ধু এসে পৌঁছুলেন চম্পাদ্বীপে। চম্পাদ্বীপ নীল সমুদ্রের মাঝ-মধ্যিখানে চাঁপা ফুলের বনে ঢাকা ছোট্ট একটি দ্বীপ। সেখানে তিন বন্ধু পথের শ্রমে ক্লান্ত হয়ে রাত্রিবেলায় এক কাঁঠালী চাঁপার ঝোপের তলায় সবুজ ঘাসের উপরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাজপুত্র নিয়ম করে দিয়েছিলেন, চার প্রহর রাত্রির মধ্যে প্রথম প্রহর তাঁরা তিনজনেই জেগে থাকবেন, দ্বিতীয় প্রহরে রাজপুত্র একলা জেগে পাহারা দেবেন, তৃতীয় প্রহরে মন্ত্রিপুত্র জেগে পাহারা দেবেন, চতুর্থ প্রহরে কোটালপুত্র জেগে থাকবেন পাহারা দিতে।

এই ব্যবস্থা এ পর্যন্ত সর্বত্র সব দেশে যেমন পালন করা হয়েছে, চম্পাদ্বীপে এসেও তাই হয়েছে। সকালে উঠে কিন্তু রাজপুত্র নিজের চুলের মধ্যে হাত দিয়ে দেখেন—সর্বনাশ!- মাণিক নেই।

সাতরাজার ধন মাণিক—সাপের মাথার মণি—সেই মণি চুরি গেছে! তিন বন্ধু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কি হবে? কি করে তাঁরা এত দূর বিদেশ থেকে নিজেদের দেশে ফিরবেন? সঙ্গে যা টাকাকড়ি ছিল, সমস্তই প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। চম্পাদ্বীপে ঐ মণি বিক্রি করে টাকা-কড়ি জোগাড় করে নিয়ে আরও খানিকটা দেশ-বিদেশ ঘুরে তারপর নিজেদের রাজ্যে ফিরবেন, ঠিক হয়েছিল। রাজপুত্র বললেন—বন্ধু, মণি বাইরের চোরে চুরি করেনি। আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনের কাছে আছে। কারণ চুলের নিচে মণি আছে, এ আমরা ছাড়া আর কারুর জানা নেই। তা'ছাড়া সারারাত্রি পাহারার ত্রুটি হয়নি। কোটালপুত্র আর মন্ত্রিপুত্র নিজের-নিজের পোষাক-আসাক খুলে ঝাড়া দিয়ে দেখালেন, মণি তাঁদের সঙ্গে নেই। রাজপুত্রও তখন উঠে নিজের সমস্ত পোষাক আর দেহ ঝেড়ে দেখালেন—তাঁর কাছেও মণি নেই।

মন্ত্রিপুত্র বললেন—চলো এদেশের রাজসভায় গিয়ে বিচার প্রার্থনা করে বলিগে, আমাদের মাণিকটা তাঁরা উদ্ধার করে দিন।

রাজপুত্র বললেন—কিন্তু আমাদের তিন বন্ধুর মধ্যে বন্ধুত্ব অটুট্ রেখে মাণিক বার করা চাই। যদি বন্ধুত্বই ভেঙে যায় তুচ্ছ মাণিকের জন্যে, তা'হলে সে-মাণিক আর আমাদের কোন্ কাজে লাগবে বলো?

কোটালপুত্র বললেন—ঠিক, ঠিক বলেছো বন্ধু।

তিন বন্ধু মিলে তখনই সে দেশের রাজার সভায় গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে মাণিকটি যাতে পাওয়া যায় অথচ তিন বন্ধুর গভীর বন্ধুত্ব একটুও না নষ্ট হয় এই প্রার্থনা জানালেন।

সমস্ত ঘটনা শুনে সেদেশের রাজা বললেন—এ অসম্ভব। বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চাইলে মাণিকের আশা ছেড়ে দিতে হবে। আর, মাণিক পেতে হলে একজন বন্ধুর বন্ধুত্ব হারাতে হবে।

রাজপুত্র বলে উঠলেন—আমি একটি বন্ধুরও বন্ধুত্ব হারাতে চাই না। তার চেয়ে মাণিক না পাই সেও ভালো। কোটালপুত্র বলে উঠলেন—বাঃ! তা কি হয়? মহামূল্য মণি অম্নি হারালেই হোলো নাকি?

মন্ত্রিপুত্র ধীরে ধীরে বললেন—না মহারাজ! আমরা বন্ধুত্বও হারাতে রাজী নই, মাণিকও হারাতে রাজী নই। আমাদের এই ব্যবস্থাই আপনি করে দিন।

তখন বৃদ্ধ মন্ত্রী উঠে বললেন, এ ব্যাপারের মীমাংসা করা অতি কঠিন। শুনেছি, পৃথিবীর কোন্ দেশে এক রাজ্য আছে,—সেখানে রাজার সিংহাসনে বসেন সে-দেশের পরমাসুন্দরী রাজকুমারী, আর সে-রাজ্যের শাসন-কাজ চালান এক অদ্ভুত জ্ঞানী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি শুক পক্ষী। যত কঠিন বিচার আর কঠিন মীমাংসার কাজ হোক না—সেই জ্ঞানী শুক নাকি নির্ভুল মীমাংসা করতে পারেন।



তিন বন্ধুতে আবার যাত্রা করলেন দেশান্তরে। কোনোখানেই খবর পান না, কোন্ রাজ্যের রাজার আসনে বসেন সে-দেশের কুমারী রাজকন্যা, আর শাসন-কাজ করেন শুক পক্ষী। কেউ হদিশ দিতে পারে না।

কষ্টে—দুঃখে—পথশ্রমে অনাহারে আধপেটায় তিন বন্ধুর চেহারা শীর্ণ হয়ে গেল, রং হলো মলিন। কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে ছিঁড়ে গেল।

একদিন এক প্রান্তরের শেষে প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলায় রাত্রি কাটাবার জন্যে তাঁরা শুয়েছেন। মাঝের প্রহরে রাজপুত্র জেগে যখন ঘুমন্ত দুই বন্ধুকে পাহারা দিচ্ছেন—সেই সময় গভীর নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি শুনতে পেলেন সেই মহাবৃক্ষের মগডালে এক কপোত আর এক কপোতী কথা কইছে। কপোতী বলছে—দেখ কপোত, কত কষ্টে বাজপক্ষীর গ্রাস থেকে তুমি আমার বাছাকে বাঁচিয়ে এনে দিলে,—কিন্তু আজ পর্যন্ত খাঁটি এক ফোঁটা রাজরক্ত তুমি কিছুতেই জোগাড় করে আনতে পারলে না। বাছা কি আমার তবে

চিরকালের জন্য অন্ধ হয়ে থাকবে ?

কপোত জবাব দিলো—কপোতি, খাঁটি রাজরক্ত মেলা সত্যিই কঠিন। যে-রাজার বাপ-পিতামহ চৌদ্দ-পুরুষ যথার্থ রাজচক্রবর্তী রাজা ছিলেন,—তাঁরই দেহ থাকে খাঁটি রাজরক্ত। নাহলে সংসারে কত—চোর, ডাকাত, বেণে,—তারাও বুদ্ধিবলে বা অর্থবলে কোন রকমে রাজ-সিংহাসনে উঠে মাথায় মুকুট চড়িয়ে বসে থাকে। তাদের দেহের শিরায় তো আর রাজরক্ত বয় না ! রাজরক্ত বড়ো দুর্লভ সামগ্রী কপোতি ! সত্যিই তোমার ছেলের অন্ধ চোখ সারাতে আমি পারবো কিনা সন্দেহ !

রাজপুত্র শুনতে পেয়ে চুপ করে ভাবতে লাগলেন। মনে হলো তাঁর, একবার পরীক্ষা করে দেখলে হয়, আমার উপরের চতুর্দশ পুরুষ সত্যিই অভিজাত রাজা ছিলেন কিনা।

ভোর না হতেই কপোত খাবার খুঁজতে বাসা ছেড়ে উড়ে চলে গেল। রাজপুত্র সেই উঁচু বৃক্ষের উপরে চড়ে কপোত কপোতীর বাসায় পৌঁছুলেন। গিয়ে দেখেন, বাসার মধ্যে মস্ত বড় বড় হীরে মোতি মাণিক রয়েছে। এদের এক একটির দাম হবে লক্ষ লক্ষ সোনার মোহর। সেই সব দামী রত্ন নিয়ে অন্ধ একটি ছোট পাখী খেলা করছে একা একা। মানুষের গন্ধ পেয়ে অন্ধ ছানা ভয়ে চীৎকার করে উঠলো—কে ?—কে ?—কে ?

রাজপুত্র তরবারি দিয়ে নিজের বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের ডগাটি কেটে ফেললেন। ফিন্‌কি দিয়ে তাজা গরম রক্ত ছুটে কপোত-ছানার চোখ-মুখ রাঙা করে দিলো। ছানা তার হারানো দৃষ্টি ফিরে পেয়ে চেয়ে দেখলে চোখের সামনে এক পরম রূপবান যুবা। কিন্তু তার কাপড়-চোপড় ছেঁড়া আর ময়লা।

ছানা বললে—তুমি কে ? নিজের দেহের রক্ত দিয়ে আমার অন্ধ চোখে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলে তুমি। শুনেছিলুম, খাঁটি রাজরক্ত না হলে বাজপাখীতে- ঠোক্‌রানো অন্ধ চোখ সারে না কোন দিন। কিন্তু, তোমাকে দেখে তো রাজা কিংবা রাজপুত্র বলে মনে হচ্ছে না।

রাজপুত্র বললেন—আমি দরিদ্র পথিক। আমার সর্বস্ব খোয়া গেছে। এখন চলেছি সেই দেশের সন্ধানে,—যেদেশে শুকপক্ষী রাজ্য শাসন করে।

ছানা বললে—তা'হলে তুমি আমার এই খেলনাগুলি নিয়ে যাও। আমি একলাটি বাসায় বসে থাকি বলে বাবা আমাকে এনে দিয়েছেন। এগুলি শুনেছি খুব দামী। বিক্রি করলে তোমার অভাব ঘুচবে।

রাজপুত্র বললেন—উপকার করে তার দাম গ্রহণ করতে নেই। তা হলে আমার স্বভাবে বৈশ্যগুণ এসে যাবে। এই দামী রত্নগুলির একটিও নিতে পারবো না। তোমার চোখ যে সেরে গেছে এতেই আমি যথেষ্ট খুশি।, আর কিছু দরকার নেই।

এমন সময়ে হুস্ হুস ডানার আওয়াজ তুলে কপোত কপোতী বাসায় ফিরে এলো বাচ্ছার জন্য খাবার নিয়ে।

বাচ্ছা আনন্দে চেঁচিয়ে বললো—বাবা—মা,—আমি তোমাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গরীব পথিকটি এঁর আঙুল কেটে তাজা রক্তে আমার চোখ সারিয়ে দিয়েছেন।

কপোত রাজপুত্রকে ভক্তিভরে প্রণাম করে জোড়হাতে বললো—মহারাজ, আপনি যথার্থই রাজচক্রবর্তী রাজা বটে। তা না হলে এত দয়া, এত মহত্ব, এত বিবেচনা সাধারণ মানুষের কি হতে পারে ?



বাচ্ছা বাধা দিয়ে বলে উঠলো—বাবা, উনি রাজা বা রাজপুত্র নন, একজন গরীব পথিক। কিন্তু এই রত্নগুলি উনি নিতে চাইছেন না।

ছানাকে ধমক দিয়ে কপোত বললে—চুপ্ কর। তুই কী বুঝিস্ ? ছদ্মবেশী রাজপুত্র আর যার চোখেই ধুলো দিন আমায় ভুলোতে পারবেন না। রাজচক্রবর্তী রাজপুত্র না হলে এমন কোনও সাধারণ মানুষ নেই, যে আমার এই মহামূল্য হীরা মাণিক মোতিগুলি নেবো না বলে ফিরিয়ে দিতে পারে ! তা ছাড়া যথার্থ রাজরক্ত ভিন্ন তোমার অন্ধত্ব কখনও সারতে পারে না।

রাজপুত্র বললেন—তুমি ঠিকই বুঝেছ ভাই ! আমি এক দেশের রাজপুত্র। ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বেরিয়েছি। কাল রাত্রে তোমাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে আজ সকালে তোমার ছানাকে রাজরক্ত দিতে এসেছিলুম।

কপোত বললে—রাজকুমার ! আপনি কোথায় যাবেন, হুকুম করুন। আমি আপনাকে পিঠে করে সেখানে পৌঁছে দেবো।

রাজপুত্র বললেন—আমি একলা নই, তিনজন। আমরা যাবো যে-দেশে, সে দেশের ঠিকানা আমরা জানি না। যে-দেশে শুকপক্ষীতে রাজ্যের বিচার-কার্য চালায়, সেই দেশে আমি যেতে চাই।

কপোত বলল—সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত দেশ আমার নখের আয়নায় জানা। আমি জানি সেই রাজ্য—যে-রাজ্যে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা দেশের রাণী, শুকপক্ষী রাজসভায় বিচার করে। রাজকুমার, আপনি আমার পিঠে চড়ে বসুন। আমি সাগরপাড়ে সেই রাজ্যে আজই আপনাকে পৌঁছে দেবো।

রাজকুমার বললেন—আমরা যে তিনবন্ধু।

কপোত বললে—আচ্ছা, তাহ'লে আমাদের তিনজনের পিঠে আপনারা তিনজনে চড়ে চলুন, পৌঁছে দিচ্ছি।

রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র আর কোটাল পুত্র কপোত কপোতী আর তাদের ছানার পিঠে চড়ে চোখ বুজে সমুদ্র পার হলেন মেঘলোকের উপর দিয়ে। তারপর গিয়ে নামলেন সেই রাজ্যের মাটীতে, যেখানে শুকপক্ষী বিচার করে।



তিনবন্ধু গেলেন সে রাজ্যের বিচার-সভায়। রাজসিংহাসনের উপরে রাজকন্যা সুদর্শনা রাজার বেশে বসে আছেন। তাঁর পাশে রত্নের পিঞ্জরে একটি শুকপক্ষী রয়েছে। সেই শুকপক্ষীর চারিদিকে পাত্র-মিত্র সভাসদ্‌রা যে যাঁর স্থানে বসে আছেন। রাজপুত্র বিচার-সভায় গিয়ে চুরির কাহিনী বলে বিচার প্রার্থনা করলেন বললেন—এমন বিচার করুন, যাতে তিনবন্ধুর বন্ধুত্ব থাকে, অথচ, মাণিক পাওয়া যায়।

শুকপক্ষী বললেন— এ মামলার বিচার প্রকাশ্য সভায় হবে না। নির্জন ঘরে বিচার করতে হবে। রাজবেশী রাজকন্যা তৎক্ষনাৎ নির্জন ঘরে শুকপক্ষীকে রত্ন-খাঁচা সমেত সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে আসার হুকুম দিলেন।

শুকপক্ষী বললে—প্রথমে শুধু রাজপুত্র একা আসবেন। আমি একা তাঁর সঙ্গে কথা কইবো।

রাজপুত্র নির্জন ঘরে এলে শুকপক্ষী বললে,—রাজকুমার, প্রথমে আপনাকে আমার একটি গল্প শুনে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তারপরে আমি বিচার করবো। এক দেশে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা ছিলেন। তিনি খুব ধর্মবতী। এক দিন তিনি নর্মদা নদীতে প্রাতঃস্নান করে বাড়ী ফিরছেন, এমন সময় এক কুষ্ঠরোগী ভিখারী তাঁর পথ রোধ করে তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলে। রাজকন্যা ভিক্ষা দিতে গেলেন, সে বললে,—আমি ধন-রত্ন চাই না। আমি যা চাই, তা যদি দিতে পারো, নেবো, নাহলে তোমার দান নেবো না।

রাজকন্যা বললেন—বলো তোমার কী চাই? সাধ্য হলে নিশ্চয় দেবো।

কুষ্ঠ রোগী বললে—আমি তোমাকে বিয়ে করে বৌ রূপে চাই।

রাজকন্যা বললেন—আমার বাবা আমাকে এক রাজপুত্রের বাগ্‌দত্তা বধূ করে রেখেছেন। আমি বাগ্‌দত্ত স্বামীর মত না নিয়ে তো তোমায় বিয়ে করতে পারি না।

কুষ্ঠ রোগী একটু ভেবে বললে—আচ্ছা, আমি তোমাকে চিরদিনের জন্য বৌ করে পেতে চাই না। তোমাকে খাওয়াতে পরাতে আমার ক্ষমতায় কুলোবে না। তুমি বরং রাজপুত্রকেই বিয়ে কোরো। কিন্তু আগে অন্ততঃ একদিন এক রাত্রির মত আমাকে অল্পক্ষণের জন্য বিয়ে করে বৌ হয়ে পদসেবা করে যেয়ো।

রাজকন্যা বললেন—আচ্ছা।

তিনি প্রভাতের প্রথম প্রার্থীকে কখনও বিমুখ করতেন না, ভিখারীটা তা জানতো, তাই প্রভাতেই প্রার্থনা করেছিল। কিছুদিন বাদে রাজকন্যার সেই বাগ্‌দত্ত রাজপুত্রের সঙ্গে খুব ঘটা করে বিয়ে হোলো। বিয়ের পর রাজপুত্র বাসর-ঘরে যখন বসেছেন, রাজকন্যা তাঁকে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা জানালেন। তারপরে বললেন,—তুমি যদি আমায় সেই কুঠে-ভিখারীর কাছে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য তার স্ত্রী হয়ে তার পদ-সেবা করে আসতে হুকুম দাও, তবেই আমি তার কাছে যাবো। তুমি যদি হুকুম না দাও, তা হলে আমি তার স্ত্রী হয়ে পদ-সেবা করে আসবো না। কিন্তু আমাকে একবার ছেড়ে দিতে হবে, আমি গিয়ে তাকে বলে আসবো সত্য কথা। এইরাত্রে আমাকে সেখানে যেতে হবে।

রাজপুত্র একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন—তুমি সত্য-বদ্ধ আছো, আমি তোমায় মিথ্যাবাদী করবো না। সে যদি তোমাকে তার পদ-সেবা করতে বলে, করে এসো।

রাজকন্যা সর্বাঙ্গে রত্ন হীরা, সোনা, মণি-মুক্তা পরে নব-বধূ বেশে রাজপথ দিয়ে গভীর রাত্রে সেই ভিখিরীর কুটীরের পানে চলেছেন। পথে এক প্রকাণ্ড বাঘ 'হালুম' করে এসে দাঁড়ালো। নধর মানুষের মাংস দেখে তার জিভে জল এলো।

রাজকন্যা হাত জোড় করে বললেন—বাবা, একটু অপেক্ষা করো, আমি সত্য রক্ষা করে ফিরে এলে তুমি আমার মাংস খেয়ো পেট ভরে। আমি নিশ্চয়ই ফিরবো।

বাঘ বললে—আচ্ছা, আমি বসে রইলুম। আবার যেতে যেতে এক চোর সিঁধ কাঠি হাতে গভীর নিশীথে নির্জন পথে রাজকন্যার সামনে পড়লো। চোরের চোখ দুটো লোভে জ্বলে উঠলো। ঈষ্! কী দামী হীরা-মতি রত্ন এই মেয়েটির সর্বাঙ্গে। এই গয়নাগুলি চুরি করতে পারলে এ-জীবনে আর খেটে খেতে হবে না।



রাজকন্যা বললেন—বাবা, একটু সবুর করো। আমি আমার সত্য রক্ষা করে ফিরে এসে তোমাকে আমার সমস্ত রত্ন অলঙ্কার খুলে দেবো। বিশ্বাস করো।

চোর বললে—আচ্ছা। এইখানে বলে রইলুম।

কুষ্ঠ-রোগীর নোংরা ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে গিয়ে রাজকন্যা দাঁড়ালেন। বললেন,—আমি এসেছি তোমার পদ-সেবা করতে।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে কুষ্ঠ-রোগী রাজকন্যার সেই ভুবন-আলো-করা রূপ দেখে চমকে গেল। মা জগদ্ধাত্রী দুর্গা নিজে বুঝি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন মনে ভেবে জোড়-হাতে মাতৃ-স্তব পাঠ করে প্রণাম করলো!

রাজকন্যা বললেন—তুমি যে বলেছিলে, আমি তোমার পদ-সেবা করলে তোমার জীবনের সব চেয়ে বড় সাধ পূর্ণ হবে।

জিভ্ কেটে চোখ্ বুজে কানে আঙুল দিয়ে ভিখারী বললে—মাগো, কত জন্ম জন্ম মহাপাপ করে কুষ্ঠ-রোগী হয়েছি। আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল তাই স্বর্গের মা দুর্গাকে আমি এমন নীচু কথা বলেছিলুম। আমায় ক্ষমা করে তোমার চরণের ধুলো দিয়ে পবিত্র করে যাও মা!

রাজকন্যা ভিখারীকে আশীর্বাদ করে বেরিয়ে আবার ফিরে চল্লেন স্বামীর বাসরঘরে রাজপ্রাসাদের পানে। পথে দেখা হোলো সেই চোরের সঙ্গে। সে বসে আছে তখনও। রাজকন্যা সর্বাঙ্গের গহনা খুলে বললেন,—এই নাও বাবা, এই রত্ন, অলঙ্কার সমস্ত তোমাকে দিচ্ছি।

চোর পায়ে পড়ে কেঁদে বললে—মা, আমাকে ক্ষমা করে এই পাপ প্রবৃত্তি দূর করে দাও। আমি জীবনে এমন কোনও মানুষ কখনও দেখিনি যে ধনরত্ন চুরির হাত থেকে বাঁচাবার পরে আবার ফিরে এসে চোরের মনস্কামনা পূর্ণ করতে নিজের যথাসর্বস্ব তুলে দেয়। মা, তুমি নিশ্চয় কোনও দেবী। আমাকে ক্ষমা করো।

তারপর দেখা হোলো সেই ভীষণ বাঘের সঙ্গে।

রাজকন্যা বললেন—এইবার তুমি আমার মাংস ভোজন করে তৃপ্ত হও বাছা।

বাঘ বললে—না, আমি তোমায় খাবো না। আমি আমার জীবনে কখনো এমন কোনও জীব দেখিনি, যে আমার মুখে পড়ে বলে, আমি আবার ফিরে এসে ধরা দেবো ; তখন আমার মাংস খেয়ো। এমন অদ্ভুত কথা শুনে আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিলুম বটে, কিন্তু বিশ্বাস করিনি যে, তুমি আবার সত্যি আমার মুখে ফিরে আসবে! কিন্তু তুমি আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছো। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি সাধারণ মানুষ নও। তোমাকে খেয়ে কি শেষে বদ্‌হজমের গোলমালে পড়ে যাবো? তুমি মানবীর রূপ ধরে স্বর্গের দেবী-টেবী হবে হয়তো। আমার যখন এতোই আশ্চর্য লাগছে, তখন থাক্ তোমার মাংস খেয়ে আর কাজ নেই। আমি চললুম।

বাঘ নিজের পথে চলে গেল। রাজকন্যা ভোর রাত্রে বাসর-ঘরে ফিরে এসে রাজপুত্র স্বামীর পায়ে প্রণাম করলেন।



শুকপক্ষী গল্প বলা শেষ করে বললে—রাজকুমার, বলো দেখি, এই বিয়ের বাসরের রাজপুত্র-বর, ক্ষুধার্ত হিংস্র বাঘ আর ঐ লোভী চোর এই তিনজন রাজকন্যাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিল বিশ্বাস করে, এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

রাজপুত্র বললেন—রাজপুত্র।

শুকপক্ষী বললে—কেন?

রাজপুত্র বললেন—এ তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হীরা-মুক্তা মণি-মাণিক্য এমন কিছু জীবনের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী নয়, যা চোর ত্যাগ করেছিল। পেট-ভরে খাওয়াটাও এমন কিছু বড়ো কথা নয়, জীবনে প্রাণের চেয়েও যখন মানই বড়ো। সুতরাং বাঘও শ্রেষ্ঠ নয়। কিন্তু রাজপুত্র তাঁর জীবনের মান-সম্মান আর শ্রেষ্ঠ আনন্দ-রাত্রিকে সত্য পালনের জন্য, ধর্মের জন্য ত্যাগ করে যে মহত্ত্ব দেখিয়েছেন, এইটেই সকলের চেয়ে বড়ো মনে হয়। কারণ, সত্যের চেয়ে, ধর্মের চেয়ে, ন্যায়বিচারের চেয়ে জগতে বড়ো আর কিছুই নেই।

শুকপক্ষী বললে—সাধু! সাধু! রাজপুত্র! তুমি যথার্থ রাজার ছেলের যোগ্য উত্তর দিয়েছ। আচ্ছা, তুমি

এখন তোমার বন্ধু মন্ত্রিপুত্রকে এই ঘরে পাঠিয়ে দাও।

মন্ত্রিপুত্র এলেন। শুকপক্ষী তাঁকে বসিয়ে সেই একই গল্পটি সুন্দর করে বললেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা বাপু, বলো দিকি, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার আর মনের জোর কার ?

মন্ত্রিপুত্র বললেন—বাঘের।

শুকপক্ষী বললে,—কেন ?

মন্ত্রিপুত্র বললেন—স্ত্রী বলুন, ধনরত্ন বলুন, এ-সমস্তই গেলে আবার হয়। কিন্তু ক্ষুধার সময় দুষ্প্রাপ্য আহার হাতে পেয়েও ছেড়ে দেওয়া মানে নিজের জীবন



বিপন্ন করা। তা ছাড়া, ক্ষুধা এমন ব্যাপার যে, পেটে অনল জ্বলে উঠলে জ্ঞানগম্যি থাকে না। সকলকার চেয়ে মনের জোর আর' ত্যাগস্বীকার তাই বাঘেরই।

শুকপক্ষী হেসে বললে—বুঝেছি। তুমি একটি পেটুক-শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা, এইবার তোমাদের বন্ধু কোটালপুত্রকে পাঠিয়ে দাও।

কোটালপুত্রকেও সমস্ত গল্পটি বলে শুকপক্ষী তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করলে।

কোটালপুত্র বললেন—সবচেয়ে ত্যাগ-স্বীকার এবং মনের জোর চোরের।

শুকপক্ষী হেসে বললে—কেন ?

কোটালপুত্র বললে—দেখ, এই সংসার শুধু টাকার বশ। যার যত ধন-বল আছে, তার তত শক্তি, সুখ, ঐশ্বর্য—বিপুল মূল্যের ধনরত্ন নিজের হাতের মধ্যে পেয়েও সামান্য চোর তার লোভ সংবরণ করে ছেড়ে দিয়েছিল এটা অত্যন্ত কঠিন। চোরের এই ত্যাগের সঙ্গে রাজপুত্র বা বাঘের তুলনা হতে পারে না।

শুকপক্ষী বললে—বাছাধন ! সাপের মণিখানি বের করে এই খাঁচার মধ্যে আমার কাছে দাও দিকি। আর

বলতে হবে না কে এই মণি চুরি করেছে ! আমার কাছে দিয়ে দিলে আমি তোমার আর দুই বন্ধুকে জানাবো না তোমার কাছে পেয়েছি। তাহলে তোমাদের তিন বন্ধুর মধ্যে কে চুরি করেছিল প্রকাশ পাবে না, মণিও পাওয়া যাবে। মণি যে তোমার দেহের মধ্যেই আছে কোন সন্দেহ নেই।

কোটালপুত্র তখন নিজের বাম উরুর ভেতর সেলাই করে লুকিয়ে রাখা মণি বার করে শুকপক্ষীকে দিলেন।

শুকপক্ষী বললে—আচ্ছা, এইবার তুমি বাইরে যাও, গিয়ে আমার ভৃত্যদের পাঠিয়ে দাও।

রাজকুমারীর আদেশে তখন ভৃত্যেরা রত্নপিঞ্জর আর মাণিকসহ শুকপক্ষীকে এনে আবার রাজসভায় সিংহাসনে বসিয়ে দিল।

শুকপক্ষী বললে—এই তোমাদের মাণিক নাও। কার কাছে পাওয়া গেছে বলবো না। তোমাদের বন্ধুত্ব বজায় রইলো, মাণিকও মিললো। কেমন ? বিচার ঠিক হয়েছে তো ?

তিনজনেই সমস্বরে বললে—হাঁ, ঠিক হয়েছে।

তখন শুকপক্ষী বললে—এই রাজ্যের রাজা বা রাণী হচ্ছেন এখানকার রাজকন্যা সুদর্শনা। আমি প্রস্তাব করছি, এই রাজপুত্রের সঙ্গে আমাদের রাজকুমারীর বিয়ে দেওয়া হোক। রাজকুমারীর স্বর্গগত পিতামাতা বলে গেছেন, তাঁদের কন্যার যেন তাঁরই সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়, যাঁর দেহে খাঁটি রাজরক্ত আছে। আমার ধারণা এই মহান্ চরিত্র রাজকুমারের শরীরে যথার্থ অভিজাত রাজবংশের রক্ত বইছে। মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্র, মিত্র, আপনারা সকলে বিবেচনা করুন এই পরম সুন্দর আর পরম মহৎ রাজকুমারের হাতে আমরা আমাদের কুমারী রাণীকে দান করবো কিনা ?

সভার সকলে সমস্বরে প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তারপর ?—

তার আর কি !—গান-বাজনা—বাজী পোড়ানো—আলোর মালায় সারা রাজ্য সাজানো—মিঠাই—মণ্ডা —লুচি মিষ্টির পাহাড় পর্বত—ক্ষীর দই রাবড়ী সরবৎএর নদী-নালা—ফুলের মালা—ফুলের তোড়া—ফুলের তবক—সুরভিসারের মন-মাতানো গন্ধ—রসুন-চৌকিতে সানাইয়ে রাগ-রাগিণীর মিষ্টি আলাপ। দান-ধ্যান—আদর আপ্যায়ন।

পরমা সুন্দরী রাজকন্যা সুদর্শনাকে নিয়ে রাজপুত্র দুই বন্ধুসহ মা-বাপের কাছে ফিরে এলেন একদিন।

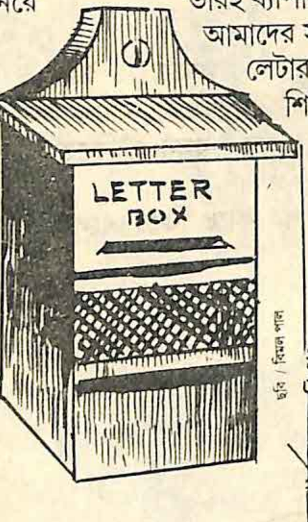


সৌ·কা·মা·বি·প বনাম ঘনাদা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ছুটির দিন। দুপুর বেলা খাওয়াদাওয়া শেষ হতে একটু দেরিই হয়। তবু যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সে পাট চুকিয়ে ঘনাদা তাঁর খাওয়া সেরে—নিজস্ব সেই চিলের ছাদের টঙের ঘরে উঠে যাওয়ার পরই সবাই একসঙ্গে দোতলার সিঁড়ির বাঁকে শিশিরের ঘরে গিয়ে জমায়েৎ হয়েছি।

জমায়েৎ যে হয়েছি তা ঠিক খোশ-মেজাজ নিয়ে গুলতানি করবার জন্য নয়। তার বদলে রীতিমত একটা লজ্জা আর অপমানের জ্বালা নিয়ে। লজ্জা আর অপমানের জ্বালাটা যা নিয়ে তারই ব্যাপারেই শিবু তখন নিচের খাবার ঘরে খাওয়া শেষ করার পর আমাদের সঙ্গে ওপরে না এসে বাইরের গেটের পাশের লেটারবক্স হাতড়াতে গেছে আর আমরা শিশিরের ঘরে এসে জড় হয়ে অধীর আগ্রহে তার জন্যে অপেক্ষা করছি।





ছবি / বিমল দাশ

অপেক্ষা বেশীক্ষণ করতে হ'ল না। মিনিট দশেকের মধ্যে শিবু এসে হাজির হ'ল কিন্তু যে চেহারা নিয়ে সে দেখা দিলে তাতে ফলাফল সম্বন্ধে কোন সংশয়ের অবকাশ না থাকলেও হতাশ কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না—

কি আজও কিছু নেই?

থাকবে না কেন—শিবু হতাশ কণ্ঠটা আরো গাঢ় করে জানালে—যা থাকবার তাই আছে।

তার মানে নেই—টিটকিরির চিরকুট!—হতাশার সঙ্গে বেশ একটু ক্ষোভের জ্বালা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেও

শিবুর হাত থেকে চিরকুটটা নিয়ে না পড়ে পারলাম না।

পড়ার অবশ্য নতুন কিছু নেই। বেশ কিছুক্ষণ থেকে সোজাসুজি স্পষ্ট সমস্যার ধাঁধাটার বদলে যে ধরনের জ্বালা ধরানো টিটকিরির চিমটি আসছে তারই আর একটু নমুনা।

এবারেও সেই পোষ্টকার্ডের মাপের একটা ধবধবে শাদা কার্ড। তার সম্বোধন নেই। কোথা থেকে আসছে তার কোন হদিশ নেই। কার্ডের মাঝামাঝি মোটা মোটা অক্ষরে শুধু লেখা—**দুয়ো**।

এ রকম কার্ড এ ক'দিন আরো কয়েকটা পাওয়া গেছে। এক না হলেও সবগুলিই অপমান করা টিটকিরি দিয়ে লেখা।

এই জাতেরযে কার্ড পাওয়া গেছে তাতে তার ভাষণ সংক্ষিপ্ত হলেও ভাষা একটু বিস্তারিত ছিল।

মাপজোক এক হলেও সে কার্ডে বক্তব্য একেবারে অস্পষ্ট নয়।

লেখার ধরন ধারণ অবশ্য এক প্রমাণ আকারের শাদা কার্ডের মাঝখানে পর পর মোটা মোটা অক্ষরে তিনটি কথা সাজানো।

কে না কারা?
এখনো বুঝলে কিছু
দুয়ো।

এর পরের চিঠিটা আর একটু বড় হলেও মোটেই ধোঁয়াটে নয়। তার একটি খোঁচাই স্পষ্ট করে দেওয়া পর পর তিন লাইনে সাজিয়ে লেখা—

কোথায় এখন
টঙের ঘরের তিনি!
ডুব মেরেছেন কোথায়?

নিয়মিত ভাবে পর পর এক ধরনের ভেংচিকাটা চিঠি নিয়ে মেজাজগুলো তখন আমাদের কি হয়েছে তা বোধহয় বলে বোঝাবার দরকার নেই।

এ যে মৌ-কা-সা-বি-স এর কাণ্ড সে বিষয়ে কোনমতেই আমাদের সন্দেহ নেই।

কিন্তু কে সে—মৌ-কা-সা-বি-স?

কে না কারা?

আমাদের এমন কানমলা দেবার এ গরজই বা তার বা তাদের কেন?

আর আমাদেরই এই বাহাত্তর নম্বরের বাসার ডাকবাক্সে তারা তাদের চিঠি চালানই বা করছে কখন? কিভাবে?

সারাক্ষণ যতখানি সম্ভব আমরা সজাগ পাহারায় থেকেছি।

সকলে দল বেঁধে না হোক কেউ না কেউ ত বটেই।

এই এত পাহারার মধ্যে কখন কি ভাবে তারা তাদের এই সব চিঠি চালান করছে আমাদের চিঠির বাক্সে?

দিনের বেলা ত নয়ই রাত্রেও আমাদের অজান্তে চিঠির বাক্সে কিছু ফেলা, অসম্ভব বললেই হয়। কারণ সন্ধ্যা হতে না হতেই আজকাল আমরা বাইরের গেট চাবি দিয়ে বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছি।

অন্য কারুর তো নয়ই আমাদের নিজেদের কারুরও বাইরে থেকে ভেতরে আসতে হলে চাবি দিয়ে গেট না খুলিয়ে আসা যাওয়ার উপায় ছিল না।

এই অবস্থায় আমাদের অজান্তে আমাদের ডাকবাক্সে চিঠি বা চিরকুট চালান কেমন করে সম্ভব।

ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আমরা পরস্পরের ওপর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছি।

আমাদেরই কেউ কি চুপি চুপি এই সব চালাকি করছে।

কিন্তু কে সে হতে পারে?

এ রকম মজার বেয়াড়াপনা করে তার লাভই বা কি!

আর তাছাড়া মৌ-কা-সা-বি-স যে সব মাথাগুলোনো ধাঁধার রহস্য আমাদের সামনে সাজিয়ে ধরেছে একা এমন কিছু করার মত বুদ্ধিও আমাদের কার আছে?

শিবুর?

না। কোনো একটা মজার ব্যাপার নিয়ে বেশ একটু হৈ চৈ বাঁধিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ছাড়া আর কোনো

এলেম তার থাকার পরিচয় তো এখনো পেয়েছি বলে মনে হয় না।

যদিই বা এরকম ক্ষমতা তার থাকে আপাততঃ তা অনুমানের মধ্যে রেখে অন্যদের কথা বিচার করে দেখতে পারি।

প্রথমে নিজেকে বিচারের দাঁড়িপাল্লায় তুলে চোখ বুজেই সরাসরি বাদ দিতে পারি।

না, আমি দু চারটে খোঁচা দিয়ে সোজা কথাকে কখনো কখনো প্যাঁচাল করতে পারি কিন্তু ভেবে চিন্তে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা ধাঁধা বাধানো—সে আমার কর্ম নয়।

আমার পর বাকি থাকে শুধু গৌর আর শিশির।

তা দু দুজনের কেউ যে ফেলনা নয় একথা অকপটে স্বীকার না করে উপায় নেই।

কিন্তু বাদ সেধেছে দুজনের নিজস্ব চরিত্রের বিশেষত্ব।

গৌর ইচ্ছে করলে সবই পারে। কিন্তু সকলের সঙ্গে সমান উৎসাহে যে কোনো ধান্দায় মাততে আপত্তি না থাকলেও 'মৌ-কা-সা-বি-স'-এর মত বাহাদুরির জন্যে নিজের গরজে সময় আর বুদ্ধি খরচ সে করবে বলে মনে হয় না।

শিশিরের পক্ষে সে রকম কিছু করা অবশ্য সম্ভব।

কিন্তু ব্যাপারটা আরো তাহলে জমকালো হওয়া দরকার।

জমকালো না হোক ব্যাপারটা এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে একটা গায়ে জ্বালাধরানো টিটকিরির চাবকানি-র



আভাস আছে বলে অবশ্য শিবু, গৌর, শিশির কারুরই সামান্য গাঝাড়া দিয়ে তাচ্ছিল্য করার ভাবটা আর নেই।

রহস্যটার একটা মীমাংসা তাই না করলেই নয়।

কিন্তু কিভাবে সে ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া যায় ঠিক মত বুঝতে না পেরে আপাতত শিবুর ওপরেই একটু চড়াও হয়ে বললাম, লেটারবক্স হাতড়ে তুই শুধু এই লেখাটুকু পেলি ?

তার মানে ? হঠাৎ আক্রমণটা কোন দিক দিয়ে যায়—কেনই বা এমন বেয়াড়া তা বুঝতে না পেরে শিবু বেশ একটু গরম মেজাজ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি বলতে চাইছিস তোরা।

আমরা···আমরা মানে—বলবার কিছু না পেয়ে আমরা তখন তোৎলামিতে পৌঁছে গেছি।

আমাদের হয়ে শিবুই কথাগুলো গরম মেজাজে জানিয়ে দিলে—তার মানে আমি ওই কাটা কার্ডের টুকরোটা লিখে আনতে দেরী করছিলাম বলতে চাস ?

না না—আমরা এবার অপ্রস্তুত হয়ে সব প্রতিবাদ জানালাম।

তা—মানে তা কেন বলব—মানে বলছিলাম কি···

ও সব বাজে কথা রাখ—শিবুর চড়া মেজাজ ঠাণ্ডা হল না—স্পষ্ট আমায় যে সন্দেহ করেছিস তা সাহস করে স্বীকার কর না।

না, না, মানে,—আমরা অপ্রস্তুত হয়ে যা বলতে যাচ্ছিলাম শিবু তাতে বাধা দিয়ে বললে—শোন, মিছিমিছি কথা বাড়িয়ে ত লাভ নেই। সত্য কথাটা তাই আমাদের সকলেরই স্বীকার করা ভালো। আসল ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে তা এই যে রহস্যটার ঠিকমত কোনো হদিস না পেয়ে আমরা সকলেই সকলকে মনে মনে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছি। আমি নিজে এখন তা অকপটে স্বীকার করছি যে আমি নিজেও তাই করে একদিন হাতেনাতে আসল আসামীকে ধরার মতলবে ছিলাম। তার জন্যে বেশ একরকম ফাঁদও পেতেছি।

সত্যিই তুই আমাদেরই কাউকে সন্দেহ করেছিস—অবিশ্বাস্য স্বরে জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।

আর তাকে ধরবার জন্য ফাঁদও পেতেছিস—নিজের কানকেই বিশ্বাস না করতে পেরে একটু রুক্ষ গলায় জিজ্ঞাসা করলাম—কাকে ?

কাকে জানতে চাইছিস্—শিবু বিনা দ্বিধায় জানাল—কাকে না করেছি সেইটিই বরং জিজ্ঞাসা কর। তবে সে প্রশ্নেরও সঠিক জবাব দিতে পারব না।

তার মানে ?—একটু ধমক দেবার ভঙ্গিতে বলবার চেষ্টা করলাম,—কি আবোল-তাবোল বকছিস্।

হ্যাঁ, শুনলে আবোল-তাবোলই মনে হয়—শিবু অকপটে স্বীকার করলে—কিন্তু কথাটা পুরোপুরি ঠিক। সন্দেহ যখন শুরু হয়েছে তখন এক এক করে কেউই বাদ পড়েনি।

কেউই বাদ পড়েনি !—নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে না পেরে বললাম,—সন্দেহ করেছিস্ এক এক করে আমাদেরই সকলকে !

হ্যাঁ, তাই করেছি।—শিবু সোজাসুজি জানালে—আর তার মধ্যে প্রথম কাকে সন্দেহ করেছি শুনবি ?

এ ধরনের কথায় মেজাজ ঠিক রাখা যায় ? বেশ একটু কড়া গলাতেই বললাম—সেইটেই তো জানতে চাই।

বেশ, শোন তাহলে—শিবু যেন নিজের দায়টা কাটিয়ে নিয়ে বললে—প্রথম সন্দেহ করেছি আর কাউকে নয়, এই তোকেই।

আ-আ-আমাকে ! আমি তোতলা হয়ে কথাটা যখন জিজ্ঞাসা করতে পারলাম, ঘরেও অন্যদিকে তখন চাপা হাসির শব্দটা খুব অস্পষ্ট নয়।

সেটা গ্রাহ্য না করে তোতলামিটা এবার কাটিয়ে উঠে প্রায় ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, প্রথম সন্দেহ করলি এই আ-মা-কেই। মানে আমি প্রথমে মৌ-কা-সা-বি-স-এর ওই গোটা দু-তিন চালাকির খেল দেখিয়ে সে সব প্যাঁচের পুঁজি ফুরিয়ে যাবার পর এমনি করে সবাইকে টিটকিরি দিয়ে বাহাদুরি করছি !

হ্যাঁ,—আমার মেজাজের ঝাঁঝটা গ্রাহ্যই না করে শিবু সোজাসুজি এবার স্বীকার করলে—হ্যাঁ, প্রথমে তো ওই বোকা বোকা ভাবগতিকটা হয়ত একরকম সেজে থাকা বলেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর অবশ্য···



শিবুকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে জ্বলন্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর অবশ্য কি— ?

তারপর—শিবু এবার কেটু হেসেই বললে—বুঝলাম যে তোমায় সন্দেহ করাটা সম্পূর্ণ ভুল। মানে···

শেষ পর্যন্ত বুঝলে তাহলে সে কথা ? খুশি হয়ে শিবুকে একটু তারিফ জানাতে যাচ্ছিলাম ! কিন্তু তা আর হ'ল না। শিবু তখন তার বক্তব্যটা শেষ করে বলছে—মানে তখন খেয়াল হয়েছে যে বোকা সাজাটা সহজ হলেও তোমার পক্ষে মৌ-কা-সা-বি-স-এর ওই সব প্যাঁচের একটা গল্প ফাঁদা তোমার কর্ম নয়। সে বুদ্ধি তোমার নেই।

এ অপমানের কি জবাব নেই ?

থাকলেও তখন তা ভেবে বার করতে না পেরে নীরবে তা হজম করে শিবুর কথাই শুনে যেতে হ'ল।

শিবু তখন বলছে—তোমাকে বাতিল করে তখন গৌর-শিশিরের কথা ভাবছি। হ্যাঁ, ওদের দুজনের পক্ষেই এরকম একটা বাহাদুরি দেখানো অসম্ভব নয়, আর বিশেষ করে ওদের যা দস্তুর দুজনে সেইরকম জোট বেঁধে

যদি কাজ করে।

শিবু একটু থেমে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে এবার বললে,

—কিন্তু সেইটেই আর সম্ভব নয়।

সম্ভব নয়!—আমি গৌর আর শিশিরের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? তা সম্ভব নয় কেন?

তাও বুঝিয়ে বলতে হবে?—শিবু আমার মূঢ়তায় তার হতাশাটা গলার স্বরে বুঝিয়ে দিয়েই বললে—লীগ চ্যাম্পিয়নসিপের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে না। এখন ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগান জোট বাঁধবে কি; মুখ দেখাদেখিও বন্ধ!

না, না, তা কেন—গৌর আর শিশির দুজনেই প্রতিবাদ করে জানালে—ও সব খেলাধুলোর ঝগড়া আমরা মাঠেই রেখে আসি। ও ঝগড়া বাড়ি বয়ে আনব না কি?

ঠিক, ঠিক, আমারই ভুল হয়েছে। শিবু নিজের ভুল স্বীকারের সঙ্গে মুখ টিপে একটু হেসে বললে, কিন্তু আসামীদের তালিকা থেকে একে একে সবাই বাদ যাবার পর পড়েছি ফাঁপরে। আমাদের চিঠির বাক্সের ও সব নাক-কান মলা চিঠি দিয়ে মজা করছে কে বা কারা?

সত্যিই কি ব্যাপারটা তাহলে ভূতুড়ে কিছু?



এ ব্যাপারে একমাত্র যিনি সব সন্দেহের বাইরে আছেন এ বিপাকে পড়ে এবার তাঁর শরণ নেবার কথা ভাবতে হচ্ছে। 'হ্যাঁ টঙের ঘরে সেই তিনি। মৌ-কা-সা-বি-স-এর এ রহস্যের কোনো সমাধান যদি থাকে তাহলে একমাত্র তাঁর কাছেই তা পাওয়া সম্ভব। তাই তাঁর শরণই এবার নিতে হবে।

তা নিতে চাও নাও—একটু সন্দেহ প্রকাশ করতেই জানতে চাইছিলাম—কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি সন্দেহের বাইরে কেন মনে করছ?

করছি,—শিবু একটু গম্ভীর হয়েই জবাব দিল গোড়ায় মৌ-কা-সা-বি-সি-এর চিঠিগুলো তাঁর নিজের হাতের লেখার নকল দেখে।

তাঁর নিজের হাতের নকল!—শিশিরই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—সে লেখা যে নকল তা বুঝলে কি করে?

বুঝলাম তাঁর হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে,—শিবু ব্যাখা করে এবার বোঝালে—ওঁর হাতের লেখা আমাদের কাছে অতি সামান্যই আছে। একবার আমাদের এই বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার হুমকি দিয়ে যখন খবরের কাগজের বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখে ভাড়ার আবেদনের চিঠি লিখেছিলেন বনোয়ারীকে দিয়ে ডাকে পাঠাবার জন্য তখন যেসব চিঠি ডাকবাক্সের বদলে আমাদের কাছেই জমা করেছি। সেই চিঠির লেখার সঙ্গে মিলিয়ে বুঝলাম এ লেখা ঘনাদার। সেই নিজের লেখারই নকল।—নকল শুধু আমাদের ধোঁকা দেবার জন্য। এ ধোঁকা দেবার চালাকি কে বা কারা করেছে বার করবার জন্য টঙের ঘরের তাঁরই শরণ নিতে হবে।

আরে মেঘ না চাইতেই জল!—গৌর টিপ্পুনি কাটলে সিঁড়িতে তখন চটির আওয়াজ বোধহয় শোনা যাচ্ছে।

গৌর ভুল বলেনি। মিনিট কয়েক বাদে বিদ্যাসাগরী জোড়া চটির আওয়াজ নিচ থেকে ওপরে উঠে

তখনকার আস্তানাঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আবার আমাদের দরজায় ফিরেই বোধহয় কড়া ঠেলা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আর দরকার হ'ল না।

শিবুই ভেতর থেকে দরজা খুলে ধরে যেন কুর্নিশ করার মত ভঙ্গিতে বলল আসুন ঘনাদা। আপনি বোধহয় অন্তর্যামী। আপনার কাছে যাবার কথাই ভাবছিলাম এইমাত্র। কেমন করে তা বুঝে নিজে থেকেই তার আগে এসে পড়েছেন।

এ আদিখ্যেতায় ঘনাদা বিশেষ গললেন বলে মনে হ'ল না। কথাগুলো যেন গ্রাহ্যই না করে তিনি ঘরের ভেতরে গৌরের উঠে দাঁড়ানো সোফাটায় বসে গম্ভীরভাবে বললেন,—ব্যাপার কি বল ত, এমন ছুটির দিন বিকেলে তোমরা আড্ডাঘরের বদলে এখানে এসে জমা হয়েছ, আমার কাছেও যাবার কথা ভাবছিলে ? কি হ'ল কি হঠাৎ এমন ?

হঠাৎ নয় শিবুই গলাটা ভারী করে জানালে,—ব্যাপারটা হয়েছে অনেকদিন। ছেলেখেলা বলে কিন্তু এখন আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। মীমাংসার জন্যে তাই আপনার শরণ নিতে যাচ্ছিলাম।

সে কথা ত অনেকবার শুনলাম,—ঘনাদা একটু অধৈর্যের সঙ্গে বললেন,—কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছে কি ?

একটু চুপ করে আমাদের সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ঘনাদা হঠাৎ যেন দিব্য-দৃষ্টি পেয়ে বললেন,—সেই তোমাদের মৌ-কা-সা-বি-স আবার খোঁচা দিয়েছে ! চিঠি দিয়েছে কিছু আবার !

চিঠি দিয়েছে, আবার দেয়নি,—শিবু হেঁয়ালি করে জানাবার চেষ্টা করাতে তার ওপর বিরক্ত হয়ে ঘটনাটা যা দাঁড়িয়েছে ঘনাদাকে একটু বিস্তারিত করে জানালাম।

সেই সঙ্গে মৌ-কা-সা-বি-স-এর শেষ চিঠিগুলোও দেখাতে ভুললাম না।

ঘনাদা যেরকম গম্ভীর মুখে আমাদের পেশ করা কাগজপত্র প্রথমে দেখছিলেন শেষের দিকে হঠাৎ তা বদলে তাচ্ছিল্য ভরে হেসে ওঠাতে কিন্তু আমাদের অবাক হতে হল।

এই ! এই তোমাদের সমস্যা !—ঘনাদা ওঁর কাছে জড় হওয়া কাগজের টুকরোগুলো সামনের টেবিলের ওপর নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, করে দেওয়া এ যদি রহস্য হয়, তাহলে তার সমাধান এইগুলোর মধ্যে করে দেওয়া আছে। এই কাগজের টুকরোগুলোর মধ্যেই।

আমার অবাক হলাম। সেই সঙ্গে ঘনাদা বোধহয় আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করছেন এই সন্দেহ করে একটু চুপ।

ক্ষোভটা গোপন না করে একটু তেতো গলাতেই জানতে চাইলাম,—সমাধানটা আছে বুঝলাম, কিন্তু সেটা কোন ভাষায় তা একটু জানাবেন ? ভাষাটা বাংলা না এসপেরান্টো গোছের কিছু ?

না, না ওসব কেন হবে !—ঘনাদা জড় করা কার্ডগুলোর একটা তুলে নিয়ে তার পেছনের সাদা পাতার সামনে যা লেখা আছে সেই কথাগুলোই নিজের পকেট থেকে একটা কলম বার করে লিখতে লিখতে বললেন, এই কার্ডের এক পিঠের লেখাটাই অন্য পিঠে লিখলাম। একটু মন দিয়ে পড়লে মানেটা বোঝা জলের মত সহজ হবে বলে মনে করি।

কথাটা শেষ করে নিজের হাতের দুপিঠে লেখা কার্ডটা অন্য কাগজগুলোর মধ্যে মিশিয়ে হঠাৎ উঠে পড়ে দরজা দিয়ে ছাদের সিঁড়ির দিকেই পা বাড়াতে বাড়াতে যা বললেন তাও একটা ধাঁধা। বলে গেলেন—এবার লেখাটা পড়তে পারবে আশা করি। লেখা না পড়তে পারো কলম পড়লেই চলবে।

এ আবার কি আজগুবি কথা ?



মনে হল ঘনাদার বিদ্যাসাগরী চটির শব্দ ন্যাড়া ছাদের সিঁড়িতে মিলিয়ে যাবার আগে তাঁকে মানেটা বোঝাবার জন্যে ধরে নিয়ে আসি।

কিন্তু সেটা আর পারলাম না। তার বদলে মৌ-কা-সা-বি-স-এর টুকরো কার্ডগুলোর ভেতর থেকে ঘনাদার উল্টো পিঠে লেখা কার্ডটা খুঁজে বার করে পড়বার চেষ্টা করলাম!

কিন্তু তাতে লাভ কি হ'ল।

কার্ডটার এক পিঠে যা লেখা ছিল ঘনাদা অন্য পিঠে ঠিক তাই লিখেছেন।

মূল কার্ডটায় লেখা ছিল একেবারে সংক্ষিপ্ত দুটি মাত্র শব্দ—কার্ডের ঠিক মাঝখানে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা—'কে আমি'। কার্ডের অন্য পিঠে ঘনাদা আমাদের সামনে সেই কথাই লিখেছেন 'কে আমি'।

তাহলে ?

নেহাৎ সস্তা ধাপ্পা বলে কাগজটা অন্য সবগুলোর সঙ্গে কাগজ ফেলার ঝুড়িতে ফেলতে গিয়ে হঠাৎ ঘনাদার

শেষ কথাই মনে পড়ল।

কি বলে গেছেন ঘনাদা ?

বলে গেছেন—লেখা না পড়তে পারো কলম পড়লেই চলবে।

ঠিক ! ঠিক !

লেখা ক'টার মানে বুঝতে আর দেরী হ'ল না।

এক এক করে অন্য কার্ডগুলোর লেখাগুলোও পড়ে দেখলাম। ঘনাদার কথাই ঠিক। লেখার কলমই লেখককে চিনিয়ে দিয়েছে।

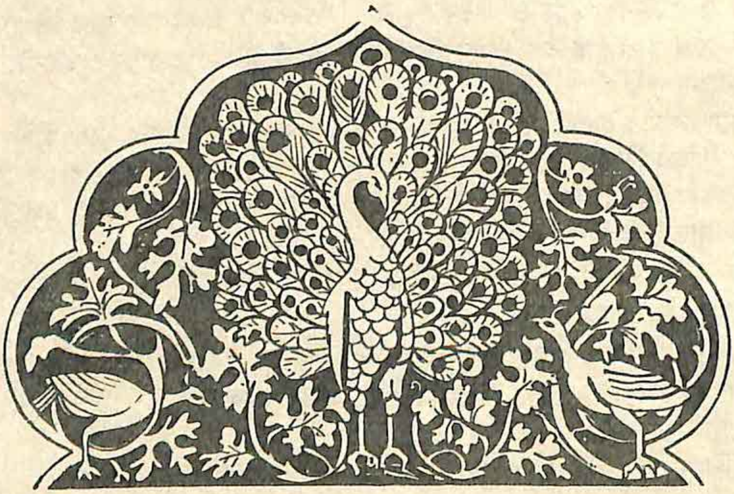
কেমন সে কলম ? এমন আজগুবি কিছু নয়। শুধু 'নিব' এ একটু দোষ আছে। ওপরর দিকে কলমের টান দেবার সময় খুব মিহি, প্রায় অদৃশ্য কালির ছিটে কাগজের ওপর ছড়ায়।

এই সূক্ষ্ম ছিটে মৌ-কা-সা-বি-স-এর যত চিঠি আমরা পেয়েছি সবগুলিতেই একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় !

সেই ঘরে ! তখনই সেই টঙের ঘরে ছুটলাম।

না, বিকেলের খাবারের ফরমাসগুলো গরম গরম এসে পৌঁছোবার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষাই করলাম।

খাবার কি এল তার বর্ণনার বোধহয় দরকার নেই। শুধু স্পেশ্যাল আইটেমটার একটু বর্ণনা দিই। সেই এক বারকোশ প্রমাণ পূর্ণচাঁদের মাপের একটি নরম পাকের কাঁচাগোল্লা, শাদা জমির ওপর নীলচে লালচে ক্ষীরে বুটি তোলা অক্ষরে লেখা—মৌ-কা-সা-বি-স-এর ভাঙা কলম।



ঋণং কৃত্বা

শিবরাম চক্রবর্তী



কারো ধার ধারি না, এমন কথা আর যেই বলুক আমি কখনই বলতে পারিনা। আমার ধারণা, এক কাবুলিওয়ালা ছাড়া এ জগতে এ-কথা কেউই বলতে পারে না। অমৃতের পথ ক্ষুরস্য ধারা নিশ্চিতা ; অকালে মৃত না হতে হলে ধার করতেই হবে।

ধার হলেও কথা ছিলো বরং, কিন্তু তাও নয়। বাড়ি ভাড়া বাকী। তাও বেশি না পাঁচশো টাকা মাত্তর! কিন্তু তার জন্যেই বাড়িওয়ালা করাল মূর্তিটি ধরে দেখা দিলেন একদিন—'আপনাকে অনেক সময় দিয়েছি কোনো অজুহাত শুনছি না আর—'

'ভেবে দেখুন একবার।' আমি তাঁকে বলতে যাই ঃ এই সামান্য পাঁচশো টাকার জন্যে আপনি এমন করছেন। অথচ এক যুগ পরে একদিন—আমি মারা যাবার পরেই অবিশ্যি—আপনার এই বাড়ির দিকে লোকে আঙুল দেখিয়ে বলবে, একদা এখানে বিখ্যাত লেখক শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক বাস করতেন।'

'বাস করতেন! বাস করে আমার মাথা কিনতেন' জবাবে তাঁর দিক থেকে যেন এক ঝাপটা এলো—'শুনুন মশাই, আপনাকে সাফ কথা বলি—যদি আজ রাত্রি বারোটার ভেতর আমার টাকা না পাই তাহলে এক যুগ পরে নয়—কালকেই লোকে এই কথা বলবে।'

বাড়িওয়ালা তো বলে গেলেন, চলেও গেলেন। কিন্তু এক বেলার মধ্যে এতো টাকা আমি পাই কোথায়? পাছে ধার দিতে হয় সেই ভয়ে সহজে কেউ আমার মতো লেখকের ধার ঘেঁষে না। লেখক মাত্রই ধারালো, আমি আবার তার ওপর এক কাঠি—জানে সবাই।

হর্ষবর্ধনের কাছে যাবো? তাদের কাছে এই ক-টা টাকা কিছুই নয়। কীর্তি-কাহিনী লিখে অনেক টাকা তাদের পিটেছি, এখন তাদের পিঠেই যদি চাপি গিয়ে? তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যদি এই দায় থেকে উদ্ধার পাই।

গিয়ে কথাটা পাড়তেই হর্ষবর্ধন বলে উঠলেন—'নিশ্চয় নিশ্চয়! আপনাকে দেবো না তো কাকে দেবো!'

চমকে গেলাম আমি। কথাটা যেন কেমনতরো শোনালো।

'আপনি এমন কিছু আমাদের বন্ধু নন?' তিনি বলতে থাকেন।

'বন্ধুত্বের কথা যদি বলেন—' আমি বাধা দিয়ে বলতে যাই।

'হ্যাঁ, বন্ধুত্বের কথাই বলছি। আপনি তো আমাদের বন্ধু নন। বন্ধুকেই টাকা ধার দিতে নেই, মানা আছে। কেননা, তাতে টাকাও যায় বন্ধুও যায়।' তিনি জানান ঃ হ্যাঁ, এমন যদি সে বন্ধু হয় যে বিদেয় হলে বাঁচি—তার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে ঐ ধার দেওয়া। তাহলেই চিরকালের মতন নিস্তার!'

আহা! আমি যদি ওঁর সেই দ্বিতীয় বন্ধু হতাম—মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

'কিন্তু আপনি তো বন্ধু নন, লেখক মানুষ। লেখকরা তো কখনো কারো বন্ধু হয় না।'

'লেখকদেরও বোধহয় কেউ বন্ধু হয় না।' সখেদে বলি।

'বিলকুল নির্ঝঞ্ঝাট! এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে বলুন?' তিনি বলেন ' আপনি যখন আমাদের আত্মীয় বন্ধু কেউ নন, নিতান্তই একজন লেখক তখন আপনাকে টাকা দিতে আর বাধা কি? কতো টাকা দিতে হবে বলুন?'

'বেশি নয়, শ-পাঁচেক। আর একেবারে দিয়ে দিতেও আমি বলছি না।' আমি বলি : 'আজ তো বুধবার, শনিবারদিনই টাকাটা আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেবো।'

কথা দিলাম। এছাড়া আজ বাড়িওয়ালার হাত থেকে ত্রাণ পাবার আর কী উপায়, কিন্তু কথা তো দিলাম। না ভেবেই দিয়েছিলাম কথাটা—শনিবারের সকাল হতেই ওটা ভাবনার কথা হয়ে দাঁড়ালো।

ভাবতে ভাবতে চলেছি, এমন সময় গোবর্ধনের সঙ্গে মোলাকাত অকূলপাথারে, চৌরাস্তার মোড়ে।

'গোবর্ধন ভায়া একটা কথা রাখবে? রাখো তো বলি।'

'কী কথা বলুন?' 'যদি কথা দাও যে, তোমার দাদাকে বলবে না তাহলেই বলি।' দাদাকে কেন বলতে যাবো, দাদাকে কি আমি সব কথা বলি?'

'অন্য কিছু কথা নয়, কথাটা হচ্ছে এই, আমাকে শ'পাঁচেক টাকা ধার দিতে পারো—দিন কয়েকের জন্যে?' আজ তো শনিবার? এই বুধবার সন্ধ্যের মধ্যেই টাকাটা আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেবো।'

'এই কথা?' এই বলে আর দ্বিরুক্তি না করে শ্রীমান গোবরা তার পকেট থেকে পাঁচখানা একশো টাকার নোট বার করে দিলো।

টাকাটা নিয়ে আমি সটান শ্রীহর্ষবর্ধনের কাছে।

'দেখুন আমার কথা রেখেছি কিনা। দরিদ্র লেখক হতে পারি, কথা নিয়ে খেলা করতে পারি—কিন্তু কথার খেলাপ কখনো করি না।'

হর্ষবর্ধন নীরবে টাকাটা নিলেন।

'আপনি তো ভেবেছিলেন যে টাকাটা বুঝি আপনার মারাই গেলো, আমি আর এ-জন্মেও এ-মুখো হবো না। ভাবছিলেন যে—'

'না না। আমি সে-সব কথা একেবারেও ভাবিনি। টাকার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।' তিনি বললেন, 'বিশ্বাস করুন, টাকাটা আপনাকে দিয়ে আমি কিছুই ভাবিনি।কিন্তু ফেরত পেয়ে এখন বেশ ভাবিত হচ্ছি।'



'ভাবছেন এই যে পাঁচশো টাকা ফিরিয়ে দিয়ে নিজের ক্রেডিট খাটিয়ে এর পরে আমি ফের হাজার টাকা ধার নেবো। তারপর সেটা ফেরত দিয়ে আবার দু-হাজার চাইবো। আর এমনি করে ধারটা দশ-হাজারে দাঁড় করিয়ে তারপরে আর এ ধারই মাড়াবো না? এই তো ভাবছেন আপনি? এই ভেবেই তো ভাবিত হয়েছেন, তাই না?'

আমি তাঁর মনোবিকলন করি। তাঁর সঙ্গে বোধহয় আমার নিজেরও?

তিনি বিকল হয়ে বলেন, 'না না, সে-সব কথা আদৌ ভাবিনি। ভাবছি যে এতো তাড়াতাড়ি আপনি টাকাটা ফিরিয়ে দিলেন! আর এতো তাড়াতাড়ি আপনার প্রয়োজন কি করে মিটত পারে? বেশ, ফের আবার দরকার পড়লে চাইতে যেন কোনো কুণ্ঠা করবেন না।'

বলাই বাহুল্য! মনে মনে আমি ঘাড় নাড়লাম। লেখকরা বৈকুণ্ঠের লোক, কোনো কিছুতেই তাদের কুণ্ঠা হয় না।

বুধবার দিনই দরকারটা পড়লো আবার। হর্ষবর্ধনের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে গোবর্ধনকে গিয়ে দিতে হলো।

'কেমন গোবর্ধন ভায়া ! দেখলে তো কথা রেখেছি কিনা । এই নাও তোমার টাকা—প্রচুর ধন্যবাদের সহিত প্রত্যর্পিত ।'

বুধবার আবার গোবরার কাছে যেতে হলো । পাড়তে হলো কথা—

'গোবর্ধন ভায়া বুধবারে টাকাটা ফেরত দেবো বলেছিলাম বুধবারেই দিয়েছি, দিই-নি কি ? একদিনের জন্যেও কি আমার কথার কোনো নড়চড় হয়েছে ?'

'এমন কথা কেন বলছেন ?' গোবর্ধন আমার ভণিতা ঠিক ধরতে পারে না ।

'টাকাটার আমার দরকার পড়েছে আবার । ওই পাঁচশো টাকাই সেই জন্যেই তোমার কাছে এলাম ভাই । এই বুধবারই তোমায়, আবার ফিরিয়ে দেবো টাকাটা । নির্ঘাত ।'

এইভাবে হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন, গোবর্ধন আর হর্ষবর্ধন—শনিবার আর বুধবারের দু-ধারের টানা পোড়েনে আমার ধারিওয়াল কম্বল বুনে চলেছি—এমন সময়ে পথে একদিন দু-জনের সঙ্গে দেখা ।

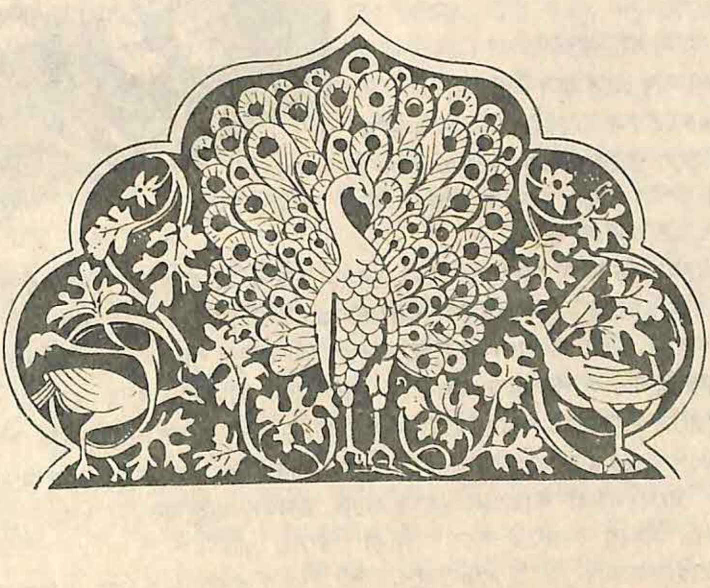
দুই ভাই পাশাপাশি আসছিলো । আমাকে দেখে দাঁড়ালো । দু-জনের চোখেই কেমন যেন একটা সপ্রশ্ন দৃষ্টি ।

হয়তো দৃষ্টিটা কুশল জিজ্ঞাসার হতে পারে, কোথায় যাচ্ছি, কেমন আছি—এই ধরনের সাধারণ কোনো কৌতূহলই হয়তো বা, কিন্তু আমার তো পাপ মন, মনে হলো দু-জনের চোখেই যেন এক তাগাদা !

'হর্ষবর্ধনবাবু, ভাই গোবর্ধন, একটা কথা আমি বলবো, কিছু মনে করো না—' বলে আমি শুরু করি : 'ভাই গোবর্ধন, তুমি প্রত্যেক বুধবার হর্ষবর্ধনবাবুকে পাঁচশো টাকা দেবে । আর হর্ষবর্ধনবাবু, আপনি প্রত্যেক শনিবার পাঁচশো টাকা আপনার ভাই গোবর্ধনকে দেবেন । হর্ষবর্ধনবাবু, আপনি বুধবার, আর গোবর্ধন, তুমি শনিবার মনে থাকবে তো ?'

'ব্যাপার কি ! হর্ষবর্ধন তো হতভম্ব ।—কিছুই বুঝতে পারছি না ।'

'ব্যাপার এই যে, ব্যাপারটা আমি একেবারে মিটিয়ে ফেলতে চাই । আপনাদের দুজনের মধ্যে আমি আর থাকতে চাই না ।'



মুসামশায়ের ব্যাঘ্রকরণ

লীলা মজুমদার



বনের ধারের ভাঙা শিবমন্দিরে হঠাৎ একজন সাধু এসে বাস নিলেন। কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। কেউ কিছু ভক্তিভরে দিয়ে গেলে, হাত তুলে তাকে একটা শুকনো পাতা দিতেন। তাতেই নাকি তার কপাল ফিরে যেত। বলা বাহুল্য দেখতে দেখতে গজুখুড়োর সঙ্গে বুড়ো হরিহরাত্মা।

এ জায়গাটা থেকে অভয়ারণ্য খুব দূরে নয়। সেখান থেকে মাঝে মাঝে এখানেও দু-চারটে বাঘ ছিট্‌কে আসে বলে শোনা যায়। আমি নিজের চোখে না দেখলেও, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কাগজে তোমরাও ব্যাঘ্র প্রকল্পের কথা পড়ে থাকবে। অর্থাৎ গজুখুড়োদের বাড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরেই বাঘের চাষ হয়। আধুনিক নিয়মে বাঘগুলোর লালনপালন হওয়াতে তারা নাকি আয়তনে আর অন্যান্য বেঘো গুণে সাধারণ বাঘের দেড়া। কাগজে পড়েছি ইংল্যান্ড আমেরিকার টিভিতেও তাদের রঙীন ছবি দেখানো হয়েছে আর নামকরা সব পত্রিকায় স্বাভাবিক পরিবেশে ঐ সব বাঘের ফটোসহ বড় বড় হরপে বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়েছে। সমালোচকরা তাই দেখে মন্তব্য করেছেন যে ইণ্ডিয়ার জনগণ যাই হক না কেন, ওখানকার বাঘরা যে আদর্শস্থানীয়, একথা স্বীকার করতেই হবে। সত্যি, শুনেও গর্ব হয়।

আমার বন্ধু নেতাইদের বাড়ি থেকে অভয়ারণ্যের পাঁচিল খুব একটা দূরে নয়। বাবার কাছে শুনেছি একটা স্বাস্থ্যবান যুবক বাঘকে স্বচ্ছন্দে কুড়ি-বাইশ ফুট পর্যন্ত লাফাতে দেখা গেছে। তা নেতাই একদিন এসে যখন

বলল পূর্ণিমা রাতে ও নিজের চোখে ওদের নারকেল বাগানে দুটো বিশাল বাঘকে খেলা করতে দেখেছে তখন অবিশ্বাস করার মতো কিছু মনে হল না। তাদের বড় বড় থাবা আর মোটা মোটা গোঁপ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তারা কত হিংস্র। খড়ের গাদার উপর থেকে নেতাই সব দেখেছিল। কথাটা নেতাইয়ের সাংবাদিক মামাকে বলতেই, তিনি ওঁদের বিখ্যাত কাগজের রবিবার সংখ্যায় ফলাও করে লিখে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে ওঁদের আর্টিস্ট যে-সব ছবি এঁকে দিয়েছিলেন, নেতাই বলল সেগুলো নাকি অবিকল ঐ বাঘ দুটোর মতো দেখতে। বরং আরেকটু ভালো।

গজুখুড়ো কাগজ পড়েন না, নাকি আজকালকার ছাপার হরপ ঝাপসা দেখেন। কিন্তু ঐ জায়গাটা পড়ে শোনাতেই, খুড়ো লাফিয়ে উঠলেন, 'অ্যাঁ! পথে এসো বাছাধনরা! ভারতের হেনা খারাপ, তেনা খারাপ, রাস্তা নোংরা, মানুষ কুঁড়ে! সব মানলাম। কিন্তু অমন বাঘ আর কোথাও দেখাও দিকি!' তারপর খানিক্ষণ কি যেন ভেবে বললেন, 'তবে সব কি আর সত্যি বাঘ!'

শুনে আমরা পড়ে যাই আর কি। ঝেঁকে ধরলাম খুড়োকে, 'তার মানে কি বলতেই হবে। নইলে আজ থেকে তোমার ডালিমের আচার বন্ধ হল।'

তাই শুনে খুড়ো কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলেন। 'ওরে নারে, বাপ! অমন কথা মুখে আনিস্ নে। মুসা-মশাইকে সবে উটি ধরিয়ে কব্জা করেছি। এই সময়ে বুকে শেল হানিস্‌নে, বাপ!' বললাম, 'তা হলে সব কথা খুলে বল।' এই বলে আচারের ঠোঙাটা ওঁর নাকের কাছে নাচাতে লাগলাম। গজুখুড়ো চোখ বুজে হাত জোড় করে, কাকে যেন বললেন, 'অপরাধ নিও না, মুসা, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।' চটে গেলাম, 'আহা ওঁকে বলে কি হবে? আমাদের বল।' ঠোঙাটা পকেটে পুরতে যাব, মরিয়া হয়ে সেটা ছিনিয়ে নেবার শেষ একটা চেষ্টা দিয়ে, গজুখুড়ো বললেন,

'উনি ব্যাঘ্রকল্পের মন্ত্র জানেন। সেইটে শিখে নেবার জন্যে তক্কে তক্কে আছি। কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পেলেই উনি প্যাটার্নমাফিক উৎকৃষ্ট বাঘ তৈরি করতে পারেন। তবে কয়েকটা উপকরণ একেবারে বে-আইনী'—এই বলে খুড়ো এমন বিশ্রী করে আমাদের দিকে তাকাতে লাগলেন যে মনাই বেচারি আমার চেয়ে দু-বছরের ছোট তো, সে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। খুড়োর মনটা খুব নরম। তাই ওকে কাঁদতে দেখে ব্যস্ত হয়ে বলে ফেললেন, 'আহ, ঐ বে-আইনী উপকরণ পাওয়া যায় না বলে, বিকল্প দিয়ে কাজ সারতে হয়। তার ফলে বাঘগুলোও বিশুদ্ধ বাঘের মতো দেখতে হলেও, আসল বাঘ হয় না। অতি নিরীহ। নিরামিষ ছাড়া কিছু ছোঁয় না।' উঃফ্! কথাটা শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

তখনি মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, তাহলে ঐ নকল বাঘগুলোকে কাছের থেকে দেখতে হবে। মন্তরটা একবার শিখে নিলে, গজুখুড়োর সহকারী দরকার হবে নিশ্চয়। তার কারণ শুধু বেড়াল নয়, লোমশ কিছু দেখলেই ওঁর চুল খাঁড়া, কপালে ঘাম এবং হেঁচকি ওঠা শুরু হয়। অথচ আমার মতো নাবালকের বুঝতে বাকি ছিল না যে ঐ মন্ত্রের সাহায্যে ফলাও করে বাঘের ব্যবসা করা যায়।

অনেক কষ্টে বন্ধুদের আমার সঙ্গে থাকতে রাজি করলাম। বাঘের—বিশেষতঃ ঐ রকম নিরামিষ বাঘের ভয় না থাকলেও, নেতাই মনাই বটা গবু বগাই ইত্যাদির যথেষ্ট ভূতের ভয় ছিল। ওদের কার বৃদ্ধ প্রতিপিতামহ নাকি একবার রাতে বেরিয়ে, ঐ শিবমন্দিরের চাতালে বসে একটা এক ঠেঙো মূর্তিকে হুঁকো খেতে দেখেছিলেন। অবিশ্যি ওঁকে দেখেই হুপ্ শব্দ করে মূর্তিটা হুঁকো ফেলে বটগাছে অন্তর্ধান করেছিল, তবু সেই ইস্তক অন্ধকার রাতে এখনকার কেউ বাড়ির বার হয় না। এইজন্য পরের পূর্ণিমা অবধি অপেক্ষা করতে হল।

নেতাইদের বাড়ির সকলে বক্রেশ্বর গেছিল; সেই সুযোগে পূর্ণিমার দিন আমরা ওদের বাড়িতে গিয়ে জুটলাম। সবাই মিলে চাঁদের আলোয় চড়িভাতি করব আর বলা বাহুল্য বাঘ দেখব। ওদের বামুনঠাকুর আমাদের খিচুড়ির সঙ্গে বেগুনী, পেঁয়াজী, তারপর মালপো খাইয়ে, নিজের ঘরে শুতে চলে গেলে, নেতাই বলল, 'এই হল নারকেল বাগানে যাবার সময়।' গুটি গুটি গেলাম সবাই। আমার একটু বুক ঢিপ ঢিপ করছিল বটে, তবে সেটা বেশি খাওয়ার দরুণও হতে পারে।

নারকেল-বাগান ভোঁ-ভাঁ! ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় গাছের কুচকুচে ছায়াগুলো অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। একটু জোরে নাক টানতেই একটা বেঘো গন্ধ পেলাম! তোমাদের কেমন লাগে জানি না; কিন্তু আমার নিজের কুকুর বেড়াল, ইঁদুর, ছুঁচো, বাঘ ইত্যাদির গন্ধ ভালোই লাগে। আহা, প্রকৃতির হাতে তৈরি এরা! তবে এখন যা শুনছি মুসামশায়ের কিঞ্চিৎ হাত থাকতে পারে।—এই সময়ে বগাই আমাকে জাপ্টে ধরল। দেখি কি, এক সঙ্গে দুটো

বাচ্চাকে মুখে করে, নিশ্চয় একটা নকল বাঘিনী, বাগানের নিচু পাঁচিল টপকে, একবার ইদিক-উদিক দেখে, সটাং আমার দিকে ছুটে এল ! তা বাপু, সত্যিই হক কি নকলই হক, আমি ভয়ে কাঠ !

অদ্ভুত বাঘিনীটা ! বাচ্চা দুটোকে এক্কেবারে আমার পায়ের উপর ফেলে দিয়ে, আস্তে একটা 'হিয়াও' শব্দ করে, আবার পাঁচিলের দিকে ছুটল । অমনি একটা বড় বাঘ-ও পাঁচিল টপকে ভিতরে এসে ওকে বেরিয়ে যেতে দেখে, সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ল ।

খুব ছোট্ট বাচ্চা । হয়তো অল্পদিন আগে চোখ ফুটেছে । দুটোকে এক সঙ্গে কোলে তুলে নিলাম ! নরম, গরম ; বেড়ালের মতো মিউ মিউ করছে ; কি যে মিষ্টি সে আর কি বলব ! দুটো খুদে খড়খড়ে লাল জিব দিয়ে আমার মুখ চোখ চেটে দিতে লাগল । কি যে ভালো লাগল । ওদের কোলে নিয়ে বসতেই, আমার আঙুল চুষবার চেষ্টা করতে লাগল । চাপা গলায় বগাই নেতাইদের ডাকলাম, 'ওদের নিশ্চয় খিদে পেয়েছে । যা না একবার । রান্নাঘরের ডুলিতে দুধ ঢাকা থাকে । তাকের উপর কুপির সলতে পাকানো আছে । নিয়ে আয় না কেউ ।'

কোনো জবাব নেই । তাকিয়ে দেখি, কি জ্বালা, বেড়ালের মতো দুটো ছোট্ট বাঘের ছানা, তাও আবার নকল । তাই দেখেই বীরপুরুষরা পিট্টান দিয়েছেন । ছি ! ছি ! ভাবছি বসে বসে, নিজেই ওদের কোলে নিয়ে রান্নাঘরে যাব কি না, এমন সময় এক ঝলক আলোর মতো বাঘিনী আবার এসে হাজির । আমার দিকে চেয়ে, আরেক বার আস্তে বলল, 'হিয়াও !' ছানা দুটোকে ওর সামনে নামিয়ে দিলাম । অমনি টপ করে এক সঙ্গে দুটোকে তুলে নিয়ে এক দৌড়ে পাঁচিল টপকে বনের দিকে চলে গেল । অভয়ারণ্য কাছেই । আহা, নিরাপদে পৌঁছে যাক ।



বন্ধুদের উপর রাগ করে খুড়োর বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম ! মাঝ-পথে দেখি নেতাই বগাই ইত্যাদির সঙ্গে লাঠি সোঁটা আর আমার কাগমারা গুলতিটা নিয়ে খুড়ো হন্তদন্ত হয়ে আসছেন আমাকে বাঘ-ছানার হাত থেকে উদ্ধার করতে । দেখে হেসে বাঁচিনে ।

খুড়ো কিন্তু লাঠি ফেলে ছুটে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফোঁৎফোঁৎ করে কেঁদে ফেললেন । আমি তো হাঁ ! 'কি মুশকিল, নকল বাঘের পুচকে ছানা কি আমাকে খেয়ে ফেলবে ?'

খুড়ো মাথা নেড়ে বললেন, 'নকল নয় রে, আহাম্মুক । বাঘ ছেড়ে দে, আজ পর্যন্ত কেউ একটা কেঁচোও তৈরি করতে পারেনি—'



'কিন্তু তুমি যে বললে মুসামশাই—'

'আরে রেখে দে মুসামশাই ! দাড়ি গোঁপ পরেছে বলে আমার ভাগ্নে ঘোতনকেও চিনতে পারলিনে ?

খেলার মাঠে ঠ্যাঙাঠেঙি করার পর থেকে, মুগুর দিয়ে ওর বাপ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন ! ব্যাঘ্র-বিশারদ্ না সেজে বেচারি করে কি ! কাল বাপ ওকে কান ধরে বাড়ি নিয়ে গেছেন । নাকি পোস্টাপিসে চাকরি হয়েছে । বাঁচা গেছে। হ্যাঁরে, বাচ্চাগুলো কামড়ায়-টামড়ায়নি তো ? তাহলে তো লাল ওষুধটে দিতে হয় ।'

আমি বললাম, 'দাঁতই নেই মনে হল, কামড়াবে কি !' এই বলে মুচ্ছো গেলাম ।

গ্রামের নাম জাঁকপুর

আশাপূর্ণা দেবী



ভোর হয়েছে
কি হয়নি, গাছের পাখিরা
ডেকেছে কি ডাকব-ডাকব
ভাবছে, শোবার ঘর থেকে
বেরিয়ে এলেন বড়কর্তা, বাঘমুখো
রুপো-বাঁধানো ছড়িখানা শূন্যে নাচাতে-নাচাতে।
বেরিয়েই গর্জন করে উঠলেন, "এই কে আছিস!"

বড়কর্তার পরনে ফর্সা ধবধবে কাঁচি ধুতি, গায়ে ফর্সা ধবধবে মেরজাই। ধুতির ফুলকোঁচার আগাটা মেরজাইয়ের বাঁ পকেটে গোঁজা! রাতে ঘুমনোর দরুন ধুতির পাট একটু লাট খেয়ে গেছে।

বড়কর্তা তাঁর কলকাতার বাড়িতে সকাল বেলা এমন সাজে ঘর থেকে বেরোচ্ছেন, এমন দৃশ্য ভাবাই যায় না। মানে এমন সাজ করেনই না। সেখানের স্টাইলই আলাদা।

তবে বড়কর্তার মতে দেশের বাড়িতে যখন এসেছেন, পূর্বপুরুষদের তৈরি চকমিলোনো বিশাল অট্টালিকার গেট খুলিয়ে ঢুকেছেন এবং এতদিনের বন্ধ-বাড়ির শ'খানেক জানলা-দরজা খুলিয়ে পুরনো চেহারাখানা বার করে ফেলেছেন, তখন এখানে চাই পুরনো স্টাইল। বাপ-জ্যাঠার সাজসজ্জা আচার-আচরণ।

জাঁকপুরের বাবুরা এই ধরনের সাজ আর এইরকম হাঁকডাকেই অভ্যস্ত ছিলেন। তা ভুলে তো আর যাননি সে-সব বড়কর্তা ? চোখের সামনে ছবি হয়ে আছে সেই শৈশব-বাল্যের দিনটিনগুলো।

আর মনের মধ্যে ? সে তো আছে খোদাই হয়ে।

'বাবুদের বাড়ি' মানেই 'জমিদারবাবু'দের বাড়ি। এখন আর রাম-অযোধ্যা কিছুই নেই। কিন্তু গ্রামের লোকের মুখে-মুখে বাবুদের বাড়ি নামটাই চালু হয়ে আছে।

তা বাড়িটাও তো আছে।

জীর্ণ হয়ে এসেছে বটে, ঠাটবাটটি হারায়নি। হারাবে কেন, এই বছর ষোলো-আঠারো আগেও তো বড়কর্তার ছোটজ্যাঠা এখানে বসবাস করে গেছেন। অতঃপর স্বর্গে গেছেন। সেই বাবদই এখানে শেষ এসেছেন বড়কর্তা।

কেন এসেছেন ?

হঠাৎ খেয়াল হয়েছে নাতি-নাতনিরা কেউ এখনও পর্যন্ত দেশের বাড়ি দেখেনি। মনে হয়েই মনে হল, ভেরি ব্যাড ! ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে দেশের বাড়ি মেরামত করার ধুম পড়েছে, দরোয়ান কাম মালি নরহরিকে চিঠি দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং গতকাল বিকেলে একখানি বিরাট বালখিল্য-বাহিনীকে নিয়ে জাঁকপুরে এসে পৌঁছেছেন বড়কর্তা।

হইহই কাণ্ড, রইরই ব্যাপার। জমজমাটি দৃশ্য।

কী না এসেছে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে রেকর্ড প্লেয়ার, টেপ রেকর্ডার, (ফুচং নাকি পাখিদের কলকাকলি টেপ করবে) ডজনকয়েক গানের ক্যাসেট, ক্যারম বোর্ড, ব্যাডমিন্টন সেট, কয়েক জোড়া ম্যাজিকের তাস। ভেঁপু আজকাল তাসের ম্যাজিকে ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি 'লোকজন' মানে 'কাজের লোক'। অকর্মার রাজা হলেও কাজের লোকই তো বলতে হবে।

কথা আছে, আমবাগানে দোলনা টাঙানো হবে। তার জন্যে অনেক গজ মজবুত নাইলন দড়ি এসেছে। দিন-দশেকের মতো 'পিকনিক' কম তো না। আর মেয়ের ঘর ছেলেদের ঘর মিলিয়ে নাতি-নাতনি ও কর্তার সংখ্যাও কম না।

এসব এনেছে ওরা অনেক কিছুই দাদুকে না জানিয়ে। জানে তো বুড়োদের স্বভাব, ছোটদের সব ব্যাপারেই বাধা দেওয়ার টেনডেনসি !

কিন্তু ওরাই কি জেনেছে, দাদুও তাদের অগোচরে দর্জিকে দিয়ে গোটাকতক মেরজাই বানিয়ে এনেছেন তাঁর জ্যাঠার মতো। এনেছেন ধুতি, হরিণের চামড়ার চটি, বাঘমুখো ছড়িটা।

এনেছেন এই সব, সেটা এই ভোরবেলায় দেখা গেল।

তা এনেছেন বেশ করেছেন, কিন্তু ঘুম ভেঙে উঠেই এমন হম্বিতম্বি কেন ? কী হল রাতারাতি ? বিছানায় ছারপোকা ? মশারি ভেদ করে মশার উৎপাত ?

নাকি পুরনো ঘরের খাট-আলমারির তলায় ইঁদুর-ছুঁচোর হুটোপাটি ?

আরও একবাও 'কে আছিস' হাঁকতেই একমুঠো নাতি-নাতনি যার যার বিছানা থেকে উঠে এসে হতভম্ব হয়ে দাঁড়াল। দাদুর এমন রণমূর্তি কেন !



বড়কর্তা হাতের ছড়ি আর একবার নাচিয়ে বলে উঠলেন, "আমার ঘর থেকে পোর্টম্যান্টোকে কে কোথায় সরাল ? অ্যাঁ। কে সরিয়েছে !"

পোর্টম্যান্টো !

এটা আবার কী শব্দ। কোনওদিন শুনেছে বলে তো মনে পড়ছে না।

"কেউ জানিস না ?"

ভেঁপু সাহসে ভর করে বলে উঠল, "পোর্টম্যান্টো আবার কী ? তাই তো জানি না।"

"ও হোহো," বড়কর্তা বললেন, "তা জানবি কোথা থেকে ? শহুরেবাবুরা ! পোর্টম্যান্টো হচ্ছে গিয়ে ব্যাগ। ব্যাগ। মানে স্যুটকেস।"

"বাঃ, তা সেটাই বলবে তো।"

কেন বলব ? এই জাঁকপুরের বাবুদের বাড়ির কর্তারা চিরকাল পোর্টম্যান্টোই ব্যবহার করে এসেছে।"

টুকলি বলে ওঠে, "তুমি সেটা মানে ও-ই 'ম্যান্টো' না কী এনেছ ?"

"আনব কোথা থেকে," বড়কর্তা আবার হুঙ্কার ছাড়েন, "এখন আর ও-জিনিস পাওয়া গেলে তো ! তোদের গড়িয়াহাটের দোকানিরাও তোদেরই মতন হাঁদা-ল্যাবা ! বলে নামই শোনেনি । তো বাধ্য হয়ে স্যুটকেসকেই পোর্টম্যান্টো বলতে হচ্ছে । সে যাক, জিনিসটা ঘর থেকে উপে গেল নাকি ! শোবার সময় দেখেছি কোণের দিকে টেবিলে বসানো রয়েছে, আর মাঝরাতে দেখি যে হাওয়া ! মানেটা কী এর, অ্যাঁ ?"

টুকলি ভয়ে ভয়ে বলল, "চুরি যায়নি তো ?"

বড়কর্তা আবার একবার ছড়িটায় পাক দিয়ে নিয়ে গর্জন করে উঠলেন, "গেলে তো চুকেই যেত । চোর আর চুরির সুযোগ পেল কই ? তার আগেই তো কে বা কারা সেটাকে হাতিয়েছে । দেখছি একবার । আমি তাকে আস্ত রাখব না ।

বড়কর্তার দেশের ভাইঝি চারুশীলা চান করে এসে পুজোর ঘরে যাবার মুখে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "কাকে আবার ভেঙে টুকরো করবেন গোঁ বড় জ্যাঠামশাই ?"

বড়কর্তা রুদ্রমূর্তিতে বললেন, "একধার থেকে সব্বাইকে । বলি রাতারাতি আমার পোর্টম্যান্টোটা কোথায় উধাও হয়ে গেল শুনতে পাই ?"

চারুশীলা বলল, "কোথায় আবার যাবে, আমিই এ-ঘরে এনে তুলে রেখেছি । আপনার তো চারটে দরজা হাটপাট করে খুলে শোওয়া অভ্যেস ! কে কখন ঢুকে পড়ে চক্ষুদান করে বসে ঠিক কী !"

বড়কর্তা হাতের ছড়ি নাচানো থামিয়ে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, "তুমিই তুলে রেখেছ ? বড় কাজ করেছ, উত্তম করেছ । বলি ওহে বুদ্ধিমতী চারুশীলা, ওই চক্ষুদান করাটাই যাদের পেশা, তাদের উপায়টা কী হবে ?"

"অ্যাঁ, কী বলছেন !" চারুশীলা হাঁ ।

"বলছি, কোনও ব্যাটা চোর যদি জাঁকপুরের বাবুদের বড়কর্তার ঘরে ঢুকে কিছু হাতাতে এসে শুধু ইঁদুরে কাটা গদির তুলো হাতড়ে মরে, তাতে বড়কর্তার খুব মান বাড়ে ? প্রেস্টিজ থাকে ?"

"ইঁদুরে কাটা গদির তুলো হাতড়াচ্ছিলো ! কে ? অ্যাঁ ?"

একঝাক ছেলে মেয়ের গলা, " কে দাদু ? কে ?"

"কে ? কপালে তো নাম লেখা টিকিট সেঁটে আসেনি মানিক, যে বুঝব কে ! আমিও তো তাই হাঁক পাড়লাম, কে রে ? তো মিনমিন করে কে যেন বলল, 'আজ্ঞে কেউ না ।' বোঝো ব্যাপার । পুরনো অট্টালিকা, কত কত প্রেতাত্মা আনাচে কানাচে বসবাস করছে, কে জানে । ফশ করে বালিশের তলা থেকে টর্চটা বার করে জ্বেলে দেখি, কে ব্যাটা লুঙ্গি-গেঞ্জিপরা হাড়গিলে চেহারার মূর্তিমান মাথার কাছে দাঁড়িয়ে । হাতে একমুঠো ছেঁড়া তুলো !"

"তুলো ! তুলো কেন দাদু ? তুলো চুরি করতে এসেছিল ?"

বড়কর্তা রেগে বলেন, "হ্যাঁ আমিও তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুলো কি হবে রে ব্যাটা ?' পাজিটা বলে কিনা, 'আজ্ঞে তুলো আর কী হবে । চাবির খোঁজে গদির তলা হাতড়াচ্ছি, আর মুঠোভর্তি ছেঁড়া তুলো উঠে আসছে ! বলিহারি কাণ্ড ! চোর ঠকানোর ফন্দি বটে !'

"শুনেছিস আস্পর্দার কথা ? বললাম, 'বলি মতলবটা কী ?' বলে কিনা, 'মতলব তো মহৎই ছিল, তো এসে দেখছি খেটে মরাই সার ! কবে থেকে গাওনা-বাজনা শুনছি, বাবুদের ঘর সারানো হচ্ছে, বড়কর্তা আসছেন, তিনখানা মটরগাড়ি বোঝাই মাল আর মানুষ আসছে তো বলি ভগবান বুঝি এতদিনে দিন দিল । তো হরেকেষ্ট । জাঁকপুরের বড়কর্তার ঘর উটকে লবডঙ্কা ! শেষ মেষ গদি ছেঁড়া তুলো ।'



"বোঝ চারু, শুনে পায়ের রক্ত মাথায় চড়ে কিনা ! গর্জে বললাম, 'বদমাশ, শয়তান ! চুরি করতে এসেছিস চুরি করবি । মিথ্যে বদনাম দিবি কী জন্যে ? ওই দেয়ালের ও কোণে টেবিলের ওপর একখানা পোর্টম্যান্টো বসানো নেই ? নিয়ে আয় এদিকে ! নগদ হাজার দু'তিন আছে, ইচ্ছে হয় নিয়ে যা !' ব্যাটা দাঁত বার করে বলে কিনা, 'কর্তা বুঝি ঘুমের ঘোরে পোর্টম্যান্টোর স্বপ্ন দেখতেছিলেন ? হাজার দু'তিন টাকা ! ওরে বাপ রে । হ্যাঁ ছিল বটে, আগের কালের কর্তাদের । ঠাকুর্দার কাছে গপ্পো শুনেছি, মানে এই বংশীবদনের তো তিনপুরুষে এই একই পেশা ! তো ঠাকুর্দারা মুখে কালিঝুলি মাখত, গায়ে পেছলা করে তেল মাখত, এখন আর অতসব কিছু লাগে না । তো ঠাকুর্দা বলেছিল, জাঁকপুরের বাবুদের বাড়িতে কাজে সুখ আছে । যেখেনে সেখেনে সোনাদানা টাকা পয়সাটা ছড়ানো থাকে । কোনওমতে একবার মাথাটা গলাতে পারলেই হল । আর এখন !" ব্যাটা মুলো-মুলো দাঁত বিছিয়ে বলে কিনা, 'এখনকার বাবুরা হচ্ছেন টুঁ টুঁ কোম্পানি । বড়কর্তার ঘরে ঢুকে

হাতের মুঠোয় উঠে এল শুধু একমুঠো গদি ছেঁড়া তুলো ! ছি ছি ! হিহি !"

বড়কর্তা আবার শূন্যে ছড়ি আস্ফালন করে বললেন, "বল, বল তোরা ! এত হেনস্থায় মেজাজ ঠিক রাখা যায় ? চড়চড়িয়ে প্রেশার চড়ে যাবে না ? দিয়ে দিলাম হতচ্ছাড়া ব্যাটাকে মুখের মতন জবাব ! ভাগ্যিস আংটিটা আঙুলে ছিল । চারুশীলাবালা সেটিও আঙুল থেকে খুলে তুলে রাখতে যাননি, জ্যাঠামশাইয়ের ঘরের দরজা খোলা থাকে বলে ।"

আংটি !

সকলের দৃষ্টি পড়ল গিয়ে বড়কর্তার ডান হাতের আংটির আঙুলে । আঙুলে শুধু একটি সাদা দাগ বসে আছে, আংটি নেই !

জ্বলজ্বলে সবুজ পান্নার আংটিটা বিরাট দামি । চারুশীলা কপালে হাত চাপড়ে বলে উঠল, "কী সর্বনাশ ! ও জ্যাঠামশাই, চোরটা আপনার আংটিটা নিয়ে চলে গেল !"

কেঁদেই ফেলল চারুশীলা ।

নাতি-নাতনিরা একযোগে চেঁচিয়ে উঠল, "ও দাদু, তোমার সেই সুন্দর সবুজ আংটিটা চোরে কেড়ে নিয়ে চলে গেল ! তুমি তার সঙ্গে গায়ের জোরে পারলে না ?"

"কেড়ে !" বড়কর্তা তেড়ে ওঠেন, "ভবনারায়ণ রায়চৌধুরীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল ? একটা হাড়গিলে একটা চামচিকে, একটা কাকতাড়ুয়া, একটা পাকাটি, একটা তেজপাতা, একটা ইঁদুর, ছুঁচো, আরশোলা ! এই ভাবলি তোরা ? ভাবতে পারলি ? নাঃ, তোদের কিছু হবে না । তোরা ওই রাতদিন বসে বসে ক্যাসেট শুনবি, ক্যারম পিটবি আর নয়তো গোয়েন্দা গল্প গিলবি ! কেড়ে নিয়ে গেল । হা হা হা । বলে, কী বুদ্ধুরা ! আঙুল থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললাম, 'নিয়ে যা ব্যাটা । জাঁকপুরের বাবুদের বাড়ি থেকে শুধু হাতে ফিরবি, এ হয় না !' তা ত্যাঁদোড় ব্যাটা কি সহজে নিতে চায় ? বলে, 'এ আমি বেচতে গেলে ধরা পড়ব ! আমার দরকার নাই !' তবে আমি ছাড়ব ? বলি, 'না নিলে তোমার গর্দান যাবে ব্যাটা । তুমি জাঁকপুরের বড়কর্তার মুখের ওপর ছি বলে তার প্রেস্টিজ পাংচার করে দিয়ে চলে যাবে আর আমি তাই সইব ? হুঁ ! অত শস্তা নয় ।' তো যত নষ্টের মূল হচ্ছেন এই আমার হিতৈষী ভাইঝি চারুশীলা দেবী ! পোর্টম্যান্টোটা ঘরে থাকলে চুপিসাড়ে নিয়ে চলে যেত । আর চাবি খুঁজতে গদির তুলো হাতড়াতে আসত না ! যাকগে, ওসব ফালতু কথা । আজ ব্রেকফাস্টের মেনুটা কী ? ব্রেকফাস্টের মেনুটা কী হে ফুচাং ? যারা সব কাজের লোকটোক সঙ্গে এসেছিল তারা এখনও নাকে তেল দিতে ঘুমোচ্ছে বুঝি ? কোথায় তারা ? এই কে আছিস ।"

কলকাতার বাড়িতে ভবনারায়ণ রায়চৌধুরী কখনও এভাবে এই কে আছিস বলে লোকজনকে ডাকেন না, যার যা নাম তাকে তাই বলে ডাক দেন । এ-ভাবটা হচ্ছে জমিদারবাবুদের বাড়ির পেটেন্ট ! যাতে একটি হাঁকে দশজন দশদিক থেকে ছুটে আসে ।

এখন সকালে চড়ে উঠেছে । গাছের মাথায় মাথায় রোদ । এখন আর আংটির শোক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না নাতি-নাতনিরা । তারা গ্রামীণ ব্রেকফাস্ট মুড়ি নারকেল কচি শশা ফুলুরি আর গরম জিলিপি নিয়ে বসেছে এবং তারিয়ে খেতে খেতে তারস্বরে মন্তব্য করছে, এমন ফার্স্টক্লাস খাদ্যটাদ্য জগতে থাকতে কী দুঃখে মানুষ দিনের পর দিন সকালবেলা একঘেয়ে টোস্ট, মাখন ডিম আর কলা নিয়ে বসে ! ছিঃ !

এদিকে মনের দুঃখু ঝেড়ে ফেলে চারুশীলাও কলকাতা থেকে আসা রান্নার লোক মলয়কুমারকে নিয়ে রান্না বোঝাতে বসেছে, এবং বড়কর্তা বলছেন, 'তোদের খাওয়া হলে চল তোদের একবার সারা বাড়িটা চোরকুঠ্‌রি থেকে চিলেকোঠা পর্যন্ত দেখিয়ে দেব ছেলেবেলায় আমরা কোথায় খেলতাম । বাবা জ্যাঠামশাই ঠাকুর্দা-ঠাকুমা কোন্ ঘরে থাকতেন, কোথায় বসে বাড়ি সবাই মজলিশ করতেন ।'

চুমকি বলে উঠল, "সব তোমার মনে আছে দাদু ? ?

"মনে নেই ? বলিস কী ! ছবির মতো সব চোখে ভাসছে ।"

"তো এত যদি ভালবাসা তো সাতজন্মে আসো না কেন শুনি ? কলকাতাতেই পড়ে থাকো কেন ?"

বড়কর্তা একটু গম্ভীর হাসি হেসে বলেন "সে আর তোকে বোঝাই কী করে ? আসলে কী জানিস—"

কিন্তু ওই 'আসলটা' আর জানা হয় না চুমকির ! মূর্তিমান ছন্দপতনের মতো নরহরি এসে দাঁড়ায় । তার পিছনে পিছমোড়া করে বাঁধা একটা রোগা কালো দাঁতলা হাড়গিলে লোক !

"কর্তা !" নরহরি তেজী গলায় বলে, "ব্যাটাকে ধরে ফেলেছি। দেউড়ির ধারে ঘুরঘুর করছিল। বোধহয় শুধু আংটিটায় আশা মেটেনি, আরও কিছুর মতলবে...."

নরহরির দাপট থামিয়ে দিয়ে হাড়গিলে খ্যাঁকখেঁকিয়ে বলে ওঠে, "বেশি বাহাদুরি দেখাতে এসনি নরহরি পাল ! ধরেছি মানেটা কী ? ধরেছি মানে কী ? আমি তো নিজেই আসতেছিলাম কর্তার কাছে। তুমি শুদুশুদু গামছা পাকিয়ে বাঁধতে বসলে। তো বোসো। বয়েই গেল। কর্তা আপানার আংটিতে আমার কাজ নেই, ফেরত ন্যান। এই নরহরি পাল, হয় আমার বাঁধন খুলে দাও নচেৎ আমার ট্যাঁক থেকে আংটিটা বার করো ! আচ্ছা ঝকমারি বাবুদের বাড়ি চুরি করতে এসে ।"

শোনামাত্র বড়কর্তার আবার প্রেশার চড়ে যায়। "মানে ? ঝকমারিটা কিসের, অ্যাঁ !"

"আজ্ঞে আংটির মধ্যে নাম খোদাই করে রেখে হতভাগা বংশীকে দাতব্যি করা। বলি বংশী হতভাগা কি ওই আংটি আঙুলে গলিয়ে বাহার দিয়ে বেড়াবে ? বেচেই তো খাবে। তো বেচতে গেলে যমে ধরবে না ? এই তো সকালবেলাই বিরিঞ্চি স্যাকরার ঘরে গিয়ে শুধোলাম, পাথর ছাড়া সোনাটুকুর কত দাম করে দেছেন বলায় কী হাসি ! বলে কী, একখানা সদ্ ব্রাহ্মণ পেলেন রে তোকে কর্তাবাবু, যে তোকে আঙুরি দান করেছেন ? চলতো পুলিশে ?...."

বংশী শরীরটা নড়িয়েচড়িয়ে বেজার গলায় বলে, "তবে ! ঝকমারি আর কারে কয় ? নরহরি পাল বাঁধনটা খোলো তো। বারবার বলতে ভাল লাগে না।"

চোর বংশীর জোর গলার হুকুমে দরোয়ান-কাম-মালি নরহরি ওর বাঁধনটা খুলে দেয়।

বংশী ট্যাঁক থেকে কাগজ মোড়া আংটিটা ঠক করে বড়কর্তার পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে বলে, "এবার আমারে রেহাই দ্যান। খুব শিক্ষে হয়েছে।

কিন্তু রেহাই কে দেবে ?

বড়কর্তা তো ততক্ষণে ফায়ার। চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, "হতভাগা বেয়াদব, সর্বনারায়ণ রায়চৌধুরীর নাতি নরনারায়ণ রায়চৌধুরী 'দেওয়া' জিনিস ফিরিয়ে খুব যে সাহস দেখছি। জাঁকপুরের রায় চৌধুরীর ছেলে ভবনারায়ণ নেবে ? উঠিয়ে নিয়ে যা বলছি।"

"কর্তা," বংশী করজোড়ে বলে, "মাপ করবেন। উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারব না।"



"মাপ করব ? আয় বদমাশ, তোকে এই ছড়ি দিয়ে মাপ করি আয়।"

ছড়ি উঠোবার আগেই বংশী হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে এবং সেই শব্দে বাড়ির সকলে ছুটে আসে। ব্যাপার দেখে সবাই তাজ্জব।

চোর তার বাগিয়ে নিয়ে যাওয়া মালটি ফেরত দিয়ে আবার কাঁদে। কিন্তু কান্নাকে ডোন্টকেয়ার করে বড়কর্তা ছড়ি উঁচিয়ে হাঁক পাড়ছেন, "ওঠ, ওঠ বলছি। নইলে আগাপাশতালা বেত।"

নিরুপায় বংশী হঠাৎ বলে ওঠে, "তবে নয় জিনিসটা আপনি আমার কাছ থেকে কিনেই ন্যান।"

"কী, কিনে নেব ! তোর কাছ থেকে ? হা হা হা। ওরে চারু, এ ব্যাটা বলে কী !"

বংশীর জোর গলা, "ভুলটা কী বলেছি কর্তা ? এ তো আর চোরাই মাল নয় যে, কিনতে বাধ্য ? দানের দ্রব্য। পুরুতঠাকুররা দানের দ্রব্য বেচে না ?"

"অ্যাঁ ! ওরে আমার জাদু। মন্দ বলিসনি তো ! চারু, দেখেছিস শয়তানটার গাঁটে কী বুদ্ধি। ঠিক আছে কত'য় ছাড়বি বল ?"

"আজ্ঞে যা দেবেন।"

"যা দেবেন ! যা দেবেন মানে ? তোর জিনিস, তুই দর কষবি না ? বল ব্যাটা কত'য় দিবি ? হাজার ? দু হাজার ? আড়াই হাজার নাকি...."

"জ্যাঠামশাই !" চারুশীলা প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, "আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন ? শ'পাঁচেক টাকা ধরে দিলেই চোরটা বর্তে গিয়ে চলে যেত। অথচ আপনি...."

"অ্যাঁ ! কী বললি চারু ? তোর জ্যাঠার হাতে একটা পাঁচশো টাকার আংটি ছিল ?"

"আহা তা কেন ? মানে...."

"মানেফানে রাখ। নিয়ে আয় আমার পোর্টম্যান্টো !"

পোর্টম্যান্টো আসে। ভবনারায়ণ সেটা খুলে পার্সটা বার করেন, নগদ আড়াই হাজারই ছিল। বার করে এগিয়ে ধরেন, "যা ব্যাটা নিয়ে যা ! চোরের নাতি চোরের পুতি চোরের ব্যাটা চোর ! যা বিদেয় হ। তবে বলে রাখছি, এ থেকে কিছু খরচা করে একটু ভালমন্দ খা। আয়নার সামনে নিজেকে দেখেছিস কখনও লক্ষ্মীছাড়া ?

বংশী সাষ্টাঙ্গে একটা প্রণাম করে দে দৌড় !

বড়কর্তা ওর দৌড়ের ধরন দেখে হাসির চোটে আকাশ ফাটান, "দেখছিস ফুচুং টিকাই বোলন ঘেঁচু ! লোকটা কী বোকা ! কতটা লোকসান খেল, তবু কী আহ্লাদ !"

হিংসেয় জ্বলতে জ্বলতে নরহরি বলে, "লোকসানটা কী হল বড়বাবু ?"

"হল না ? ধর কাল রাত্তিরে যদি তোদের পিসিমা পোর্টম্যান্টোটা সরিয়ে না রাখত, সবসুদ্ধুই টুপ করে তুলে নিয়ে ভাগতে পারত ব্যাটা চোরের জামাই চোর। টাকা ছাড়াও কম জিনিষ আছে এতে। দামি দামি জামা কাপড়, দামি দামি বই ? যাক, লাভটা আমারই হল।"

চারুশীলা হঠাৎ ঢিপ করে একটা পেন্নাম ঠুকে বলে, "জ্যাঠামশাই বুঝতে পারছি না আপনি পাগল না খ্যাপা।"

বড়কর্তা ভুরু কুঁচকে বলেন, "পাগল খ্যাপা, এত সব ভাবতে না গিয়ে ভাবতে পারলি না চারু, এই লোকটা হচ্ছে জাঁকপুরের রায়চৌধুরীদের বংশধর !....ওরে চারু, নাতি নাতনিকে শুধু এই তিনমহলা বাড়িখানা দেখালেই হবে ? বাড়ির কর্তারা কেমন ছিল তার নমুনা দেখানো দরকার কি না ? বাড়ির কর্তারা কেমন ছিল তার একটু নমুনা দেখানো দরকার কি না ? বুঝলি ঘেঁচু, টুকাই ঘন্টু জাঁকপুরের বাবুরা এই রকমই ছিলেন পাগল বলিস পাগল। খ্যাপা বলিস খ্যাপা।"

যযাতি

ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য



বরাকর নদীটা যেখানে বাংলা আর বিহারকে আলাদা করে দিয়েছে তারই কাছাকাছি একটি জঙ্গল। এর চারদিকেই শালগাছের ভিড়, কিন্তু নদীর কাছটা শরবনে ঢাকা থাকায় ওদিকটায় কেউ একটা যেতে চায় না।

ছবি / বিমল পাল

তার ওপর ওখানে নাকি নদীর পাড় ঘেঁষে আছে চোরা বালি। দূর থেকে বোঝা যায় না কিন্তু সে বালিতে পা দিলে মানুষ শুদ্ধু তার মধ্যে তলিয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। এই জন্যই জায়গাটিকে সম্পূর্ণ লোকালয় বর্জিত বললে ভুল হবে না।

অবশ্য জঙ্গলে ঢুকবার একটা চোরা পথও আছে। ঘাস বন আর কাঁটাঝোপে ছাওয়া এই পথটির কথা বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল, কিন্তু একবার সব বাধা অতিক্রম করে যদি ভিতরে ঢোকা যায় তাহলে দেখা যাবে ওরই মধ্যে হাত কুড়ি-পঁচিশ জায়গা বেশ পরিষ্কার করা হয়েছে। আর, আশ্চর্য সেই কোদাল কোপানো জায়গায় কারা যেন একটা তাঁবু বসিয়েছে।

এই দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু ? কারা বসাল ? সরকারী বনবিভাগের লোকেরা ? নাকি কোন ভূতাত্ত্বিকের দল ?—কিন্তু কেন ?

এক হতে পারে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করে গেছে কেউ ওখানে, কিংবা ওদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্রেফ জরীপ করা। সারাদিন কাজের পর রাত্তির কাটাবার জন্য ঐ রকম একটা নিরাপদ জায়গাই তো চাই। কিন্তু এত জায়গা থাকতে ঐ দুর্গম জায়গাটাই বেছে নেবার কারণ কি ?

সন্ধ্যা হলেই কিন্তু রহস্যের মীমাংসা হবে ! ভূতাত্ত্বিকের দল নয়, বনবিভাগের লোকও নয়—ওটি একটি ডাকাত দলের সাময়িক আড্ডা। সারাদিন ধরে এর ওর পকেট কেটে, একে ওকে ছিনতাই করে কিংবা সময় সময় আরও দুঃসাহসিক লুটপাট সেরে দলের সবাই সন্ধ্যার পর এসে এখানে জড় হয়। এখানেই সর্দার ডাকাতের তত্ত্বাবধানে সাগরেদদের মধ্যে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ বাঁটোয়ারা হয়। সর্দারের ভাগটা একটু বেশিই হয় কিন্তু সেটা সর্দার হিসেবে তার অতিরিক্ত প্রাপ্য ভেবে কেউ আপত্তি করে না। দলের কেউ দলের ক্ষতি বা বিশ্বাসঘাতকতা করলে তারও বিচার ব্যবস্থা হয় এখানেই।

আজও সন্ধ্যায় তাঁবুর সামনে দলের জনা কয়েক এসে জড় হয়েছে। দলের সর্দার নিমচাঁদ আগেই এসে তাঁবুর মধ্যে বসে আছে। আরও জনা তিনেক আসতে বাকি, তারা এলেই দৈনন্দিন ভাগ বাঁটোয়ারার কাজ শুরু হবে।

একটু পরে আরও দুজন এল। তাদের একজন তখনও খোঁড়াচ্ছে। এতে কেউই আশ্চর্য হল না। সবাই জানে, এদের এ পেশাটা নিরবিছিন্ন সুখের পেশা নয়। সময় সময় ধরা পড়লে প্রচণ্ড মারধোর খেতে হয়, মাঝে মাঝে শ্রীঘর বাসও করে আসতে হয়। আর ধরা পড়বার ভয়ে পালাতে গেলেও নানা দৈহিক দুর্গতি ঘটতে পারে। খানায় পড়ে পা মচকে যাওয়া বা ইটের ঘায়ে জখম হওয়া—এতো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

কিন্তু একজন এখনও এসে পৌঁছল না। নিমচাঁদ বারে বারে ঘড়ি দেখছে। রাত আটটা বাজতে চলল। তার মানে কাজকর্ম সেরে উঠতে দশটা বেজে যাবে হয়তো ! অত রাত্রে এই জঙ্গলে বসে থাকা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। চারদিকে "টিকটিকির" দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখন কে এসে বিপত্তি বাধায় ঠিক নেই। অবশ্য তাদের ঠেকাবার মতো প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ওদের সঙ্গে মজুত আছে, তবু—পারতপক্ষে ও সব ঝামেলার মধ্যে না যাওয়াই ভালো।



যে লোকটি এখনও এসে পৌঁছায়নি তার নাম সুন্দরলাল। বছরখানেক হল সে দলে ঢুকেছে আর একজন সাগরেদের সুপারিশে। নিমচাঁদ গোপনে অনেক খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছে যে লোকটা ছদ্মবেশী পুলিশের লোক নয়, "টিকটিকি"ও নয়—সত্যিই এই পেশার আকর্ষণে দলে যোগ দিচ্ছে। কাজেই সেদিক দিয়ে কিছু বলার নেই। কিন্তু ও রোজই যখন তখন দেরী করে আসে, দলের শৃঙ্খলা মানতে চায় না। নিমচাঁদের কড়া নির্দেশ, উপার্জন হোক না হোক সন্ধ্যায় একবার এখানে প্রত্যেককেই হাজিরা দিতে হবে। কিন্তু সুন্দরলাল সেটা গ্রাহ্য করতে চায় না। কোনদিন হয়তো এলই না, দু তিন দিন বাদে তিনদিনের রোজগার এনে ধুপ করে ফেলে দিল।

আজও বোধহয় সে আসবে না। ঘড়ির কাঁটা দ্রুতবেগে ঘুরে চলেছে। আর বেশিক্ষণ এখানে থাকা চলবে না। তাকে বাদ দিয়েই কাজ সারা যাক তা হলে।

নিমচাঁদের বয়স হয়েছে। তা ষাট তো হবেই, হয়তো আরও কিছু বেশি হতে পারে। চুলে বেশ পাক ধরেছে। বয়স তুলনায় শরীর সুস্থ থাকলেও তাতে যে শীগ্‌গিরই ভাঙন ধরবে এ তার বুঝতে বাকি নেই।

ভাগ বাঁটোয়ারা শুরু হল। আজকের রোজগার কারও তেমন সুবিধের নয়। কালাচাঁদ পকেট কেটে একটা মানিব্যাগ এনেছে বটে কিন্তু যার মধ্যে রয়েছে মাত্র একখানা পাঁচ টাকার নোট আর সামান্য কয়েকটা সিকি

আধুলি।

নিমচাঁদ চটে গিয়ে বলল, "যত সব অকম্মার ধাড়ি ! এভাবে চললে ব্যবসা গুটিয়ে যে যার নিজের পথ দেখ গিয়ে।"

আর ঠিক সেই সময়ে এসে হাজির হল সুন্দরলাল। পকেট থেকে একটা মোটা সোনার হার সর্দারের দিকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "সোনার ভরি এখন কত সর্দার ? হিসেব কর তো এ হার ছড়ার দাম কত হতে পারে ? খুব তো লম্বাই চওড়াই বাৎ ঝাড়ছ, নিজে কি রোজগার করেছ শুনি ? পরের রোজগারের ওপর দিব্যি ফলাও করে ভাগ বসাতে লজ্জা করে না তোমার ?"

নিমচাঁদের সঙ্গে যে কেউ এভাবে কথা বলতে পারে তা নিমচাঁদ কেন, দলের আর কেউ কল্পনাও করতে পারত না। নিমচাঁদ বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কি বললি ! আবার বল তো ! আস্পর্দ্ধা তো কম না তোর !"

"হ্যাঁ, ফের বলছি। নিজের তো ঐ মুরোদ। পরের ধনে পোদ্দারী করে আর কতদিন চালাবে সর্দার ? শুধু বোলচাল দিয়ে এখন আর চিঁড়ে ভিজবে না। সেদিন গেছে।"

নিমচাঁদ আর থাকতে পারল না। পাশে রাখা ভোজালিখানা তুলে নিয়ে তেড়ে এল সুন্দরলালের দিকে। সুন্দরলাল কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে চাকতি লাঠিগাছটা দিয়ে সজোরে আঘাত করল ভোজালির ওপর। ভোজালি নিমচাঁদের হাত থেকে তিন হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল।

নিমচাঁদ এরপর কি করত বলা যায় না, কিন্তু তার সঙ্গীরা তাকে আগলে ধরল আড়াল করে। একজন সুন্দরলালের দিকে চেয়ে বলল, "তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে ;—নাকি নেশাটেশা করে এসেছিল ?"

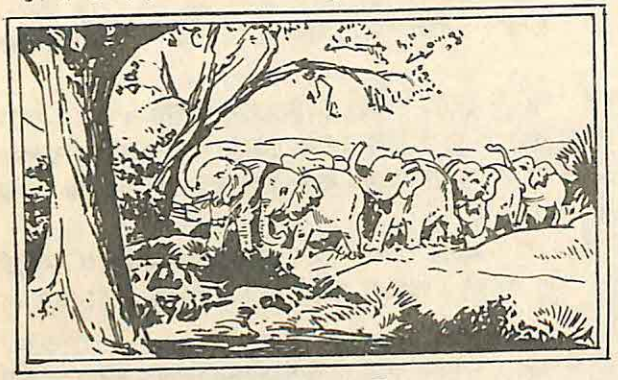
সুন্দরলাল নিজের সুপুষ্ট দুই বাহু আর বিশাল বক্ষকপাটের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, "না, নেশা আমি করি না। তবে অন্যায়ও সহ্য করতে রাজী নই।"

নিমচাঁদ রাগে থর থর করে কাঁপছিল। কিন্তু সুন্দরলালের শক্তিপুষ্ট দেহের দিকে একবার তাকিয়েই সে বুঝে নিয়েছিল নিজের মান বাঁচাতে হলে এখন মনে মনে চুপ করে যাওয়াই ভালো।



ব্যাপারটা সেদিন ওখানেই চুকে গেলে বটে কিন্তু নিমচাঁদের মনে স্বস্তি ছিল না। সে বুঝতে পারছে সত্যি তার বয়স বাড়ছে। আজ বাদে কাল দেহে জরার আবির্ভাব ঠেকানো যাবে না। তার মনে পড়ল বহুদিন আগে সে একবার দুই দাঁতাল হাতীর লড়াই দেখেছিল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা পাহাড়ের আড়ালে বসে বসে

দেখা সেই দৃশ্য আজও সে ভুলতে পারেনি । পাহাড়ের অনেকটা নীচে দিয়ে চলেছিল একপাল বুনো হাতী ।



সেই দলের সর্দার ছিল একটা বুড়ো দাঁতাল হাতী । হয়তো দলের দলপতিত্ব কেড়ে নেবার জন্যই একটা জোয়ান দাঁতাল হাতী তাকে যুদ্ধে আহ্বান করে ! সেই বন-কাঁপানো লড়াই-এর কথা সে কোনদিন ভুলতে পারবে না । শেষ পর্যন্ত জোয়ানের কাছে বৃদ্ধের পরাজয় ঘটেছিল । বুড়ো দলপতি যুদ্ধে হেরে প্রাণের ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাচ্ছে আর জোয়ান হাতীটা তাকে তাড়া করে চলেছে—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য । বুড়ো হাতীটা আর ফিরল না । অন্য হাতীগুলো এতক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল যুদ্ধের ফলাফল কি হয় দেখবার জন্য । বিজয়ী জোয়ান হাতীটা ফিরে এল আর তাদের সবাই সসম্ভ্রমে তাকেই দলপতি বা যূথপতি হিসেবে মেনে নিল ।

তার দশাও কি শেষ পর্যন্ত ঐ বুড়ো হাতীটার মতো হবে ?

না না, নিমচাঁদ বেঁচে থাকতে তা হতে দেবে না । এর প্রতিকার সে করবেই । কিন্তু কেমন করে ?

সুন্দরলালের গায়ে আসাধারণ শক্তি । বয়সেও সে তরুণ যুবা । তার ওপর যে-সব গুণ থাকলে নিমচাঁদের মতে তাদের এই পেশায় সাফল্যলাভ করা যায় তা তার আছে । আর সব চেয়ে বড় কথা, সে কারও তোয়াক্কা করে না—এমন কি সর্দার বলে নিমচাঁদকেও সে পাত্তা দিতে চায় না ।

হঠাৎ মনে পড়ল, কিছুদিন আগে সে এক সাধুবাবার কথা শুনেছিল । হিমালয়ের ওপরে আলমোড়ার কাছে তাঁর আশ্রম । তিনি সেখানে কায়কল্প গোছের কি একটা চিকিৎসা করেন । চিকিৎসা না বলে শিক্ষা দেন বললেই বোধহয় ঠিক বলা হয় । এই শিক্ষার বলে মানুষ নবযৌবন লাভ করে বৃদ্ধও ফের তরুণ হয়ে যায় । তবে চিকিৎসা বা শিক্ষা যাই বল,—তা নাকি বেশ কঠিন । কিন্তু যত কঠিনই হোক, নিমচাঁদ তা আয়ত্ব করবেই । মনে পড়ল মহাভারতের সেই যযাতি রাজার কথা । বৃদ্ধ বয়সে শরীর জরাগ্রস্ত হয়ে পড়লে তিনি সেই জরা তার ছেলে পুরুকে দিয়ে তার যৌবন চেয়ে নিয়েছিলেন । একালে অবশ্য ওভাবে কেউ জরা নিয়ে নিজের যৌবন দিয়ে দিতে পারে না, কিন্তু চেষ্টা করলে ঐ জরাকে তাড়িয়ে দিয়ে পুনর্যৌবন পাওয়া অসম্ভব নয়—কায়কল্পে নাকি সেই ব্যবস্থা আছে, আছে এই সাধুবাবার শিক্ষাপদ্ধতিতেও । নিমচাঁদকে তা-ই আয়ত্ব করতে হবে ।

কয়েকদিন চিন্তা করে নিমচাঁদ মন ঠিক করে ফেলল । এ ক'দিন সে সুন্দরলাল কেন, কাউকেই আর খাটায় নি । এর আগে দলের কেউ অকর্মণ্যতার পরিচয় দিলে সে বারুদের মতো জ্বলে উঠত, কিন্তু এ ক'দিন সে সে-সব দেখেও দেখল না ।



তারপর একদিন নিমচাঁদ সকলকে ডেকে বলল, "আমার একটু দেশভ্রমণের ইচ্ছে হয়েছে, তাই কিছু দিনের জন্য একটু ঘুরতে বেরুচ্ছি । তোদের আর কাউকে ব্যবসা বন্ধ রেখে আমার সঙ্গে যেতে বলব না, একা একাই বেরুব । তোরা তোদের কাজ আগের মতই করে যাস । দেশভ্রমণ সেরে আবার আমি এসে তোদের সঙ্গে যোগ দেব ।"

"সে কি সর্দার ! তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে ?"—অবাক্ হয়ে বলল তার অনুগত, দলের একজন ছোকরা সাগরেদ ।

"পাগল ! তোদের কি একেবারে ছেড়ে যেতে পারি ? ঐ তো বললাম, কিছুদিনের জন্য একটু দেশটা ঘুরে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে ! একা একা না ঘুরলে কি দেশ দেখা যায় ?"

শুনে সবাই যেন একটু মুষড়ে পড়ল, কেবল সুন্দরলালের মুখে দেখা দিল একটা বাঁকা হাসি । সে হাসি যে শ্লেষের তা বুঝতে কষ্ট হয় না । নিমচাঁদ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলে নিল ।

আলমোড়ার আশ্রমে সাধুবাবা নিবিড়ানন্দজীর কাছে নিমচাঁদের পুনর্যৌবন লাভের চিকিৎসা শুরু হয়েছে । ঠিক চিকিৎসা নয়, শিক্ষাই বলা যেতে পারে । তার মধ্যে আছে বেশ কয়েক রকম কঠিন কঠিন যৌগিক ব্যায়াম

এবং হঠযোগ। তাছাড়া খাওয়াদাওয়ার কঠিন কতকগুলি নিয়মও মেনে চলতে হচ্ছে। সাধুবাবা আরও বলেছেন, মনে কোন রকম মন্দভাব, খারাপ চিন্তা রাখা চলবে না, মনকে সর্বদা রাখতে হবে প্রফুল্ল—তাজা ফুলের মতো, তা সকলকে আনন্দ দেবে। আর, আশ্চর্য! বছর খানেক যেতে না যেতেই নিমচাঁদ দিব্যি বুঝতে পারল যে তার বয়স অনেক কমে গেছে। গায়ের চামড়া শিথিল হয়ে এসেছিল, সেগুলো আবার টান টান হয়ে উঠেছে, কালো চুলে সাদার ছোপ এখন আর তেমন চোখে পড়ে না। পেশীগুলিও হয়েছে যেমন পুষ্ট তেমনি সবল।

আরও এক বছর পার হল। নিমচাঁদকে একজন তরুণ যুবক বলেই ভুল হয়। যযাতি যেমন জরাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার নূতন যৌবন লাভ করেছিলেন, সেও কি তাহলে তাই পেয়ে গেল? বেঁচে থাকুন সাধুবাবা নিবিড়ানন্দজী!

পরের বছর নিমচাঁদকে দেখে কে বলবে, তার বয়স ষাট বছর কবে পেরিয়ে গেছে। সে যেন আবার পঁচিশ বছর বয়সের পূর্ণ যুবকে পরিণত হয়েছে। গায়ে যেমনি শক্তি, শরীরের গড়ন তেমনি সুঠাম। এ নিমচাঁদ আর সে নিমচাঁদ নেই,—যদিও মুখের চেহারা ঠিকই আছে, দেখলে নিমচাঁদ বলে চিনতে ভুল হয় না।

সাধুবাবার পায়ে প্রচুর প্রণামী দিয়ে, আশ্রমের অন্যান্য বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিমচাঁদ দেশের দিকে রওনা হল। কিন্তু দেশে গিয়ে কি করবে এখন—চট করে মনে পড়ছে না তো! হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুন্দরলালকে একচোট দেখে নিতে হবে।

বরাকরের অনতিদূরে সেই জঙ্গলটা, এখনও তেমনি দুর্ভেদ্য রয়েছে, আর তারই একটা নির্জন জায়গায় নিমচাঁদের আখড়াটাও ঠিক আছে। তবে এখন সেখানে তাঁবুর বদলে একটা চালাঘর উঠেছে। আজ পর্যন্ত কোন তথাকথিত 'টিকটিকি'র নজর পড়েনি ওখানে। আজও সন্ধ্যার পর দলের সকলে ওখানে গিয়ে জড় হয়, দরকার হলে রাতটাও কাটিয়ে দেয় কেউ কেউ। সুন্দরলালের মাতব্বরী এখন আরও বেড়েছে। সবাই তাকে ডাকে ছোট সর্দার বলে।

অতি পরিচিত আখড়া, তবু সেটা খুঁজে বের করতে নিমচাঁদের অনেকটা সময় লাগল। তবে শেষ পর্যন্ত সে খুঁজে বার করল জায়গাটা, তারপর হঠাৎ ধূমকেতুর মতো এসে হাজির হল।

দলের সবাই প্রথমটা এই অচেনা আগন্তুককে দেখে চমকে উঠেছিল। একজন তো তার পাইপগানটা উঁচিয়েও ধরেছিল তার দিকে। নিমচাঁদ হো হো করে হেসে উঠে হাত বাড়িয়ে তাকে থামিয়ে দিল। বলল, 'চিনতে পারছিস না আমাকে? ভালো করে দেখ। আমি তোদের সর্দার নিমচাঁদ,—কায়কল্প গোছের একটা চিকিৎসার হদিস পেয়ে এ ক'বছর সেখানে থেকে বয়সটা কমিয়ে ফেলেছি। কেমন জোয়ান জোয়ান মনে হচ্ছে না আমাকে?'

সত্যিই তো, গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গী, মুখের সেই আদল—সবই তো মিলে যাচ্ছে! শুধু বয়সটা যেন অনেক কম মনে হচ্ছে, আর শরীরটাও যেন জোয়ান জোয়ান পালোয়ানের মতো হয়ে গেছে। সকলে অবাক। সবচেয়ে অবাক সুন্দরলাল। এও কি তা হলে সম্ভব।

নিমচাঁদ আবার সর্দারের পদে প্রতিষ্ঠিত হল। বহুদিনের পুরোনো পেশা, তা কি সহজে ছাড়া যায়? এখন থেকে তার নাম হল বড় সর্দার, সুন্দরলাল ছোট সর্দার।



দিন এগিয়ে চলল। নিমচাঁদ এখন চেহারায় একেবারে তরুণ,—কর্মশক্তিও তার সেই অনুপাতে বাড়বার কথা। কিন্তু এ কি! মন তো তার মোটেই প্রথম বয়সের মতো তাজা বোধ হচ্ছে না! সব ব্যাপারে কেমন যেন একটা আলসেমির ভাব, আগের সেই উদ্যম তো কই, ফিরে আসছে না? নিজেই সে বুঝতে পারছে না, কেন এমনটা হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, কিছুদিন পরেই তার কয়েকটা নতুন উপসর্গ দেখা দিতে লাগল, কোন কিছুই সে যেন আর মনে রাখতে পারে না, সামান্য কথাও কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। আজকাল কানেও যেন একটু কম শুনছে, দৃষ্টিশক্তিও আগের মতো প্রখর নেই। টাকা-পয়সা রোজগারের দিকেও যেন আগের মতো আগ্রহ নেই। আগের পেশায় ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু এ যেন নেহাৎই একটা দায়সারা কাজ। নিমচাঁদ নিজেই পরিবর্তনটা বুঝতে পারে। কিন্তু এরকম হলে চলবে কেন? বৃথাই তবে সে আলমোড়ায় গিয়ে এ ক'বছর অকল্পনীয় পরিশ্রম করে এল।

ডাকাতির ব্যবসায় নামলেও নিমচাঁদ নেহাৎ অশিক্ষিত লোকের ঘরে জন্মায় নি, মোটামুটি শিক্ষিত

পরিবারেই তার জন্ম। ইস্কুলে লেখাপড়ায় সে নেহাৎ খারাপ ছিল না, এমনকি বছরদুয়েক কলেজেও পড়েছিল। তারপর তার জুটল কয়েকজন কুসঙ্গী, তারাই তাকে এই গোল্লায় যাবার পথে টেনে এনেছিল। কুসংসর্গে মিশে শেষ পর্যন্ত সে যে পেশা বেছে নিল তা ভদ্র সমাজে কল্পনা করা যায় না, তবে ভদ্র বংশের ছেলে বলে বাইরের লোকের কাছে সে নিজেকে ওভাবে ধরা দিত না, তখন তার চালচলন দেখে কেউ তার স্বরূপ বুঝতে পারত না! কিন্তু এবার সে সত্যি ভয় পেয়ে গেল।

হঠাৎ তার এক বাল্য সাথীর কথা মনে পড়ল। সে নাকি এখন মস্ত বড় ডাক্তার হয়েছে—বিশেষ করে মনের রোগের চিকিৎসায় তার খুব নাম। নিমচাঁদ ভাবল একবার তার কাছে যাবে। কিন্তু এতদিন পরে সে কি তাকে চিনতে পারবে? আর চিনলেও যদি নিমচাঁদের বর্তমান হালচালের কথা তারা জানা থাকে, তা হলে সে কি আর দেখা করতে চাইবে? তখন নিমচাঁদও তাকে গোবরা বলেই ডাকত এখন তার নাম ডাক্তার গোবর্দ্ধন রায়। অবশ্য নামের পরে অনেকগুলি ইংরেজি অক্ষরও বসানো আছে, যার সঠিক অর্থ নিমচাঁদ জানে না। তবে শুনেছে সেগুলি নাকি সব ভারীভারী বিলিতী ডিগ্রী।

যাই হোক, একদিন সকালে উঠে নিমচাঁদ সাহসে ভর করে ডাক্তার গোবর্দ্ধন রায়ের বাড়ি এসে হাজির হ'ল। ভালো নামটা তার মনেই এল না, গেটের সানে দাঁড়িয়ে "গোবরা! গোবরা!" বলে চীৎকার শুরু করে দিল।

দারোয়ান গোছের একটা লোক এসে বলল, "চিল্লাও মাৎ। কিস্‌কো মাংতা?"

নিমচাঁদ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "গো—গোবরাকো—হামারা দোস্ত।"

"গোবরা? ও কৌন হ্যায়? যাও যাও দিক মৎ কর।"

ঠিক এমনি সময়ে ওপরের বারান্দা থেকে কে একজন মাথা বার করে বললেন, "এই রাম সিং? উন্‌কো ব্যাঠনে বোলো। ম্যাঁয় তুরন্ত আতা হুঁ।"



ডাক্তার গোবর্দ্ধন রায় তাঁর 'গোবরা' নামটার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। এতদিন পর হঠাৎ সেই নাম শুনে মনে হল লোকটি নিশ্চয়ই সেকালের তাঁর বন্ধু-স্থানীয় কেউ হবে। কৌতূহলী হয়ে একটু পরেই তিনি নেমে এলেন।

বলা বাহুল্য, প্রথমটা কেউ কাউকে চিনতে পারল না, তবু নিমচাঁদ যখন গ্রামের স্কুলে দু-একজন মাস্টারমশাই আর এর ওর নাম করল তখন অবাক হয়ে ডাঃ গোবর্দ্ধন রায় বললেন, "আরে নিমে! তুই! বোধ হয় আজ পঞ্চাশ বছর পরে দেখছি। কিন্তু মুখের আদলটা ঠিক আছে। কিন্তু এখনও এমন ছোকরা আছিস কি করে, সত্যি নিমে তো? না তার ছেলে?"

আরও দু-চারটে টুকিটাকি কথার পর নিমচাঁদ তার আসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করল। আলমোড়ার সাধুবাবার কাছ থেকে পুনর্যৌবন লাভের কাহিনীও বলল, শুধু বলল না পেশার কথা, যা ডাক্তার জানেন না বলেই সে বুঝে নিয়েছিল।

ডাক্তার বললেন, "হুঁ, তাই বল্, এরকম শুনেছি বটে কিন্তু আজ চোখে দেখলাম, চেহারাটা তো দিব্যি বাগিয়েছিস, কিন্তু আসল জায়গা, মাথাটা?—সেটাই তা হলে পরীক্ষা করে দেখব। চল আমার চেম্বারে।" নানারকম যন্ত্রপাতিতে ঠাসা সেই ঘর তো ডাক্তারের চেম্বার নয়, যেন একটা ল্যাবরেটরী। ডাঃ গোবর্দ্ধন রায় নিমচাঁদকে একটা চেয়ারে বসিয়ে তার মাথাটা নানাভাবে পরীক্ষা করলেন। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে

আলো নিভিয়ে দিয়ে একটা যন্ত্র থেকে একরকম তীব্র আলো এনে ফেললেন নিমচাঁদের মাথার খুলির ওপর। পাশেই ছিল একটা অদ্ভুত ধরনের পর্দা। মনে হল সেই পর্দার ওপর নিমচাঁদের মাথার ভিতরকার সমস্ত কলকজার ছবি উঠে গেছে। গোবর্দ্ধন আলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আতিপাতি করে পরীক্ষা করে চললেন সেই ছবি।

প্রায় আধঘন্টা পরে সুইচ্ অফ্ করে দরজা খুলে দিলেন।

অনেকক্ষণ কি চিন্তা করলেন ডাক্তার, তারপর বললেন, হুঁ যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই, বয়স কমলে কি হবে, মন তো বদলানো যায়নি! মন বলতে আমরা মগজটাকে বুঝি, কারণ আমাদের যা চিন্তা-ভাবনা, আচার আচরণ, সমস্ত অনুভূতি-সবেরই আস্তানা হচ্ছে এই মগজ, সেই মগজ তোর বদলানো সম্ভব হয়নি। সেটা যেমন বুড়োর মগজ তেমনি বুড়োর মগজই রয়ে গেছে। এখন বুঝতে পারছিস বোধ হয় কেন তোর স্মরণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি কমে আসছে। শরীরের অন্যান্য অংশের মতো মগজও তো কতগুলি কোষ দিয়ে তৈরী। আমরা বলি মগজ-কোষ বা ব্রেইন সেল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই মগজ কোষ কুঁকড়ে ছোট হয়ে আসে। বয়স যত বাড়ে মগজও তত ছোট হতে থাকে। বেশী দিন বেঁচে থাকলে মগজের ওজন দেড়শ' থেকে দুশ' গ্রাম পর্যন্ত কমে যেতে পারে। হবেই তো, মগজের কোষ কুঁচকে যাওয়া মানেই তো মগজ ছোট হয়ে যাওয়া। আরও একটা কাণ্ড ঘটে আমাদের শরীরের সমস্ত কোষে রক্ত সঞ্চালনের জন্য রয়েছে অসংখ্য ধমনী বা আর্টারি। তারাই কোষগুলিকে সতেজ রাখে। সঙ্গে সঙ্গে এই ধমনীগুলিও শক্ত হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও পুরু হয়ে যায়। মগজেও তো রক্ত-সঞ্চালন করার ভার এদেরই উপর! কিন্তু ঐ রকম শক্ত হয়ে যাবার ফলে তা দিয়ে আর আগের মতো রক্ত সঞ্চালন সম্ভব হয় না। ফলে কোষগুলো বাড়বে কি করে? যাই হোক মগজের সঙ্গেই রয়েছে অসংখ্য স্নায়ু, যা নাকি আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে যুক্ত আর ওরই ফলে আমরা দেখতে পাই, শুনতে পাই, গন্ধ টের পাই, জিভে স্বাদ পাই, স্পর্শ টের পাই। এখন মগজ যদি কুঁচকে ছোট হয়ে যায় তাহলে ওদের ভিতরের ফাঁকগুলিও সরু হয়ে যাবে আর ওর সঙ্গে যুক্ত স্নায়ুগুলোও তখন ঠিকমতো তাদের কাজ করতে পারবে না। স্নায়ুগুলোই তো টেলিগ্রামের তারের মতো মগজের সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যোগাযোগের কাজ করে। আজকাল মগজের ওই ব্যাপার স্যাপার নিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রচুর গবেষণা করে চলেছেন। বুড়ো হলে মগজের কাজ কেন বিকল হতে থাকে তার কারণ খুঁজে বার করেছেন। কিন্তু এই রকমই হয়। এখন স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে পড়লে কি হবে? তখন ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি কমতে শুরু করবে, কানও সব কথা ঠিক ধরতে পারবে না, স্মৃতি শক্তিও আস্তে আস্তে কমে আসবে—কথা মনে থাকবে না, লোক চিনতে ভুল হবে—এইরকম আরও কত কি! একেই তো আমরা বলি জরা। আর বয়সের সঙ্গে এই জরা আসবেই—কারো দু'দিন আগে, কারো দু'দিন পরে।"

নিমচাঁদ বাধা দিয়ে বলল, "তা হলে আমি যে পুনর্যৌবন পাবার জন্য এত করলাম—দেহের দিক দিয়ে পেলামও, এর কি কোন মূল্য নেই?"

ডাক্তার হেসে বললেন, "তুই খোদার ওপর খোদকারী করতে গিয়েছিলি। ফলে শরীরটা হয়তো তরুণের মতো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মগজের ওপর কারিকুরি করার সাধ্য নেই কারো—অন্ততঃ আজ পর্যন্ত যতদূর জানি। তাই মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া থাকবেই। আর বুড়ো হলে এই জরার হাত থেকে রেহাই নেই। তাই জোয়ান চেহারা পেয়েও বার্ধক্যের অন্যান্য যা যা লক্ষণ সেগুলোকে বইতে হচ্ছে তোকে। আর কিছুদিন গেলে দেখবি তোর দেহের আর মনের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"এর তা হলে কোন চিকিৎসা নেই?"—হতাশভাবে প্রশ্ন করল নিমচাঁদ।



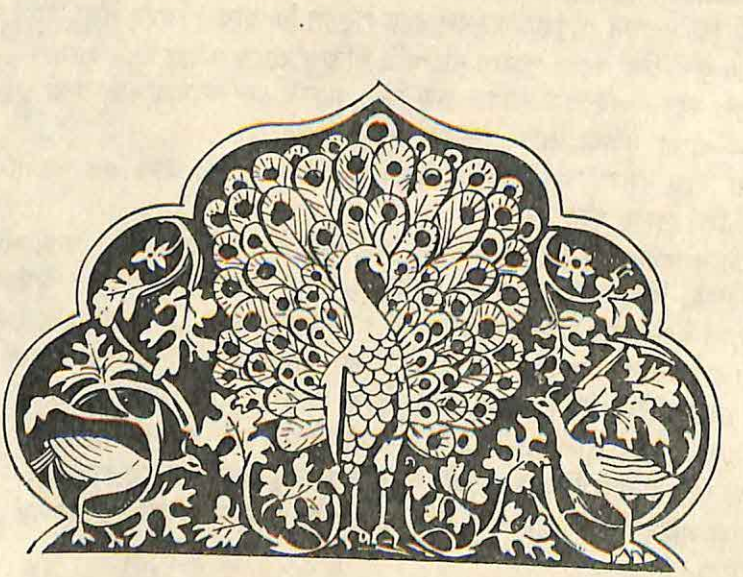
"না। একেই আমরা বলি নিয়তি। জোর করে কিছু কিছু তার পাল্টাতে পারলেও সব কিছু পালটে দেওয়া যায় না। তাহলে সৃষ্টির নিয়মই যে ভণ্ড হয়ে যাবে! বাল্যযৌবন—বার্ধক্য, তারপর একদিন তার লয়; এই হচ্ছে সৃষ্টির নিয়ম।"

নিমচাঁদ উঠে এল। চলতে চলতে তার কেবলই মনে হতে লাগল এ ক'টা বছর সে বৃথাই এত কষ্ট করেছে। কলি যুগের যযাতি তার দেহ থেকেই জরাকে নিয়েছে, কিন্তু মন থেকে তাকে সরাতে পারে নি।

অভ্যাসমতো গুটি গুটি নিমচাঁদ সন্ধ্যার সময় আবার সেই জঙ্গলের আড্ডায় এসে পৌঁছল। অন্ধকারে দলের লোকেরা তখন এক এক করে জড় হচ্ছে। সুন্দরলাল আজকাল তাদের ফূর্তির জন্য প্রায়ই নানারকম খাবারদাবারের আয়োজন করে, আজও করেছে। যারা এসেছে তারা এরই মধ্যে মিষ্টিগুলি নিয়ে কাড়াকাড়ি

শুরু করে দিয়েছে। নিমচাঁদ এসে কাছে দাঁড়াল, কিন্তু কেউ তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। নিমচাঁদের মনে হল এই সব সদ্যতরুণদের আসরে তার কোন স্থান নেই, চেহারায় যাই হোক, মনের দিক থেকে তার সঙ্গে এদের কোন মিল নেই। এখন ওদেরকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে যাওয়াই তার কর্তব্য। নিমচাঁদের পরে সুন্দরলালই এ আসরে অনেক বেশি মানানসই।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সকলের চোখের আড়ালে ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।





খেয়ার মাঝি লক্ষ্মীনাথ

সতীকান্ত গুহ

মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলে লক্ষ্মীনাথ নামে একটি মাঝি বাস করত। বছরের পর বছর, গভীর রাত্রের দুটি প্রহর বাদে আর সব কয়টি প্রহর সে তার কালো নৌকা নিয়ে কালো নদীর এপার ওপার করত।

ইচ্ছাপুরের বিচিত্র খেয়াঘাট। নদীটির নাম ভানুমতী। ভানুমতীর ভেল্কি জানে এই নদী। যদিও পদ্মার কুলভাঙা ঢেউয়ের রাশি সেখানে নেই, মেঘনার কালো জলের সর্বনাশা ধাক্কা নেই, দামোদরের আকাশ ভাঙা বন্যাও নেই তবু অনেক কিছু রকমারি কৌশল আছে এই ভানুমতী নদীর জলে। চোরাই ঘূর্ণি পাক দেয় জলের তলায়, আর সেই সঙ্গে কখনো আকাশ নীল মেঘে ছেয়ে যাওয়ার সঙ্গে সে হয়ে যায় নীল ; তেমনি সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়—রঙিন আকাশের সঙ্গে রঙিন ইস্পাতের মতন ঝকঝকে আকাশের সঙ্গে চকচকে আর সন্ধ্যার আবীর-ছোপ আকাশের সঙ্গে রক্তলাল হয়ে যায় নদী।

লক্ষ্মীনাথের কিন্তু লক্ষ্য থাকেনা সেদিকে, সে তন্ময় হয়ে দেখে নদীর এপার আর ওপার। এই এপার থেকে ওপার, ওপার থেকে এপারে—এই দুটি পার ঘণ্টায় ঘণ্টায় যাত্রীবোঝাই নৌকা নিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসা, এই তো তার জীবন ! নৌকা বাইতে বাইতে সে মাঝে মাঝে ভাবে, কী চমৎকার তার জীবন ! দুটি পারের মাঝখানে নৌকা বেয়ে কেমন দিব্যি কাটে তার দিন !

বাইরের পৃথিবী তার চক্ষের আড়ালে পলকে পলকে ভেঙে প'ড়ে চুরমার হয়ে আবার নতুন হয়ে তৈরি হচ্ছে, সে কথা সে জানত না। সে জানত না তার সামনে অনেক দূরে উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্থানে আমীরে আমীরে যুদ্ধ বেঁধেছে। জানত না তার পিছনে অনেক দূরে দক্ষিণ দেশে মারাঠী পেশোয়া ইংরেজের হাতে মার খেয়েছে। জানত না তার ডাইনে বাঁয়ে অনেক অনেক দূরে দেশী রাজ্যের অদৃষ্ট-তারকা এক এক করে নিভছে।

সে জানত না মানুষের কথা টেলিগ্রাফের তার ধরে এক নিমেষে সহস্র মাইল পার হয়ে অনেক দূরে পৌঁছে যাচ্ছে। জানত না ইচ্ছাপুরের দশ ক্রোশের ভিতর রেল লাইন পাতা হয়ে তার উপর দিয়ে বিনি ঘোড়ার আজব গাড়ি ছুটে চলেছে, জানত না পৃথিবীর ইতিহাস বদল হয়ে একেবারে নতুন করে লেখা হচ্ছে। এই রকম আরো অনেক অনেক কথা জানত না এই খেয়াঘাটের মাঝি লক্ষ্মীনাথ।

তবু, থেকে থেকে অনেক উড়ো খবর তার কানে এসে পৌঁছত। যে বিচিত্র যাত্রীর দলকে পারাপার করত সে, তাদের ভিতর থাকত হরেক রকমের মানুষ। সেপাই, মিস্ত্রি, চৌকিদার, টোলের পণ্ডিত, আড়তদার, কামার, কুমোর—আরো কত রকমের মানুষ। তাদের মুখে সে নতুন পৃথিবীর অনেক গল্প শুনত। তাদের কাছে সে শুনেছিল, কলকাতা নামে একটা শহরের পথে পথে সাহেবদের টমটম্ আর বাবুদের জুড়ি ভিড় করে চলে; সাহেবরা কালীঘাটে লুকিয়ে লুকিয়ে পুজো দিতে যায়, বাংলাদেশের অনেক শহরে রাত্রে রাস্তায় কেরোসিনের খুঁটিয়ালা আলো জ্বালানো হয়। সে ভাবত কী আশ্চর্য কাণ্ড, পৃথিবী যে স্বর্গকেও হার মানাতে চলল! স্বর্গেও কি আর রাস্তায় আলোর এত ছড়াছড়ি!

এক এক দিন তার বড় লোভ হত, ছুটি নিয়ে সে শহর দেখে আসে, সেই আজব কলকাতার সকল রহস্য একটিবার উঁকি দিয়ে দেখে আসে। কিন্তু তখনই খেয়া নৌকার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে ভাবত, হায়! তার কি ছুটি আছে! সে চলে গেলে ইচ্ছাপুরের খেয়া বাইবে কে? যাত্রীর বোঝা এপার থেকে ওপার চালান করবে কে?

একদিন, ভিনগাঁয়ের একটি ছোকরা মাঝি বলেছিল, 'যাও না তুমি শহর দেখতে। তোমার খেয়াঘাট আমি সামলাব 'খন'। তখন কিন্তু লক্ষ্মীনাথের শহর দেখার নেশা ছুটে গিয়েছিল। মাথা নেড়ে গম্ভীর চালে সে বলেছিল, 'তা হয় না! ইচ্ছাপুরের খেয়া বাওয়া কি যার তার কর্ম!'

এমনি করে অনেক বছর যায়। চারিদিকে পৃথিবীর চেহারা বদলে যায়, কিন্তু ইচ্ছাপুরের খেয়াঘাটের কিছুই বদল হয় না। সেখানের ইতিহাসের সেই একহারা গল্প—নদীর জল, নৌকার ছায়া, যাত্রীর ভিড় আর এপারে বসে ওপার পানে তাকিয়ে মাঝি লক্ষ্মীনাথের অবিরাম নৌকো বাওয়া।

একদিন বিকেলে রোদ যখন হেলে পড়েছে, তখন যাত্রীর দলে এল একটি আশ্চর্য মানুষ। নীল পোশাক তার, নীল টুপি। নৌকো যখন ঘাট ছেড়েছে, লক্ষ্মীনাথের সঙ্গে তার আলাপ শুরু হল।

লোকটি লক্ষ্মীনাথকে বললে, 'কর্তার মাঝিগিরি করা হচ্ছে ক'বছর?'

লক্ষ্মীনাথ জবাব দিলে, 'এই গিয়ে পঞ্চাশ বছর।'

লোকটি যেন আকাশ থেকে পড়ল—'বল কি হে! পঞ্চাশ বছর যে নদী শুকিয়ে মাঠ, মাঠ বানভাসি হয়ে নদী হয়ে যায়! আর এই পঞ্চাশ বছর তুমি খেয়াই বাইছো?'

লক্ষ্মীনাথ কিন্তু ভাবলে, লোকটা তো ভারি অদ্ভুত। পঞ্চাশ বছর খেয়া বাওয়া—তা এতে আশ্চর্যের কী আছে?

লোকটি এবার লক্ষ্মীনাথকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোন কোন জেলায় কোন কোন নদীতে খেয়া বেয়েছো, বলো তো শুনি!'

লক্ষ্মীনাথ বললে, 'কেন, কোথায় আর! এই ভানুমতীর জলে।'

লোকটির মুখে গম্ভীর বিস্ময় ফুটে উঠল। একদৃষ্টিতে লক্ষ্মীনাথের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে সে বললে, 'কী তাজ্জব! পঞ্চাশ বছর ধরে শুধু ভানুমতীর জল, আর ইচ্ছাপুরের খেয়াঘাট?'

লক্ষ্মীনাথ চটেমটে ভাবলে তাকে বলে যে, এই ভানুমতীর জল আর ইচ্ছাপুরের খেয়াঘাট—একি তুচ্ছ হল? এখানের জলে এখানের আকাশে যে আলোয় অন্ধকারে ছায়ায় কত রঙ-বদল হয়, তা'কি সে জানে? এখানে জলে কত অদ্ভুত জীব মাঝে মাঝে নদীর তল থেকে উঁকি দিয়ে খেয়াঘাটের নৌকো দেখে আবার ডুবে যায়, আকাশে কত বর্ণের কত পাখি অনেক অজানা দেশ থেকে ভেসে আসে, তাও হয়তো সে জানে না। আর নিশ্চয়ই সে জানে না সেই কথা—সেই যে একদিন খেয়াঘাটের সামনের মাঠ বেয়ে অনেক দূরের অরণ্য থেকে একটা হরিণ এই খেয়াঘাটে এসে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু লক্ষ্মীনাথকে কথা বলার ফুরসৎ দেয় না লোকটি। মাথা দুলিয়ে মুরুব্বি চালে সে বলে, 'পঞ্চাশ না হলেও পঁচিশ বছর আমারও কাটছে জলের উপর। তবে সেও জল, আর এও জল।'

অবাক হয়ে লক্ষ্মীনাথ বললে, 'সে জলের রঙ বুঝি সোনালি!'

লোকটি এবার হেসে বললে, 'না হে না, সে সোনালি জল নয়! সে হচ্ছে সমুদ্দুরের জল। সে জলের রঙ

নীল। আকাশের চেয়েও নীল।'

লক্ষ্মীনাথ ভাবলে তাই বুঝি এই লোকটির পোশাকের রঙ নীল। একটুক্ষণ চুপ থেকে লক্ষ্মীনাথ বললে, 'সমুদ্দুর! সমুদ্দুর কোথায়? সে কি অনেক দূর?'

লোকটি বললে, 'অনেক দূর না তো কি? এই যে তোমাদের ভানুমতী নদী, এ গিয়ে, মিশেছে রূপবতী নদীতে। রূপবতী মিশেছে ইচ্ছামতীতে, ইচ্ছামতী মিশেছে গঙ্গায়, গঙ্গা মিশেছে উপসাগরে, উপসাগর সাগরে আর সাগর মিশেছে মহাসাগরে। শুধু সমুদ্দুর নয়, সেই যে মহাসমুদ্দুর



যাকে অনেকে মহাসাগর বলে, সেখানে লোক পারাপার করি আমি। আমি না, আমরা। আমরা হাজার হাজার লোক সেখানে খাটছি খেয়ায়।' অপরিসীম বিস্ময়ে লক্ষ্মীনাথের নিশ্বাস রোধ হয়ে এল। সে আশ্চর্য মানুষটি বলে চলল আশ্চর্য কাহিনী, মহাসমুদ্রে আশ্চর্য খেয়া-পারাপারের কাহিনী। এপার থেকে ওপার অনেক অনেক মাইল—সেই অনেক অনেক মাইল মহাসমুদ্রে শাদা ফেনা ছিটিয়ে ছুটে চলে তাদের খেয়া নৌকা। সে তো সামান্য নৌকা নয়—জাহাজ। খেয়া নৌকার মতন দাঁড় দিয়ে বাওয়া যায় না সেই বিরাট নৌকা। অনেক আগে চলত অসংখ্য পালে, এখন চলে বাষ্পের ধাক্কায়। সে জাহাজ কি এমনি তেমনি জাহাজ, যেন মস্তবড় প্রাসাদ। নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া, ঘুমনো-বেড়ানো, নির্বিবাদে চলেছে সেখানে। আর কত আলো সেই সব জাহাজে। অন্ধকার রাতে যখন সমুদ্রের প্রকাণ্ড ঢেউয়ের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে টলমল করে ছুটে চলে সেই সব জাহাজ, অনেক দূর থেকে মনে হয় একশো মণি মাথায় করে ছুটে চলেছে বিশাল অজগর।

একটুক্ষণ থেকে দম নিয়ে লোকটি বললে, 'সে কি আর ভানুমতীর এপার-ওপার! কত দেশে কত রাজ্য-রাজধানীতে হাজার মাইলের যাত্রীকে ঘাটে পৌঁছে দেয় জাহাজ। কত দেশ কত বন্দর, কত শহর, কত মানুষ! লাখো টাকা খরচ করে সমুদ্দুরে খেয়া পার হচ্ছে কত লোক, তার কি লেখাজোকা আছে?'



লক্ষ্মীনাথ নীরবে সমুদ্র-খেয়ার আজব কাহিনী শুনলে। অনেকক্ষণ চুপ থেকে সে বললে, 'তোমাদের খেয়ায় কি কখনো কোনো রাজপুত্র পার হয়েছে?'

সেই লোকটি তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে, 'কখনো কি হে! রাজপুত্রেরা তো হামেশাই পার হচ্ছেন, এই তো বছরখানেক আগে আমাদের জাহাজে চেপেই মিশরের রাজপুত্র বিলেতে পাড়ি জমালেন।'

লক্ষ্মীনাথ ভাবলে, সমুদ্র-খেয়াতেই তাহলে রাজপুত্রেরা আজকাল ঘুমন্ত কন্যার দেশে পার হচ্ছেন। আহা সেখানে মাঝিগিরি করলে রাজপুত্রদের সঙ্গে তো তারও দেখা হয়ে যেত!

লক্ষ্মীনাথের নিশ্চল মূর্তির দিকে তাকিয়ে সেই আশ্চর্য মানুষটি মনে মনে কী-একটা জল্পনা করলে! তারপর খেয়া নৌকা যখন অপর তীরে পৌঁছল, তখন সে লক্ষ্মীনাথের কাছে একটু ঘেঁষে বসে বললে, 'কী হে লক্ষ্মীনাথ! ইচ্ছে থাকে তো চলো আমার সঙ্গে, জাহাজে মাঝিগিরি জুটিয়ে দেব!'

লক্ষ্মীনাথ উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'পারবে তুমি আমাকে জাহাজের মাঝি করে দিতে?'

সেই লোকটি বললে, 'ছোঃ! এ আর তেমন শক্ত কাজ কী? জাহাজের কাপ্তেন আমার খাতিরের লোক।'

লক্ষ্মীনাথ বললে, 'আচ্ছা, তাহলে কাল সকালে এসো ! আমাকে আবার দেড়ক্রোশ হেঁটে গাঁয়ের মোড়লের কাছে গিয়ে কাজে ইস্তফা দিয়ে আসতে হবে। রাতে যাব সেখানে। এসো কিন্তু ভুলো না।'

সেই লোকটি হেসে লক্ষ্মীনাথের পিঠ চাপড়ে বললে, 'আরে না, না, ফাঁকি দেবার শর্মা আমি নই।'

সেদিন দুপুর-রাতের কিছু আগেই লক্ষ্মীনাথ খেয়াঘাট থেকে তার ঘরে ফিরল। অত্যন্ত ব্যস্ত সে। খেয়েদেয়ে খানিকক্ষণ বাদেই তিন মাইল দূরে গাঁয়ে কাজে ইস্তফা দিতে যেতে হবে। খেয়াঘাট তো বন্ধ থাকবার নয়। সময়মতো খবর না দিলে নতুন মাঝি বহাল হবে না, লক্ষ্মীনাথের ছুটিও মিলবে না। খুব তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীনাথ নাকেমুখে খেলে। খেয়ে ঘরে শিকল দিয়ে সে চলল মাঠ ভেঙে গাঁয়ের দিকে।

লক্ষ্মীনাথ চলেছে হন হন করে ! মহাসমুদ্রের আশ্চর্য খেয়া তার রক্তে ডাক দিয়েছে। যেখানে নীল জলে ঢেউয়ের পাহাড় ভেঙে পড়ে যেখানে অতিকায় তিমিরা জলের ফোয়ারা তুলে অন্ধ বেগে ছুটে চলে, যেখানে ধূ ধূ জলের তেপান্তর অনেক হাসি-গান-উৎসব বুকে করে ছুটছে জাহাজ—সেখানের আকাশের তলায় চঞ্চল ঢেউয়ের মাঠে নাচছে লক্ষ্মীনাথের মন। লক্ষ্মীনাথ ভাবছে, পঞ্চাশ বছর বাদে আসল খেয়ার ডাক পড়েছে তার।

মাঠের পথ ধরে একটি লোক উল্টোদিক থেকে আসছিল। লক্ষ্মীনাথকে দেখে সে থামল। জোর গলায় ডাকল, 'লক্ষ্মীনাথ !'

লক্ষ্মীনাথ চমক ভেঙে সামনে তাকাল। সেই লোকটি বললে, 'লক্ষ্মীনাথ, কোথায় চলেছ রাত্রে ?'

লক্ষ্মীনাথ বললে, 'খেয়াঘাটের কাজে ইস্তফা দিতে চলেছি গাঁয়ে। কাল সকালে মহাসমুদ্রে মাঝিগিরি করতে যাচ্ছি কিনা।'

সেই লোকটি বললে, 'কাল সকালেই ?'

লক্ষ্মীনাথ বললে, 'হ্যাঁ, কাল সকালেই যেতে হচ্ছে। নীল-পোশাকি নাবিককে কথা দিয়েছি !'

লোকটির মুখ কালো হয়ে গেল। সে বিষণ্ণকণ্ঠে বলল, 'তুমি তো যাচ্ছ লক্ষ্মীনাথ, কিন্তু কী উপায় হবে বলো তো ?'

লক্ষ্মীনাথ লোকটিকে খুব ভালো করে ঠাহর করলে। কিন্তু কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। লক্ষ্মীনাথ সাশ্চর্যে বললে, 'তুমি কে ? কিসের উপায়ের কথা বলছ ?'

সে বললে, 'আমি ইচ্ছাপুর গাঁয়ে বাস করতে আসছি। কয়েকদিন বাদে আমার ছোট ছেলেটি আসবে।'

লক্ষ্মীনাথ বললে, 'তাই কী ?'

লোকটি জবাব দিলে, 'খেয়া পার হবার হাঙ্গামা আছে না আবার ? ভাবছি তুমি গেলে পর—'

লক্ষ্মীনাথ বললে, 'তাতে ভাববার কী আছে ? আমি গেলে নতুন মাঝি বহাল হবে যে। খেয়া পার তখন সে-ই করবে।'

সেই লোকটি মাথা ঝেঁকে বললে, 'না না, লক্ষ্মীনাথ। জানো তো, ভানুমতীর জলে আজকাল ঘূর্ণি লাগছে ! সেই ঘূর্ণি সামলে খেয়া বাওয়া কি যার তার কর্ম ? ভাবছি, আমার ছেলেটা শেষে ডুবে না মরে !'

লক্ষ্মীনাথ বললে, 'হুঁ ! খেয়া একটু হুঁশিয়ার হয়েই বাইতে হবে ! তা গাঁয়ের মোড়ল কি আনাড়ি লোক বহাল করবে ?'

লক্ষ্মীনাথ মুখে এ-কথা বললে বটে, কিন্তু তার মনে পড়ে গেল, এক দিন এক ছোকরা মাঝিকে সে বলেছিল, ইচ্ছাপুরের ঘাটে খেয়া-বাওয়া যার-তার কর্ম নয় !

লোকটি লক্ষ্মীনাথের কথায় আশ্বস্ত হল না। কাতরস্বরে সে বললে, 'লক্ষ্মীনাথ, আমার ছেলে পার হওয়াতক কটা দিন তুমি সবুর করে যাও !'

লক্ষ্মীনাথ একটু মুখ কালো ক'রে, একটু মাথা নেড়ে বললে, 'তা হয় না ভাই। মহাসমুদ্রে কাল আমার না গেলেই নয়।'

লোকটি লক্ষ্মীনাথের মুখের পানে তাকিয়ে আর একবার কী-একটা কথা বলতে গিয়ে কোনো কথা না বলে চলে গেল।

লক্ষ্মীনাথ আবার হন হন করে হেঁটে চলল। রাত দেড়টার ভিতর গাঁয়ের মোড়লের বাড়িতে না পৌঁছলে নয়। কিন্তু চলতে চলতে হঠাৎ সে থেমে গেল। সে বিস্মিত হয়ে দেখলে, তার মনে মহাসমুদ্রের ছবির

পাশে আর একটা ছবি ফুটে উঠছে। মনের সেই ছবি ধীরে ধীরে তার চক্ষের সামনে যেন এসে দাঁড়াল। লক্ষ্মীনাথ দেখলে, সাতবছরের একটি শিশু ইচ্ছাপুরের খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে ডাকছে, 'লক্ষ্মীনাথ!' ভানুমতীর জলে নূতন মাঝি বসে



আছে নৌকায়। সে ডেকে বললে, 'এসো খোকা, খেয়া পার করে দি।' সেই শিশু মাথা নেড়ে বললে, 'না তোমার বাওয়া নৌকায় উঠব না। যদ্দিন লক্ষ্মীনাথ না আসে, বসে থাকব খেয়াঘাটে। সে এলে পার হব।' নূতন মঝি শিশুর কথা কানে না তুলে জোর করে তাকে খেয়া নৌকায় তুলে নিলে। লক্ষ্মীনাথ দেখলে ভানুমতীর জল চোরা ঘূর্ণিতে ভরে গেছে। খেয়াপথের চারিপাশে পাতালের ফাঁদ পাতা হয়ে গেছে। নূতন মাঝির কিন্তু খেয়াল নেই, সে নৌকো ছেড়ে দিলে। তখন লক্ষ্মীনাথ পাগলের মতন আকুল চিৎকার করে উঠল 'খেয়া ছাড়িসনে, থাম থাম! ওকে পার করে দেব আমি।' সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীনাথের চক্ষের ঘোর কেটে গেল। সে দেখলে ফুটফুটে জোৎস্না রাত্রে আকাশের তলায় ইচ্ছাপুরের মাঠে দাঁড়িয়ে সে কাকে চিৎকার ক'রে কী বলে থরথর কাঁপছে। লক্ষ্মীনাথ ভাবলে, এ কী! এ কি স্বপ্ন? কই কোথাও তো কেউ নেই। কিন্তু তখনই কারা যেন অসীম আকাশে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'হায় লক্ষ্মীনাথ! কোথায় চলেছ? তুমি গেলে ইচ্ছাপুরের খেয়া যে উঠে যাবে।' লক্ষ্মীনাথ ভাবলে, এমন কেন হল? সে একবার পিছন ফিরে তাকাল। তার মনে হল অনেক যাত্রী যেন অনেক দূর থেকে বলছে—'আমরাও ইচ্ছাপুরের খেয়া পার হতে আসব। তুমি গেলে আমাদের খেয়া পার করবে কে?'

লক্ষ্মীনাথ ভাবলে, সত্যিই কি তাই? সে গেলে ভানুমতীর ঘূর্ণি সামলে নৌকো বাইতে কি আর একটিও মাঝি থাকবে না? সে চলে যাবার পর এই ইচ্ছাপুরের খেয়া কি বন্ধ হয়ে যাবে?



জ্যোৎস্না রাত্রে ইচ্ছাপুরের নির্জন খেয়াঘাটের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মীনাথের মন মায়ায় ভরে গেল। তবু, তবু, মহাসমুদ্রের খেয়ার কথা তো সে ভুলতে পারে না! লক্ষ্মীনাথের মন দোটানায় পড়ে আকুল হয়ে গেল। তখন সে করজোড়ে ঈশ্বরকে ডেকে বলল, 'হে প্রভু! ইচ্ছাপুরের খেয়াঘাটে পার হতে যারা আসছে, তাদের জন্য বসে রইলাম আমি, কিন্তু চিরটা কাল আমাকে ছোট খেয়ার মাঝি করে রেখো না তুমি। একদিন মহাসমুদ্রের খেয়া বাইতে দিও।'

পরদিন, রাত না পোহাতে সেই নীল-পোশাকি মানুষটি এল, লক্ষ্মীনাথের ঘর ফাঁকা দেখে আশ্চর্য মানলে। তারপর সে দেখলে, ইচ্ছাপুরের ঘাটে যাত্রীর দল খেয়া নৌকোতে উঠছে। আর খেয়া নৌকোয় দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীনাথ।

নীল-পোশাকি লোকটি বললে, 'কী হে! খেয়া নৌকোর নতুন মাঝি আসে নি বুঝি?'

লক্ষ্মীননাথ বললে, 'না।'

লোকটি বললে, 'মোড়লটা আচ্ছা পাজি তো!'

লক্ষ্মীনাথ বললে, 'মোড়লের কাছে যাই নি। ছুটি নেবার সময় হলে যাব'খন।'

লোকটি বললে, 'তার মানে? আজ সকালে রওনা হবে বললে তুমি—হঠাৎ বুঝি মত বদলেছ?

লক্ষ্মীনাথ বললে, 'না, ভাই। মহাসমুদ্রে যেতে আমার বড় সাধ। কিন্তু কয়েকজন যাত্রী খেয়া পার হতে আসবে, খবর পেলাম রাত্রে। আমি চলে গেলে তারা হয়তো আর খেয়া পারই হবে না।'

সেই লোকটি বললে, 'তাহলে, আমি আর কটা দিন নয় দেখেই যাই, যদি তারা এর মাঝে এসে পড়ে।'

লক্ষ্মীনাথ কী ভেবে বললে, না ভাই তুমি যাও। কবে তারা আসে ঠিক নেই! হঠাৎ কাল রাতে মনে হল হয়তো তারা আসবে।'

লোকটির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সে বললে, মরো, পচা নদীর পচা খেয়ায় মাঝিগিরি করে মরো! ভেবেছিলাম, জাহাজে মাঝিগিরি জুটিয়ে একটা হিল্লে করে দেব। তা বরাতে যখন নেই তোমার—'

লোকটি চলে যাচ্ছিল। লক্ষ্মীনাথ তার একটা হাত খপ করে ধরে ফেলে বললে, 'ভাই, রাগ কোরো না। তোমার ঠিকানাটা আমায় দিয়ে যাও। একদিন মহাসমুদ্রের পারে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

লোকটি কোর্তার পকেট থেকে এক চিরকুট কাগজ বার করে লক্ষ্মীনাথের হাতে দিয়ে বললে, 'এই নাও, আমার ঠিকানা। বছরে একবার দেশে ফিরবার ছুটি পাই। কাগজে যে তারিখ লেখা আছে সেই তারিখে ফি বছর কলকাতার গঙ্গার ঘাটে গেলে আমার দেখা মিলবে।'

লোকটি চলে গেল। লক্ষ্মীনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাত্রীবোঝাই খেয়ানৌকো ছেড়ে দিল।

এমনি করে অনেক দিন যায়। অনেক যাত্রী এপার থেকে ওপারে, ওপার থেকে এপারে আসে। ভানুমতীর জলে আট প্রহরের ছয় প্রহর নৌকা বাওয়া চলে। প্রত্যেক্ দিন লক্ষ্মীনাথের মনে হয়, সেদিনই বুঝি সব যাত্রী ফুরিয়ে গেল, পরদিনই বুঝি তার ছুটি মিলবে। কিন্তু রাতে বিছানায় শুয়ে যেই সে ঈশ্বরকে ডেকে বলে, 'প্রভু ছুটি দাও—' অমনি শুনতে পায় অনেক দূর থেকে কারা ব'লে ওঠে, 'না, না, যেও না লক্ষ্মীনাথ, আমরাও আসছি ইচ্ছাপুরের খেয়া পার হতে। এখনো তুমি যেও না।' কিন্তু মহাসমুদ্রের স্বপ্ন দিনের পর দিন লক্ষ্মীনাথের চক্ষে গাঢ় হয়ে আসে। একদিন সে কাতর কণ্ঠে ঈশ্বরকে ডেকে বললে, 'হে প্রভু, আরো কত যাত্রী রেখেছ আমার জন্য? আমার যে দিন ফুরিয়ে যায়। মহাসমুদ্রের খেয়া বাওয়া হয়তো আর হল না!'

একদিন লক্ষ্মীনাথ ভাবলে, দূর ছাই! এমনি করে আর কদ্দিন? যাত্রীরা এসে নয় ফিরে যাক। তাদের সঙ্গে তো আর আমার চুক্তি হয় নি যে তাদের পার করে দিতেই হবে।

সেদিন রাত্রে লক্ষ্মীনাথ তার কাপড়-জামা, টাকাকড়ি একত্র করে একটা পুঁটুলি বাঁধলে। পরদিনই সে কলকাতায় গঙ্গার ঘাটের উদ্দেশে রওনা হবে। পুঁটুলি বাঁধা শেষ করে ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়ল, একটু জিরিয়ে নেবে। সেই সময় খচ্ করে একটা কথা বিঁধল তার মনে। লক্ষ্মীনাথের মনে হল, অনেকদিন আগে যখন ইচ্ছাপুরের মোড়লের কাছে সে যাচ্ছিল, তখন একটি অপরিচিত লোক তার ছেলের খেয়া পার হবার কথা বলেছিল। সেই রাত্রে একলা মাঠে সে স্বপ্ন দেখেছিল, সেই ছেলেকে খেয়া পার করতে যাচ্ছে এক আনাড়ি মাঝি। তখন চেঁচিয়ে লক্ষ্মীনাথ বলেছিল,'খেয়া ছাড়িসনে, থাম থাম! ওকে পার করে দেব আমি।'



সেই ছেলেটি কি খেয়া পার হয়েছে? না একটি বছরেও তো সে এসে পৌঁছয় নি! লক্ষ্মীনাথ এই এক বছরের যাত্রীদলের কথা স্মরণ করলে। তার মনে পড়ল না, এই এক বছরে কোনো ছেলে পার হয়েছে। সেই অন্ধকারেই লক্ষ্মীনাথ পুঁটুলি খুলে ফেলতে গেল। সেই ছেলেটিকে সেদিন মাঠে সে কথা দিয়ে ফেলেছে, তাকে খেয়াপার করে দেবে। হায় সে যদ্দিন না আসে তার তো ছুটি নেই!

লক্ষ্মীনাথ পুঁটুলি খুলতে যাচ্ছে—তখন সহসা কে ডাকলে, 'লক্ষ্মীনাথ।' তার সকল শরীর শিউরে উঠল। এ যে শিশুর কণ্ঠ! 'কে?' বলে লক্ষ্মীনাথ সাড়া দিলে। খোলা কপাট দিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখলে নির্জন খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে এক শিশু। লক্ষ্মীনাথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘর ছেড়ে বার হল। হায়, এতদিন পর তার ছুটি মঞ্জুর করেছেন বিধাতা, এসেছে এই শিশু, যাকে পার করে দিলে ছুটি মিলবে, মহাসমুদ্রের খেয়ার ডাকে সাড়া দেবার অবকাশ জুটবে।

লক্ষ্মীনাথ নৌকা খুলতে খুলতে বললে, 'এসো, এসো, নৌকোয়।'

ছেলেটি মৃদু হেসে নৌকায় এসে উঠল। হেসে বললে, 'বড্ড দেরি হয়ে গেল আমার, লক্ষ্মীনাথ। প্রায় এক বছর আগে আমার আসবার কথা ছিল। তোমার মহাসমুদ্রের খেয়ার দেরি হয়ে গেল, না লক্ষ্মীনাথ?

এ-রকম মধুর কথা লক্ষ্মীনাথ জীবনে আগে শোনে নি। সে বললে, 'তা হোক। তুমি না এলে আমি কি যেতে পারি ভাই? ভানুমতীর ঘূর্ণি যে কী, তা তো আর জানো না? যাক, তুমি তো এলে। এবার ইচ্ছাপুরের খেয়াঘাট ছেড়ে যাব মহাসমুদ্রে।'

ছেলেটি হেসে বললে, 'তাই নাকি!'

অপর পারে নৌকা ভিড়ল। পারে নেমে



ছেলেটি বললে, 'লক্ষ্মীনাথ, তুমি তো চলে যাবে। নতুন মাঝিকে ঘূর্ণি সামলাবার কৌশলটা শিখিয়ে যেও কিন্তু।'

লক্ষ্মীনাথ বললে, 'কেন, বলো তো?'

ছেলেটি বললে, 'আমি আবার পার হব কি না!'

তার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মীনাথ বললে, 'কদিন বাদে তুমি ফিরবে বলো তো?' তুমি আসাতক আমি নয় থেকে যাই।'

ছেলেটি বললে, 'তা কী করে হয়? আমি তারপর আবার যে খেয়া পার হব।'

লক্ষ্মীনাথ বললে, 'টেনেমেনে তদ্দিন পর্যন্ত আমি থাকতে পারি!'

ছেলেটি বললে, 'কিন্তু তারপরও যে আমি আবার ফিরে আসব খেয়া পার হতে।'

লক্ষ্মীনাথ বললে, 'এমনি করে কতকাল খেয়া পার হবে তুমি?'

ছেলেটি হেসে বললে, 'চিরকাল।'

লক্ষ্মীনাথ তার পানে তাকিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে বললে 'তাহলে এই খেয়াঘাটে আমিও রইলাম চিরকাল।'



সহসা রাত্রের জোছনা কেঁপে কেঁপে উঠল। লক্ষ্মীনাথ হঠাৎ দেখলে কোথায় কতদূরে যেন ভানুমতী নদীর জল সরু রুপোলি পাড়ের মতন চিকচিক করছে, আর তাদের সামনে আর এক সোনালি নদীর জলে জোয়ার এসেছে। সেখানে সোনার নৌকায় সোনার দাঁড়!

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে লক্ষ্মীনাথ সেই আশ্চর্য শিশুর পানে তাকাল।

মৃদু হেসে সেই শিশু বললে, 'ভানুমতীর খেয়া থেকে ছুটি হল তোমার, লক্ষ্মীনাথ! মহাসমুদ্র পার হয়ে আরো বড় খেয়ায় এসেছ তুমি। এখন থেকে স্বর্গের খেয়ায় সোনার নৌকো বাইবে তুমি।'

পদ্মাপারের মেয়ে



নলিনী দাশ

হোপলেস !'

বন্দনাদির চাপা মন্তব্য কানে যেতে মালতী থতমত খেয়ে তোৎলাতে লাগল, তারপরে বসে পড়ল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, কান ঝাঁঝা করছে ! বন্দনাদি জিগ্যেস করলেন 'আর কে চেষ্টা করবে ? নমিতা ? শর্মিলা ? শান্তি ? নূপুর ? কেউ পারবে না ?'

নূপুর উঠে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বলল 'চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু আমি যে পূর্ববঙ্গের কথা বলতে পারি না দিদি ? শিখিয়ে দিতে হবে'—

'মালতী তোমাকে সাহায্য করবে,—পারবেনা মালতী ?' মালতী মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তখনও সে কথা বলতে পারছে না—তার মনে হচ্ছে সবাই তাকে নিয়ে হাসছে, ভদ্রতা করে মুখে কিছু বলছে না ! বন্দনাদি আর শ্যামলীদি মেয়েদের শনিরবির মধ্যে ভাল করে পার্ট শিখে নিতে বললেন। সোমবার থেকে পুরো রিহার্স্যাল শুরু হবে।

টিচারেরা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই বই কখানা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হল—সবারই একখানা বই চাই।

নায়িকা সোনালি মিহিগলায় বলল, 'আমার এত বড় পার্ট, একটা আলাদা বই না দিলে কখন কপি করব, কখন শিখব ?'

নায়ক সোহিনী বলল 'নন্দা তোর বাড়ির কাছে থাকে, তার ছোট্ট পার্ট, তোর বই থেকেই কপি করে নেবে'—

কৃষ্ণা বলল 'আমার পার্টও বেশ বড়, কিন্তু এই শনিরবিতে বাড়িতে যা হৈ-হৈ হবে—কি যে করব—একটুও কাজ হবে না'—

'কেন রে ? ও, তোর ছোড়দার বিয়ে ! বৌদি তো তোর বন্ধু-নারে ?'

মালতী চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়েছিল, মেয়েদের কলরবে সহজভাবে যোগ দিতে পারে না সে । চুপি চুপি নূপুর এসে বলল, 'আমাকে কিন্তু সত্যিই সাহায্য করতে হবে, নইলে পারব না । নেহাৎ কেউ রাজী হচ্ছিল না তাই আমি পার্টটা করব বললাম ।'

মালতী হেসে বলল, 'একটু সাহায্য করলেই পারবে'—

'তুমি কিন্তু আমার চেয়ে অনেক সহজভাবে পার্টটা করতে পারতে'—

'দেখলেই তো, পারলাম না'—

'কেন যে শুধু শুধু ঘাবড়ে গেলে ! তুমি তো পূর্ববঙ্গের কথা স্বাভাবিকভাবেই বল ।' মালতী উত্তর দেবার আগেই সেকেন্ড ট্রিপের মেয়েদের ডাক পড়ল, একদল মেয়ে রওনা দিল । যারা বাড়ির মোটরে যায়, একে একে সবার গাড়ি এল । নূপুরের গাড়ি আগেই এসে দাঁড়িয়ে ছিল, সে বলল, 'চল আজ তোমাকে পৌঁছে দিই, সন্ধ্যা হয়ে গেছে'—

ব্যস্ত হয়ে মালতী বলল, 'না-না আমি নিজেই যেতে পারব'—

কিন্তু নূপুর তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গাড়িতে তুলল । রাসবিহারী এভিন্যু, গড়িয়াহাট-রোড, ঢাকুরিয়া ব্রিজ পার হয়ে গাড়িটা একটু থামল, সেই সুযোগে দরজা খুলে নেমে মালতী বলল

'আমি এখানেই নামলাম !' কিছুতেই সে তাদের গলির মধ্যে পুরোন বাড়িতে স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে যেতে রাজি নয় । তার ঠামার সেকেলে হাব-ভাব দেখে, 'বাঙাল কথা' শুনে যদি তারা হাসে ? সে তার সহ্য হবে না !

বালিগঞ্জের নাম করা স্কুল 'বালিকা শিক্ষানিকেতনে'র অধিকাংশ ছাত্রীই অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে । আবার মালতীর মত কিছু সংখ্যক মধ্যবিত্ত ঘরের মেধাবী মেয়ে পরীক্ষা দিয়ে, বৃত্তি নিয়ে পড়ছে । এই ব্যাপারে সহপাঠিনীদের কোনো মাথাব্যথা আছে এমন প্রমাণ না পেলেও মালতীর সঙ্কোচ কাটতে চায় না, সে সহজ হতে পারে না । ক্লাসে সে সেরা ছাত্রীদের একজন । সাহিত্য-রচনায়, আর গানের দলে সে অংশ নেয় । কিন্তু, সহজ হ'তে পারে না বলে অভিনয় করতে গেলেই সে ঘাবড়ে যায়, তার কান ঝাঁঝাঁ করে, মুখের কথা জড়িয়ে যায় । তার প্রিয় টিচার বন্দনাদি তার দিকে তাকালেই সে তোৎলাতে শুরু করে ! অথচ তার একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে সে ভাল অভিনেত্রী হবে । বহু নাটক সে পড়েছে, বাড়িতে ঠামাকে পড়ে শুনিয়েছে । তাঁর সামনে হাত-পা নেড়ে অভিনয় পর্যন্ত করেছে । কই ? তখন তো সে দিব্যি লম্বা-লম্বা পার্ট করতে পারে, কথা জড়িয়ে যায় না, হাত পা ঠাণ্ডা আর কান গরম হয় না । ঠামাও তেমনি । দিব্যি নাতনীর সঙ্গে অভিনয় করেন । নিজেদের ছোটবেলাকার অভিনয়ের গল্প বলেন !



'বালিকা শিক্ষানিকেতনের' খ্যাতি শুধু লেখাপড়ার জন্য নয় । এখানে হাতের কাজ, খেলাধূলা, নাচগান খুব ভাল হয়, আর অভিনয়ের তো কথাই নেই । টিচারদের, বিশেষতঃ বন্দনাদির আর শ্যামলীদির উৎসাহে একটা নাট্যসমিতি গড়ে উঠেছে, সপ্তাহে সপ্তাহে সেখানে নাটক পড়া হয় এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভিনয় করা হয় । এবারকার এই অভিনয়ের গুরুত্ব খুব বেশি, কারণ 'সর্ব-কলিকাতা আন্তঃ বিদ্যালয় একাঙ্ক নাটিকা প্রতিযোগিতা'য় যোগ দেওয়া হয়েছে । বন্দনাদি আর শ্যামলীদি বলেছেন যে প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে শিল্ডটা তো জিততেই হবে । শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর মেডেলটাও পাওয়া চাই । রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখ বিখ্যাত লেখকদের সর্বজন-পরিচিত নাটকগুলি বাদ দিয়ে তাঁরা বেছে নিয়েছেন এক অখ্যাত লেখকের নাটক 'পদ্মপারের মেয়ে ।' লেখক বিখ্যাত না হলে কি হবে, নাটিকা দারুণ জমজমাট, স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিযুগের পটভূমিকায় লেখা । রোমাঞ্চকর উত্তেজনায় ঠাসা ।

'কোন ভূমিকায় কে অভিনয় করবে ?' বন্দনাদি প্রশ্ন করতে না করতেই কয়েকটি মেয়ে সমস্বরে বলল 'তরুণ বিপ্লবী নায়ক তো সোহিনীই হবে'—আরো কয়েকটি মেয়ে বলল 'আর সেই কলেজের মেয়ে, নায়িকার পার্ট করবে নিশ্চয় সোনালি'—

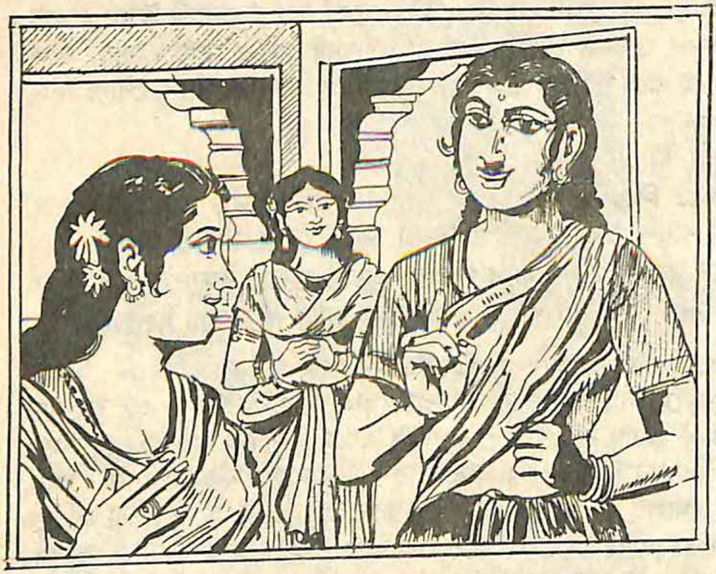
নায়িকার বাবা-মা, ছোট ভাই, গুপ্ত সমিতির ছেলেমেয়েরা, জাঁদরেল পুলিশ অফিসার আর সেপাইদের পার্টও সহজেই বাছা হয়ে গেল।

'ঠাকুমা কে হবে ?' বন্দনাদি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মনে রেখো, নায়িকার বুড়ি ঠাকুরমার পার্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বইটার নাম পদ্মাপারের মেয়ে ঐ ঠাকুরমার নামেই।'

নূপুর মালতীর নাম বলেছিল, 'পূর্ববঙ্গের কথা কি আর কেউ বলতে পারবে ?'

মালতীও রাজী হয়েছিল, কিন্তু যখনই মনে হল সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে, পার্ট বলতে গিয়ে সে থতমত খেয়ে গেল, তোৎলাতে শুরু করল। বন্দনাদি বললেন, 'হোপলেস !'

সোমবার থেকে জোর রিহার্স্যাল শুরু হল। সোনালী আর সোহিনী চমৎকার অভিনয় করছিল ; জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের পার্টে মোটা রঞ্জনা আর বোকা সেপাইর ভূমিকায় চারু, ছোটছেলের পার্টে নন্দা,—সবাই ভাল করছিল। নূপুর কিছুতেই সহজভাবে পূর্ববঙ্গের কথা বলতে পারছিল না, কিন্তু হেসে, হাত পা নেড়ে, ত্রুটি সেরে দিতে চেষ্টা করছিল।



বন্দনাদি সবাইকে উৎসাহ দিয়ে বলছিলেন, 'বেশ হচ্ছে মেয়েরা, কিন্তু আরো ভাল অভিনয় করতে হবে মনে রেখো, শিল্ড জেতা চাইই'—

দেখতে দেখতে অভিনয়ের দিন কাছে এসে গেল। রবিবার অভিনয় ! তারই স্টেজ রিহার্স্যালের জন্য শনিবারও স্কুল বন্ধ। মেয়েরা সাজগোজ করছে, এমন সময় রঞ্জনা বলল 'নূপুর' কোথায় ? নূপুরকে দেখেছিস কেউ ?' আরো দুচারজন বলে উঠল, 'তাইতো, নূপুর আসেনি'—'সে তো কখনও দেরী করে না'—

গোলমাল শুনে গ্রীনরুমে এসে বন্দনাদি খবর জেনে বললেন, 'সত্যিই ভারি মুস্কিল হল। ছোট মেয়েরা অভিনয় দেখবে বলে বসে আছে, আর তো দেরী করা চলে না। তোমরা শুরু কর, এখনই হয় তো নূপুর এসে যাবে। যতক্ষণ না আসে, প্রম্পটার জোরে জোরে ওর কথাগুলো বলে দেবে, আর শর্মিলার কোনো পার্ট নেই, সে ঠাকুরমার সাজ পরে, স্টেজে উঠে মূকাভিনয় করবে'—

এইভাবেই রিহার্স্যাল শুরু হল, ক্রমে শেষ হতে চলল, তবু নূপুর এল না। ততক্ষণে বন্দনাদি সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

অভিনয় শেষ করে অন্য সব মেয়েরা যে-যার সব বাড়ি চলে গেল, তখনও মালতীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বন্দনাদি বললেন, 'কিছু বলবে ?' একটু ইতস্ততঃ করে মালতী বলল, 'বলছিলাম কি, আমার মনে হয় নূপুরের জলবসন্ত হয়েছে'—

'কি সর্বনাশ ! কে বলল তোমাকে ?'

'কেউ বলেনি—মানে, ঠিক জানিনা, কিন্তু, ওর ভাই-বোনের হয়েছে, আর কাল নূপুর বলছিল যে তার জ্বর আসছে, গায় মাথায় ব্যথা'—

ঠিক তখনই নূপুরের মায়ের চিঠি নিয়ে ওদের দারোয়ান এল, তিনি লিখেছেন যে নূপুরের জলবসন্তই হয়েছে, তিনি খুব দুঃখিত, নূপুরের পক্ষে অভিনয় করা সম্ভব নয়।'

মাথায় হাত দিয়ে বসলেন বন্দনাদি। কালই যে অভিনয় ! আর তো নতুন কাউকে শিখিয়ে নেবার সময় নেই—তবে তাঁদের এত সাধের, এত আশা ও শ্রমের ফল এই অভিনয় কি বন্ধ করে দিতে হবে ?

আর কাউকে সামনে না পেয়ে বন্দনাদি বললেন, 'কি উপায় হবে মালতী ?' সাহস সঞ্চয় করে মালতী বলে ফেলল, 'একটা উপায় হতে পারে দিদি, যদি অনুমতি দেন, আমার ঠাকুমা অভিনয় করবেন'

আকাশ থেকে পড়লেন যেন বন্দনাদি 'তোমার ঠাকুমা !! কি বলছ ? বুড়োমানুষ'—

মালতী যেন তার স্বাভাবিক লজ্জাসঙ্কোচ ভুলে গেছে, সে বলল, 'এটা তো বুড়ি ঠাকুমারই ভূমিকা। ঠামা ছোট বেলায় নারায়ণগঞ্জের স্কুলে খুব ভাল অভিনয় করতেন, একবার মেডেল পেয়েছিলেন।'

'কিন্তু কাল অভিনয়, তিনি পার্ট শিখবেন কখন ?'

'পার্টতো ঠামার শেখাই আছে—আমি রোজ বাড়ি ফিরে ঠামার কাছে সব পার্ট শোনাতাম উনি আমার সঙ্গে অভিনয় করতেন—এটা আমাদের একটা প্রিয় খেলা। যখন শুনলেন নূপুরের অসুখ, তখন রাজি হলেন'

'তাহলে কাল অন্ততঃ তাঁকে একটু তাড়াতাড়ি নিয়ে এসে, গ্রীনরুমেই রিহার্স্যালের ব্যবস্থা করি।'

'সেটা বোধ হয় ঠামা রাজী হবেন না দিদি—দরকারও হবে না। দেখবেন, উনি ঠিক স্টেজে উঠে পার্ট করে দেবেন, কেউ বুঝতেও পারবে না।' উপায়ান্তর না দেখে বন্দনাদি মালতীর এই অভূতপূর্ব প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন, কিন্তু স্বস্তি পেলেন না। শেষে একটা লোক হাসানো কাণ্ড হবে না তো ? তার চেয়ে কি অভিনয় বন্ধ করাই ভালো ? মালতী আবার বলল, 'ঠামা সত্যিসত্যি পদ্মাপারের মেয়ে, নূপুর বেচারি এত চেষ্টা করেও ঠিকভাবে পূর্ববঙ্গের কথা বলতে পারছিল না।' বন্দনাদি এবার হেসে ফেললেন।

অভিনয়ের দিন মেয়েরা এসে অবাক হয়ে শুনল যে নূপুরের বদলে এক নতুন অভিনেত্রী পার্ট করবে—একেবারে অভিনয়ের সময় সে স্টেজে এসে উঠবে।

'তার নাম কি দিদি ?'

'বিনা রিহার্স্যালে করবে কি করে ?'

'আমাদের স্কুলের মেয়ে নয় ?—কোন স্কুলের ?'

বন্দনাদি ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বললেন, 'আর একটাও প্রশ্ন নয়— খুব ভাল ব্যবস্থা হয়েছে—স্টেজে উঠেই বুঝবে। নিশ্চিন্তমনে অভিনয় কর।' কিন্তু মনে মনে তিনি নিজে মোটেও নিশ্চিন্ত বোধ করছিলেন না। শুরু হবার সময় হতে চলল—অথচ মালতী বা তার ঠাকুমা কারো দেখা নেই ! শেষে একটা কেলেঙ্কারি হবে না তো ? বন্দনাদি ঘর বার করতে লাগলেন।

একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। এক বৃদ্ধা নেমে ধীর পায়ে সোজা গ্রীনরুমের দিকে চললেন।

'আপনিই কি মালতীর ঠাকুর-মা ?' জিজ্ঞাসা করলেন বন্দনাদি।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন বৃদ্ধা।

আর কথাবার্তার সময় ছিল না। বন্দনাদি বৃদ্ধাকে নিয়ে গ্রীনরুমে গেলেন। অভিনয় শুরু হয়ে গেল।

ক্রমে অভিনয় বেশ জমে উঠল। নায়ক-নায়িকা চমৎকার করছে, বিপ্লবী ছেলেমেয়েরাও কম যায় না। প্রথম দিকে ঠাকুমার বেশি বড় ভূমিকা ছিল না, খুব সুন্দর, স্বাভাবিকভাবে তিনি অভিনয় করে গেলেন।

শেষ দৃশ্যে নবাগতা বৃদ্ধার চমৎকার অভিনয় দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল। কি স্বাভাবিক কথাবার্তা, সপ্রতিভ সাবলীল ব্যবহার ! হাসি-ঠাট্টা করে, নারকেল নাড়ু চন্দ্রপুলি খাইয়ে তিনি পুলিশ অফিসারদের ভুলিয়ে আটকে রাখলেন, ওদিকে নায়ক-নায়িকা সহ বিপ্লবী ছেলেমেয়েরা যে পদ্মা পার হয়ে পালিয়ে গেল, সে-খবর তারা জানতেও পারল না। যবনিকা পড়বার পরে হাত তালির চোটে হল-ঘর যেন ফেটে পড়তে চাইল। সবার মুখে কেবল পদ্মাপারের ঠাকুমার নাম।

মেয়েরাও সবাই তার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। কিন্তু, কোথায় সে ? স্টেজে নাই, গ্রীনরুমেও নাই !

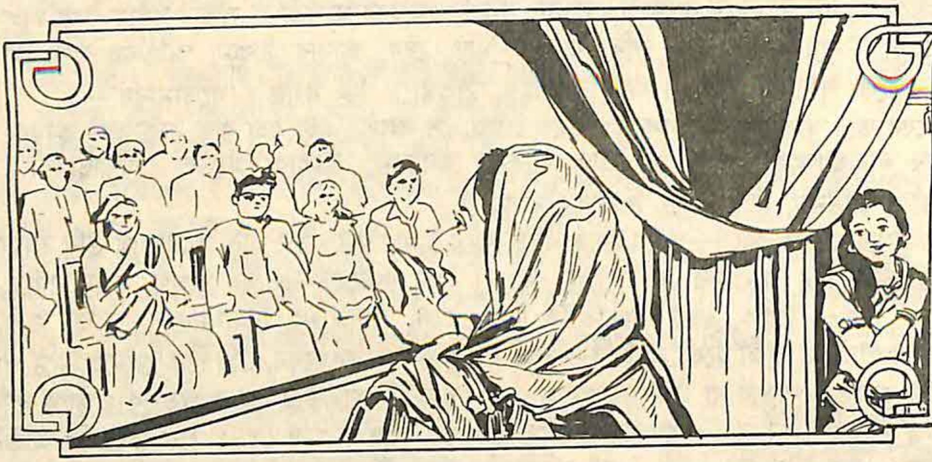
'পুলিশ অফিসার' রঞ্জনাই প্রথমে লক্ষ্য করল যে স্টেজের পোশাক আর 'মেক-আপ'-সহ সেই বৃদ্ধা, বুড়ো মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক দ্রুত লম্বা পা ফেলে বারান্দা দিয়ে চলেছে ফটকের দিকে দৌড়ে গিয়ে সে তাকে 'গ্রেপ্তার' করে ফেলল, বলল, 'আমরা আপনার অভিনয় দেখে—এ কি ! তুমি মালতী !'

পাকা পরচুলার তলা দিয়ে মালতীর কালো চুলের গোছা বেরিয়ে পড়েছে—আর লুকোবার উপায় নেই।

'চুপ ! চুপ !! কাউকে বলো না—লক্ষ্মীটি !'

আর চুপ চুপ ! রঞ্জনার চিৎকার শুনে অনেকেই ছুটে এল, মালতীকে টেনে গ্রীনরুমে ফিরিয়ে আনল। 'তুমি এত ভাল অভিনয় করতে পার, মালতী !'

'বুঝতেই পারিনি এতদিন—একেবারে ছাই চাপা আগুন !'



'পালাবে কোথায় ? আমরা তো এখন খাওয়া দাওয়া করব।'

'আজই সব অভিনয় শেষ হল, বিচারকরা ফলাফল জানাবেন, না শুনে যাব না।' বন্দনাদিও এসে অভিনন্দন জানালেন, 'এমন ভাল অভিনয় অনেকদিন দেখিনি মালতী।' আনন্দে মালতী কথা বলতে পারছিল না।

তখনও কিন্তু তার আনন্দের ষোলকলা পূর্ণ হয় নি। কিছুক্ষণ পরে বিচারকরা ফলাফল ঘোষণা করলেন। প্রথম 'শিল্ড' পেল 'কলিকাতা বিদ্যালয় !' দ্বিতীয় হল 'বালিকা শিক্ষা নিকেতন।' সবচেয়ে ভাল অভিনেত্রীর সম্মান, সোনার মেডেল কিন্তু শিক্ষা নিকেতনের ছাত্রী, পদ্মাপারের মেয়ে মালতী পেল।

আবার একচোট সানন্দ হাততালি ও অভিনন্দনের পালা !

বন্দনাদি এক ফাঁকে বললেন, 'তুমি নিজেই অভিনয় করতে চাও একথা সরল ভাবে বল নি কেন মালতী ?'

মালতীর মুখ লাল হয়ে উঠল, সে বলল, 'দিদি, বিশ্বাস করুন সত্যি সত্যি ঠামাই অভিনয় করবেন স্থির ছিল, ঠামা রাজিও ছিলেন। কিন্তু আজ হঠাৎ তাঁর এমন সাংঘাতিক মাথা ধরল যে বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারলেন না। পাছে অভিনয় পণ্ড হয়, কিছু না ভেবে চিন্তে, ঝোঁকের মাথায় ঠামার মেক-আপ নিয়ে চলে এসেছিলাম—'

'ভাগ্যিস এসেছিলে—তাই তো এমন চমৎকার অভিনয় দেখলাম, আর ভাগ্যিস তুমিই অভিনয় করলে তাই তো সোনার মেডেল পেলে।' 'সব কৃতিত্ব ঠামার দিদি—তিনিই আমায় সব শিখিয়েছেন'—

'তোমার ঠামার কাছে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ—একদিন দেখা করতে যাব'—

মেয়েরা কলরব করে উঠল, 'আজকেই যাব দিদি, এখনই যাব, বাসটা তো রয়েছে। এমন ঠামাকে দেখতেই হবে।'

মালতীর কোনো আপত্তি টিকলো না, অতবড় বাস নিয়ে তখনই সবাই তাদের গলির বাড়িতে হাজির।

মালতী ভয় পাচ্ছিল হয় তো তার ঠামা বেশি অসুস্থ থাকবেন, এত লোক দেখে হয় তো তিনি বিব্রত হয়ে কি করবেন ভেবে পাবেন না। কিন্তু মনে হল যেন ঠামা এর জন্য প্রস্তুতই ছিলেন। উঠোনের পাশে বারান্দায় মাদুর পেতে বসিয়ে সকলকে হাসি গল্প চন্দ্রপুলি আর নারকেল নাড়ু, দিয়ে পরিতৃপ্ত করলেন, ঠিক সেই গল্পের ঠাকুমার মত। মেয়েরা তো মুগ্ধ। 'আমরা আবার আসব ঠামা, চন্দ্রপুলি আর নাড়ু খাব, আপনার ছোটবেলার গল্প শুনব।'

'আসবে বৈকি, যখন খুশি যতবার খুশি আসবে।'

বন্দনাদি বললেন, 'আপনি এখন একটু সুস্থ হয়েছেন দেখে সুখী হলাম।' মালতীর মনে একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিল, সে বলল, 'তাহলে তোমার সত্যি সত্যি মাথা ব্যথা হয় নি ঠামা ?' বন্দনাদির দিকে চোখ টিপে ঠামা বললেন, 'হয়েছিল বৈকি দিদি, তোকে স্টেজে তুলবার জন্যই তো আমার যত মাথা ব্যথা !'

সবাই হেসে উঠল।

(বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

এক জাহাজওলার গল্প

সুভাষ মুখোপাধ্যায়



ইহুদীদের গির্জার কাছে রাস্তাটা যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে পাজামা-পরা রোগা একটা লোক ফুটপাথে বসে টিনের জাহাজ বেচে।

লোকটা চেঁচায় না। তার হয়ে টিনের জাহাজগুলোই বড় একটা জলের গামলায় ফটফট ফটফট আওয়াজ করে ঘুরে ঘুরে দূর থেকে খদ্দের ডেকে আনে।

ইস্কুল থেকে আসতে যেতে দুলু রোজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।ভিড় হয় খুব। ভিড় হবারই কথা। এ তো

আর তোমার ছেলে ভুলোনো খেল্‌নার জাহাজ নয় ! ছোট হলে কি হয়, হোক না টিনের তৈরি, সত্যিকারের জাহাজ এ। সত্যিকারের জাহাজের মতোই চলে।

জলের গামলাকে সমুদ্দুর মনে করে নিলেই হয় !

দুলুর খুব ইচ্ছে করে অমনি একটা টিনের জাহাজ কিনতে। ছোট ভাইটার বড্ড অসুখ। সারাক্ষণ কাশে। বাবা-মার মন খারাপ। নইলে নির্ঘাৎ সে বলত।

কিম্বা কাজল, দীপক, শম্ভুর মতো সে যদি বাড়ি থেকে দুটো একটা করে জলখাবারের পয়সা পেত, তাহলে সেই পয়সা জমিয়ে নিশ্চয় সে টিনের একটা জাহাজ কিনতে পারত।

দুলু ভাবে, বাবা যদি রেলগাড়িতে মাথা ধরার ওষুধ না বেচে রাস্তায় বসে টিনের জাহাজ বেচত ! তাহলে সব দিক দিয়েই কেমন ভালো হ'ত। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাবার বুকে ব্যথা ধরত না, মাকেও রাত জেগে তেল মালিশ করতে হ'ত না। এ কামরা থেকে ও-কামরায় যেতে গিয়ে রেলগাড়ির চাকায় পা কাটার ভয় নেই। দিব্যি পায়ে পা তুলে বসে বসে কাজ। চেঁচাতে হবে না, কিচ্ছু না। টিনের জাহাজই ফটফট করে খদ্দের ডেকে আনবে। তাছাড়া, রেলগাড়ির লোকেরা যেন কেমন ! বাবার এমন যে ধন্বন্তরী ওষুধ, তা তারা বিশ্বাসই করতে চায় না। রাস্তায় কিন্তু সে মুশ্‌কিল নেই। রাস্তার লোকগুলো অনেক ভালো। তারা যে দেখতে পায় চোখের ওপর জলজ্যান্ত জাহাজ কথা বলে !

না কিনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে দুলুর ভারি লজ্জা করে। লোকটা যদি হঠাৎ কিছু বলে বসে। চোখাচোখি হলেই দুলু তাই তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে সরে পড়ে। আর হাত দুলিয়ে দুলিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবে : যখন সে বড়ো হবে, যখন তার অনেক টাকা হবে—তখন গোলদীঘির মতো প্রকাণ্ড একটা গামলা কিনে তাতে সে বড়ো বড়ো টিনের জাহাজ ভাসিয়ে দেবে। ঐ পাজামা পরা লোকটার মতোই সেও তার জাহাজগুলোর একটা করে নাম রাখবে। একটার নাম 'চমক', একটার নাম 'তলোয়ার', একটার নাম 'হিন্দুস্থান'। তারপর ? 'কাথিয়াবাড়', তারপর 'আকবর', তারপর 'হামলা', তারপর 'নর্মদা'। দেখে দেখে নামগুলো তার মুখস্থ হয়ে গেছে।

একদিন কিন্তু দুলু ধরা পড়ে গেল লোকটার কাছে।

ছুটির দিনেও লোকটা ও জায়গায় বসে কে জানত ! দুপুরে দুলু বেরিয়েছিল রাস্তায় যদি কোথাও ভালুক নাচ কিম্বা বাঁদর খেলা দেখতে পায়। নইলে পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর একবার দেখে আসবে খাঁচায় বন্দী চড়াই পাখি কেমন করে লোকের ভাগ্য বলে দেয়।

হঠাৎ গির্জার কাছে আসতেই ফটফট শব্দ। জাহাজ চলছে, জাহাজ ! দুলু এক ছুটে এসে পড়ে মোড়ের মাথায়। জলের গামলায় ভাসছে 'তলোয়ার'।

একটু পরেই তার খেয়াল হ'ল তার চারদিকে অন্য দিনের মতো লোকের ভিড় নেই। পাজামা-পরা লোকটার মুখোমুখি সে একা দাঁড়িয়ে আছে।

ভয় পেয়ে দুলু ছুটে পালাতে যাবে এমন সময় লোকটা পেছন থেকে ডাক দিল, 'খোকা শোনো।'

মুখ শুকিয়ে গেল দুলুর। কেন সে মরতে আজ এদিকে এল ? লোকটা আজ আর তাকে আস্ত রাখবে না। আর যদি কিছু নাও করে, চুরি করে জাহাজ দেখার জন্যে এমনিতেই তার লজ্জায় মাথা কাটা যাবে।



কিন্তু আশ্চর্য ! লোকটা ওসব কোনো কথাই তুলল না। কেরোসিন কাঠের একটা বাক্স এগিয়ে দিয়ে তাকে বসতে বলল। কলের পুতুলের মত দুলু গিয়ে তাতে বসল।

'কী নাম তোমার ?'

দুলু নাম বলল। না, যতোটা সে ভয় পেয়েছিল—ততোটা ভয় পাবার কিছু নেই।

আস্তে আস্তে দুলুর সঙ্গে লোকটার ভাব হয়ে গেল। কোন্ ক্লাসে সে পড়ে, বাড়িতে কে আছে সমস্তই সে বলল। 'বড়ো হয়ে কী করবে ?'

দুলু চুপ করে থাকে। ইচ্ছে হলেই কি করা যায় ? বাবার কাছে শুনেছে, বাবার নাকি ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হবার। আর দুলুর ইচ্ছে ? তার ইচ্ছে এরোপ্লেনের পাইলট হবার। মা, বাবা, আর ছোট ভাইকে নিয়ে সে তাহলে একেবারে মেঘের রাজ্যে উড়ে চলে যাবে। সে ইচ্ছের কথা কি সবার কাছে বলা যায় ?

'জাহাজ চালাতে ভালো লাগে না ?'

দুলুর চোখ চক্‌চক্ করে ওঠে। ভূগোলের বইটার কথা মনে পড়ে যায়। এদেশের ওপারে আরও করত

দেশ আছে। কত রকমের দেখতে মানুষ আছে। ভালো লাগে বৈকি ! উঁচু উঁচু ঢেউগুলো আছড়ে পড়বে দুপাশে !

জবাব না দিয়ে দুলু উল্টে প্রশ্ন করে, 'রাস্তায় বসে টিনের জাহাজ চালাতে ?'

'তা নয়। সত্যিকারের জাহাজ।'

দুলু বলে, 'তুমি কেন যাও না ?'

'এককালে গিয়েছি। এখন নেয় না।'

দুলু এবার অবাক হয়। 'সত্যি বলছ ? কেন নেয় না এখন ?'

'সেই গল্প বলব বলেই তো তোমায় ডাকলাম।'

তারপর একপাশে রাখা টিনের জাহাজগুলো এক জায়গায় পুঁটুলি করে বেঁধে লোকটা দুলুকে বলল, 'গামলার জাহাজটা হ'ল তোমার। বাড়ি যাবার সময় নিয়ে যাবে, বুঝলে ?'

আনন্দে দুলুর মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। তারপর লোকটা আর একটা পুঁটুলি খুলে দুলুর সামনে ধরল। তাতে মুড়ি আর মুড়কি। বলল, 'নাও। খেতে খেতে গল্প শোনো।'

লোকটা বলতে আরম্ভ করল :

ছেলেবেলায় আমার বাপ মা মারা গিয়েছিল। মানুষ হয়েছিলাম মামার কাছে। মামাদের অবস্থাও ভালো ছিল না। যখন দেখলাম কোথাও কাজ জুটছে না, পল্টনে গিয়ে নাম লেখালাম। তখন ইংরেজ-জার্মানে পুরোদমে লড়াই চলেছে। আমাকে দিল নৌবহরে। জাহাজের খোলের মধ্যে কাজ। প্রাণ হাতে করে ঘোরা। খাটিয়ে খাটিয়ে জান বার করে দিত।তবু ভালো লাগত কাজটা। সমুদ্রে কেমন যেন একটা নেশা আছে।

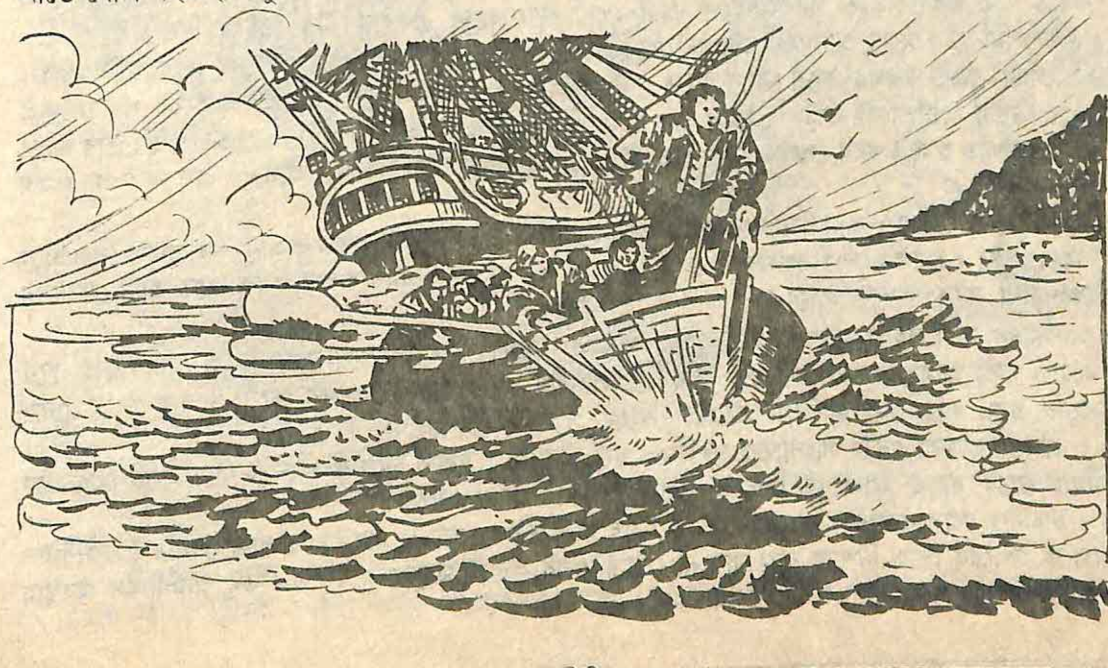
তারপর লড়াই ফতে হ'ল। ভাবলাম এবার মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

তখনও জলে জলে থাকলেও আমরা থাকি দেশের মাটি ছুঁয়ে। কখনও বোম্বাই, কখনও করাচীতে। মাঝে মাঝে খবর পাই, ইংরেজদের ওপর দেশের লোক ক্ষেপে আগুন হয়ে আছে। বন্দুকের গুলিতেও তাদের বাগ মানানো যাচ্ছে না।

সে আজ অনেকদিনের কথা। তুমি তখন এই এতটুকু।

তুবড়ি যেমন একটু একটু করে ফুলকি কাটতে কাটতে হুস করে জ্বলে ওঠে, দেশ জুড়ে তেমনি কাণ্ড হ'ল।

একদিন আমরা খবর পেলাম, বোম্বাইতে নৌবহরের একদল লোক বেঁকে বসেছে। 'তলোয়ার' জাহাজে কাজ বন্ধ। ক্রমে এ-জাহাজ থেকে ও-জাহাজ, এ-ব্যারাক থেকে ও-ব্যারাক আগুন ছড়িয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে গোটা শহর হাত মুঠো করে উঠে দাঁড়াল। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে আওয়াজ উঠল—ইংরেজ ভাগো।



করাচীতে খবরটা আমরা একদিন পরে পেলাম। বন্দরে আর কাছাকাছি একটা দ্বীপে তখন আমাদের 'হিন্দুস্থান' জাহাজ ছাড়াও ছিল 'চমক', 'হিমালয়', 'ত্রিবাঙ্কুর', 'বাহাদুর'। পরদিন সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়ার কথা। আমার হাত গুটিয়ে বসলাম। যাব না।

দুদিনের মধ্যে সমস্ত জাহাজে কাজ বন্ধ হয়ে গেল। বোম্বাইয়ে তখন বিদ্রোহীরা বন্দুক হাতে নিয়ে স্বাধীনতার লড়াই লড়ছে।

শুধু হাত গুটিয়ে বসে থাকা নয়, পরের দিন সকাল থেকে করাচী বন্দরেও শুরু হয়ে গেল লড়াই। ইংরেজ শাসনের যেখানে যতো চিহ্ন আছে, তার ওপর আমাদের রাগ ফেটে পড়ল। কুচকাওয়াজের মাঠে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে পুড়িয়ে দেওয়া হ'ল পরাধীনতার নিশান। জেল-হাজত ভেঙে নৌবাহিনীর বন্দী ভাইদের বার করে আনা হ'ল। 'হিমালয়' আর 'বাহাদুর' জাহাজ থেকে ছ'শো লোক মোটর বোটে আর নৌকোয় বেরিয়ে পড়লো জেটির দিকে। শহরে তারা মিছিল নিয়ে যাবে। একদল জেটিতে উঠতে পারলো, মিলিটারি পিছু নেওয়ায় আরেক দল পারল না। যারা পারল না তাদের একদল মিলিটারির হাত এড়িয়ে আমাদের জাহাজে এসে উঠল। 'হিন্দুস্থানে' আমরা হলাম ছ'শো লোক।

সকাল থেকে দু'বার মিলিটারি পাঠিয়েছে আমাদের জাহাজ দখল করে নেবে বলে। একবার বেলুচি, আরেকবার গুর্খা সৈন্যের ওপর হুকুম হয়েছে। কিন্তু ভাইয়ের গায়ে ভাই হাত তুলতে রাজি হয়নি।

উল্টে আমরাই বড়ো বড়ো সায়েবদের জাহাজ থেকে নামিয়ে দিলাম।

ক্যাপ্টেন রাগে গরগর করতে করতে নেমে যাচ্ছিল। হঠাৎ পেছন ফিরে আমাদের নিশানা করে সে রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গোরা পল্টনের দল জাহাজের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এল।

তাড়াতাড়ি আমরা জাহাজের গায়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে একটা নোটিশ লাগিয়ে দিলাম ; 'যদি বাঁচতে চাও, ওঠবার চেষ্টা করো না।' তখনকার মতো পিছিয়ে গেলেও গোরা পল্টনের দল ছোট একটা মেশিনগান টেনে এনে হঠাৎ আমাদের দিকে আগুনের গোলা ছুঁড়তে আরম্ভ করল।

আমরাও কামানের মুখেই তার জবাব দিলাম। গোরা পল্টনেরা দেখতে দেখতে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কয়েক মিনিট চুপচাপ। তারপর আবার কামান গর্জে উঠল। ডাঙ্গার ওপর বাড়ির ছাদে উঠে এবার তারা বালির বস্তার পেছনে আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

আগুনের গোলা লেগে আমাদের দুজন তক্ষুনি মারা গেল। তার মধ্যে একজন ছিল ষোলো বছরের কিশোর।

নিচের জেটির কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে বন্দরের হাজার হাজার মজুর। রাগে হাত তাদের নিস্‌পিস্ করছে। একেবারে হাত খালি নইলে তারা গোরা সায়েবদের একবার টের পাইয়ে দিত।

দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের জাহাজ থেকে চারটে আগুনের গোলা গোরা পল্টনের দিকে ছুটে গেল।

গোটা তল্লাট থরথর করে কেঁপে উঠল। বীরপুরুষ সায়েবদের সেদিনের মত লড়াইয়ের শখ মিটল।

রাত্তিরটা ঠাণ্ডাভাবেই কাটল। সমস্ত রাত আমাদের চোখে ঘুম ছিল না। পাছে ওরা চড়াও হয় তার জন্যে তৈরি থাকতে হ'ল। খবর পেলাম বোম্বাইয়ে নৌবিদ্রোহীরা বীরের মত লড়ছে। আমরাও জয় না হওয়া পর্যন্ত লড়ব।



এদিকে সাহেবরাও সারা রাত ধরে তোড়জোড় চালাল। যেখানে যতো বন্দুক কামান গোলাবারুদ পেল এনে জড়ো করল। মোক্ষম জায়গাগুলো বেছে নিয়ে তারা ঘাঁটি গাড়ল। এমন ব্যবস্থা করল যাতে তারা আমাদের কোণঠাসা করে মারতে পারে।

পরদিন সকালেই আমাদের কাছে চরম-পত্র এল—হয় বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করো, নয় লড়াই করে মরো। যারা আমাদের দেশকে দুশো বছর ধরে পরাধীন করে রেখেছে, তাদের পায়ের তলায় পড়ার চেয়ে লড়াই করে মরা ঢের ভালো। আমরা শেষের পথই বেছে নিলাম।

এদিকে আমরা একটা সাংঘাতিক মুশ্‌কিলে পড়ে গেলাম। ভাঁটার টানে জল নেমে যাচ্ছে আর সেই সঙ্গে নিচে নেমে যাচ্ছে আমাদের জাহাজ। ওরা ওপরে আমরা নিচেয়।

চারদিক থেকে ওদের কামান আর বন্দুক হঠাৎ গর্জে উঠল। আমরা মহা ধাঁধায় পড়ে গেলাম। এসে নিচে থেকে ওপরের দিকে নিশানা করা যায় না। তার ওপর কাছেই মজুরদের বসতি। তবু আমরা সে অবস্থায় যতোটা পারা যায় তার জবাব দিলাম।

পঁচিশ মিনিটের বেশি লড়াই চালানো গেল না। আমাদের মধ্যে খুন হ'ল ছ'জন, জখম হ'ল তিরিশজন।

আমাদের মধ্যে একজন অল্পবয়সী ছেলে গোলাগুলি কেয়ার না করে সাদা নিশান হাতে নিয়ে সাহসের সঙ্গে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সাদা নিশান দেখে এক মুহূর্তের জন্যে ওদের কামান চুপ করল। তক্ষুনি হুকুম হ'ল—ফায়ার! কামানের গোলায় ছেলেটি সেখানে লুটিয়ে পড়ল।

আমাদের বীরত্বের আর ওদের কাপুরুষতার লড়াই শেষ হ'ল। সেদিন হারলেও স্বাধীনতার লড়াইতে আমাদেরই জয় হ'ল। ইংরেজকে ছাড়তেই হ'ল এদেশ।

লোকটার যখন বলা শেষ হ'ল বেলা তখন গড়িয়ে গেছে। দুলুর হাতে 'তলোয়ার' জাহাজটা তুলে দিয়ে দুটো প্রকাণ্ড লম্বা লাঠি বগলের নিচে লাগিয়ে এক ঝটকায় লোকটা উঠে দাঁড়াল। দুলু দেখল একপাটি জুতো



পরে নিল। তারপর একহাতে পুঁটলিটা তুলে নিয়ে বলল, 'চল যাওয়া যাক।'

'তোমার আরেক পাটি জুতো?'

'লাগবে না।' বলে লোকটা পাজামার একটা পা তুলল। দুলু চমকে উঠে দেখল হাঁটুর কাছ থেকে তার একটা পা কাটা।

দুলু জিজ্ঞেস করল, 'পা-টা গেল কোথায় তোমার?'

'ওই পা-টা দিয়েই সেদিন আমি ইংরেজদের লাথি মেরেছিলাম।'

হারিয়ে পেলে

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পিকলু ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে চারদিকের কথার ঠেলায় থমকে দাঁড়াল। বাড়িতে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলার সময় বেজায় হল্লা হয় বটে, তবে ঠিক এতটা এবং এ-ধরনের নয়। জ্যাঠাইমারা, দিদিরা, দাদারা, কাকারা, জ্যাঠামণিরা, সবাই সমস্বরে একটা কোনও বিষয় নিয়ে নিজের-নিজের কথা বলে চলেছেন। কিন্তু যেহেতু বড় জ্যাঠাইমা গলার স্বর সপ্তমে তুলে অনেকক্ষণ ঠায় রাখতে পারেন, ওঁর কথাটাই কানে এল, "কুকুর নয়, বেড়াল নয়, ছাগল নয়, মুরগি নয়, একটা আস্ত জ্যান্ত মানুষের বাচ্চা! উঃ, এর দায়িত্ব কত! ছোটবাবু তো বিয়ে করেননি, গান গেয়ে বেড়ান, ওঁর আর কী! ঠেলা সামলাব তো আমরা।"

পিকলুর ছোটকাই একমাত্র মুখে একটা কাষ্ঠ-হাসি মাখিয়ে চুপচাপ বসে। ঠিক সেই মুহূর্তে পিকলুর কবি-দাদা অতনু ঢুকেই অবস্থাটা আঁচ করে নিলেন। উনি বড়মা'র ছেলে। গলা সপ্তমে চড়ানোর অভ্যেস ওঁরও আছে। ভীষণ উঁচু গলায় হাঁকলেন, "চুপ, চুপ, চুপ, চুপ, চুপ"! তারপর যে মানুষের ছানাটিকে ঘিরে এত বাক্যচ্ছটা, তার সামনে হাঁটুগেড়ে বসে বললেন, "বা, বা, বা! এ যে একটি খুদে রাজপুত্তুর! কোথা থেকে এলে তুমি বাপধন?"

পিকলু ততক্ষণে কথার তোড়ের ভেতর থেকে বাচ্চাটির পরিচয় বার করে নিয়েছিল।



তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ছোট্‌কা এনেছে, কালীমন্দির থেকে। ও থাকবে।"

"গুড" বলে দাদা হোহো করে একচোট হেসে নিয়ে বললেন, "ভারতীয় ঐতিহ্যমতে আমাদের এই একান্নবর্তী পরিবারটিকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া উচিত। আজ, এই মুহূর্তে, এই খুদে রাজপুত্তুরটিকে আঙুলে গুণে যোগ করে নিলে পরিবারের জনসংখ্যা দাঁড়ায়, হুঁ, একুশজন। তাহলে মডার্ন প্রথামতো একুশজনকে তিন ভাগে ভাগ করলে এক একটা ইউনিটে সাতজন করে পড়ে। লাগাও ভাগ।"

মেজোমা উঠে এসে বাচ্চাটার কাছে এলেন, "তোমরা ভাগ-টাগ করো। আমি ততক্ষণ এর খাবার ব্যবস্থা করি।"

ছোট্‌কার এতক্ষণে মুখ ফুটল, "অপূর্ব মেজো-বউমা। আমি আর এই খোকা তোমার ইউনিটে।"

"আমিও!" পিকলু বলে উঠল।

"আমি তো প্রস্তাবক হিসেবে দাবি করতেই পারি যে, মেজমা'র ইউনিটের সভাকবি হিসেবে আমি আছি," দাদা বললেন।

মেজোমা বাচ্চাটার গালে-মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী বাবু?"

"বাবুই!"

"ও বাবা, তুমি একটা বাবুইপাখি? আহা, কী ফুটফুটে ফরসা ছেলে! মা-বাবাই বা কোথায়! বছর তিনেকের হবে মনে হয়। বলো কী খাবে?"

মেজোমা'র কোলে জুত করে বসে বাবুই বলল, "দুধ।"

"আর কিছু নয়?"

"না।"

"আহা রে, বোধহয় কতদিন দুধ খায়নি। খুদে রাজপুত্তুরের মতো কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটা! কিন্তু কী ময়লা জামাকাপড়।"

দুধ পেয়েই এমন চোঁ চোঁ করে খেয়ে ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল যে, সকলেরই নানাভাবে মন উতলা হল। বড়জ্যাঠামণি গম্ভীর মুখে বললেন, "থাকে থাক। কিন্তু সব খবর নিয়ে তবে। শেষে পুলিশ-কেসে পড়তে চাই না। ছোটবাবুর তো সেসব ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই।"

শুনে ছোটবাবু অর্থাৎ পিকলুর ছোটকার এতক্ষণে যেন জ্ঞান হল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, "ঠিক বলেছ বড়দা, ইনভেসটিগেশান হওয়া দরকার। মেজো-বউমা, দ্যাখো তো শুরু করে। বাবুই কী বলে দ্যাখো।"

মেজোমা একটু হেসে চুপ করে রইলেন। মেজ্‌-জ্যাঠামণিই শুরু করলেন, "বাবুই, তোমার মা-বাবা আছেন?"

"হুঁ।"

"কোথায়?"

"মন্দিরে।"

"মন্দিরে কী করেন?"

বাবুই বেশ খানিকটা অবাক হয়ে রইল। তারপর বলল, "খিচুড়ি কায়। আমিও কাই।"

"বাবা-মা এখন কোথায়?"



আকাশটা জানলা দিয়ে দেখে নিয়ে বাবুই বলল, "এখন কোথাও নেই।"

মেজ্‌-জ্যাঠামণি হাল ছেড়ে দিয়ে ছোটকাকে বললেন, "তুমি ওকে নিয়ে কালীঘাট যাও। যেখান থেকে পেয়েছ, শুরু করো সেখান থেকে। তারপর...তারপর দেখা যাবে।"

ব্যস্‌, সভা ভঙ্গ করে যে-যার কাজে চলে গেলেন। কবিদাদা অতনু যাবার সময় বাবুইয়ের গাল টিপে দিয়ে বললেন, "দেখো বাবা, আবার খিচুড়ির লোভে যেন মন্দিরে থেকে যেও না। ফিরে এসো বাবুইপাখি! এখানে নরক গুলজার করে থাকা যাবে।"

ছোট্‌কা বাবুইয়ের ছোট্ট হাতখানি ধরে গেলেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। ইতিমধ্যে বড়মা কোত্থেকে দাদাদের ছোটবেলার তুলে-রাখা জামা-প্যান্ট দিয়ে ওকে সাজিয়ে দিয়েছেন। ছোড়দি চান করিয়ে দিয়েছে। মেজোমা চুলটুল আঁচড়ে, একপোঁচ পাউডারও বুলিয়ে দিয়েছেন। পিকলুই এ-বাড়ির সবচাইতে ছোট ছেলে।

সেও তো ক্লাস সিক্সে উঠল। তাই বাবুইকে পেয়ে সকলেই মহাখুশি।

মন্দিরঅঞ্চলে পৌঁছেই সে-এক মহা বিপত্তি। ছেলেবুড়ো বেশকিছু জড়ো হয়ে গেল। এখানেও একনাগাড়ে হল্লা শুরু হল বটে। কিন্তু সে অন্যরকম।

একটি অল্পবয়সী ছেলে বলল, "তখনই ওর বাবাকে বললুম এক ভদ্দরলোকের হাত ধরে গেছে, ফিরল বলে। ছেলেধরা নয়, কিচ্ছু নয়, চেহারা দেখেই বোঝা যায়। আয় চলে আয় বাবুই। কুকুরটা তোর জন্যে হেদিয়ে মরছে।"

ককুরটা বলতে নজরে পড়ল একটা লিঙ্‌লিঙে নেড়ি কুকুরের ছা বাবুইকে পেড়ে ফেলে গালগলা চেটে দিচ্ছে। আর বাবুই চোখ-মুখ কুঁচকে খুশির আওয়াজ তুলে বলছে, "পেলে, বল্ কেল্‌বি ? এই বাই, বল্ কেলবি ?"

পেলে !

ছোট্‌কার অবাক-দৃষ্টির উত্তরে প্রথম ছেলেটি বলে উঠল, "বুঝলেন না জ্যাঠামশাই, খুব ভাল ফুটবল খেলে তো কুকুরটা। মাসতিনেক বয়স, কিন্তু যেদিকের হয়ে ও ছুটবে, সে দিক জিতবেই। তাই আমিই নাম দিয়েছি পেলে।"

তারপরে একটু সলজ্জভাবে বলল, "ওই ওই ফিরিওয়ালার কাছ থেকে একটা ছোট বল কিনে দেবেন স্যার ?" আপনাকে একটা প্রদর্শনী-ম্যাচ্ দিই।"

প্রদর্শনী ম্যাচ্ ! ভাবা যায় না ! ছোটকা তক্ষুনি বল কিনে দিলেন এবং কিছু বোঝার আগেই ঝাঁ ঝাঁ করে দল ভাগ হয়ে গেল, ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় জন-পনেরো। এলেবেলে বাবুই আর পেলে অনেকটা 'লাকি স্টার' হয়ে এর বগলের তলা দিয়ে তার পায়ের ফাঁক দিয়ে খেলে বেড়াতে লাগল। ধর্মশালা রমরম করছে। ছোটকা না চাইতেই হলেন রেফারি। অনবরত ফাউল হচ্ছে কিন্তু ধরছেন না। বেশ বড় গোছের দর্শক জমে গেল। যারা ধর্মশালার থাম ঘেঁষে বাসা বেঁধে থাকে একটা বিছানা পেতে নিয়ে, তারা উঠে বসে এক-একটা দলের সমর্থক হয়ে গেল। টিমের নাম ? সেও খেলতে-খেলতেই ঘোষণা করা হল, 'কালীমন্দির একাদশ বনাম আদিগঙ্গা একাদশ।'

দু'দিকের গোলপোস্টই ছেঁড়া চটি, জুতো আর ভাঙা ইঁট দিয়ে তৈরি হয়েছিল। সব দর্শক এবং ছোটকার মতানুসারে দু'পক্ষই চারটে করে গোল দিয়েছে। এবার যারা গোল দেবে তারাই জিতবে। গোল দেবার জন্যে দু'পক্ষই পাগল। হঠাৎ কী আশ্চর্য ভেল্‌কি, বল চলে গেল পেলের মুখে এবং সে সেটাকে মোক্ষম জোরে কামড়ে ধরে দিল ভোঁ দৌড়। ব্যস্, ম্যাচের দফা গয়া, আদিগঙ্গা একাদশ (যদিও সংখ্যায় আট থেকে এখন বারোয় দাঁড়িয়েছিল) পাগলের মতো পেলের পেছনে ধাওয়া করে ছুটে গেল। কালীমন্দির একাদশ (ন'জন থেকে এখন তেরোজন) বসে পড়ে হাঁফাতে লাগল। সমর্থকদের মধ্যে মারামারি লাগে আর কি !

এমন সময় খুব মিহি ভরাট গলায় স্বর শুনলেন ছোট্‌কা, "আপনিই ওকে নিয়ে গিয়েছিলেন ? বেশ করেছিলেন। আমি অবশ্য থানায় একটা ডাইরি করেছি। তা বড়বাবু বললেন, আপনারা জানিয়েছেন আপনাদের ওখানে ছিল। না, না, আমি একদম থানায় যেতে চাইনি। তা সবাই বলল, ছেলেধরা হতে পারে। তাই গেলাম। (হেসে উঠে)ছেলেধরা নেবে কেন ? কত দায়িত্ব এসব ছেলেপুলেদের। আজকাল কেউ কোনও দায়িত্ব নেবে না।"



ছোটকা দেখলেন কে ভদ্রলোক কখন ওঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। রোগা, লম্বা, ফরসা। থেমে-থেমে একটা সুর ধরে কথা বলছেন, "বুঝলেন বাবুইয়ের বাবা হওয়াই সম্ভব। কেননা, বাবুই ওঁর কোলে উঠে পড়েছে। এবং কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।"

বললেন, "আপনাদের কাছে যদি রাখেন তা হলে নিশ্চিন্ত হই আমার কপালের দোষে সব গেছে। নয়তো দাসদাসী, আত্মীয়স্বজনে ভরা সেই বিশাল প্রাসাদ ছেড়ে আমি ধর্মশালায় আসব কেন ? ওর মা মরে বেঁচেছে। দিদি দুটো আছে তাদের পিসির কাছে।"

ধর্মশালায় পূব দিকের এক বাসিন্দা, মাঝবয়সী মহিলা, উঠে এসে ইংরেজিতে বললেন, "ভেরি স্যাড কেস্ ! মোহিনীবাবু ইজ্ এ ট্র্যাজিক হিরো "

এই পরিবেশ, ময়লা কাপড় পরা এক মহিলার মুখে এতটা ঝকঝকে ইংরেজি শুনে ছোট্‌কা চোখ বড়-বড় করে চেয়ে রইলেন। বাবুইয়ের বাবা, মোহিনীবাবু, একটু গলা নামিয়ে ইংরেজিতে বললেন, "সি ইজ্ এ ম্যাড

উয়োম্যান বাট্ হাইলি এডুকেটেড্।"

ইতিমধ্যে পেলেকে খুঁজে না পেয়ে দলবল ফেরত এসেছে। যেই জিতুক (বা জিতবে বলে ভেবে থাকুক) একটা বিজয়োৎসব করার ঝোঁক দেখা গেল। ছোটকাই প্রধান অতিথি এবং কোষাধ্যক্ষ। তেলেভাজা আর ভাঁড়ে চা। হায় গ্র্যাণ্ড হোটেলের টি-রুম! ছোটকা তারিয়ে-তারিয়ে পরিবেশটা উপভোগ করতে লাগলেন। সভার শেষে মোহিনীবাবু নরম বিনয়ী গলায় বললেন, "তাহলে আপনি ওকে আজই নিয়ে যান। আমি খুশি মনে ওকে আপনার হাতে সঁপে দিতে চাই। আমি চলে যাব আসানসোলে। সেখানে বোনের বাড়িতে কটাদিন জিরিয়ে ভবঘুরে হয়ে যাব।"

"রোজগার?" ছোটকা প্রশ্ন করলেন।

"সে হয়ে যাবে। গায়ে জোর নেই বটে, তবে গলাটা পারিবারিক। এখনও পথেঘাটে গাইলে দর দেয় লোকে। না খেয়ে মরব না।"

"মেয়েরা?"

"ওই তো···ওই জন্যেই তো আসানসোল যাওয়া। মেয়েদের সঙ্গে কয়েকটা দিন থেকে চলে যাব। ওই মেয়ে দুটোকে নিয়ে ভাবনা। বড় হচ্ছে···" এই পর্যন্ত বলে মোহিনীবাবু দু' ফোঁটা চোখের জল মুছে, শার্টের পকেট থেকে দুটো পুরুষ্টু বালা বার করে বললেন, "বাবুই নে, মন্দিরের দোকানদার দিয়েছে।"

মিনিট কয়েক মনখারাপ করে বসে রইলেন। ময়লা প্যান্ট-শার্টে ঢাকা এক নিপাট ভদ্রলোক।

ছোটকা কেমন একটু হয়ে গিয়ে বললেন, "একটা গান শোনা যাক তা হলে। আমারও একটু গানটান আসে।"

মোহিনীবাবু গান ধরলেন, "দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।"

'বাতাস বহে মরি মরি···'তে পৌঁছতেই ছোট্কা আর থাকতে পারলেন না, যোগ দিলেন।

ধর্মশালার ময়লা দুর্গন্ধ আবহাওয়া, দুই আধ-পাগলা ভবঘুরে গায়কের ভরাট দরদি গলার গুণে একদম অন্যরকম হয়ে গেল।

ফিরতি-পথে ছোট্কার গোড়ালিতে কী একটা নরম মতো লাগতে উনি চেয়ে দেখলেন, পেলে, মুখে ছেঁড়া ক্যামবিসের বলটার সামান্য একটা অংশ নিয়ে ওঁর পায়-পায় এগিয়ে চলেছে।

"এই রে, এটা আবার সঙ্গে চলল যে!" ছোটকা চমকে বলে উঠতেই বাবুই তো আহ্লাদে আটখানা, "পেলে, পেলে! আয় বাই লে, বল কেলবি?"

রাসবিহারীর মোড়ে এমন প্রস্তাব ছোটকাকেও ভয় পাইয়ে দেয়। উনি টুপ করে বাবুইকে কোলে নিয়ে, এ-গাড়ি সে-গাড়ির ফাঁক দিয়ে, স্তূপাকার আবর্জনা ডিঙিয়ে একেবারে অন্য অঞ্চল ধরলেন। কিন্তু ফুটবল মুখে, ছোট্ট ল্যাজটি নাড়তে নাড়তে পেলে ছুটে চলল ওদের ধাওয়া করে। ছোটকা যখনই ফিরে তাকান তখনই দ্যাখেন, দুটো কান নাচাতে-নাচাতে কুকুরছানাটা অনায়াসে ওঁর গোড়ালি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছে। আর বাবুই? আধো-আধো ঘুম-চোখে ছোটকার কাঁধে মাথা রেখে মুগ্ধ হয়ে পেলের কাণ্ড দেখছে আর মনে-মনে কেবলই 'এই বাই পেলে' বলে তাকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে।



আর মোহিনীবাবু? তিনি ততক্ষণ তাঁর ছেঁড়া সাইডব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে পাড়ি জমিয়েছেন অজানার পথে।

একমাস কেটে গেল দেখতে দেখতে। চারমাস পূর্ণ হবার সঙ্গে-সঙ্গে পেলের বাদামি মুখে সাদা ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি দেখা দিল। সকলে তো তাজ্জব! পিকলুর মেজদার কুকুর সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান। তাকে ডাকা হল। পেলেকে ঘিরে বাড়ির ছেলেরা এক রবিবার কনফারেন্স বসাল। থাকবেই যখন, তখন জেনে নেওয়া ভাল। কেননা, বাবুই সম্পর্কে আর কারও কোনও দ্বিধা নেই। ও তো পরিবারের একুশ নম্বর মেম্বার হয়েই গেছে। মেজমা'র ছেলেটি বেঁচে থাকলে সে হত কুড়ি নম্বর। কিন্তু সে ঠিক বাবুইয়ের মতো বয়সেই মারা যায়। তাই তার কিছুদিনের মধ্যে পিকলু জন্মাতে সে হয়ে যায় কুড়ি নম্বর। আর পিকলু কুড়ি নম্বর হতে না হতেই তার মা, মানে যিনি এ সংসারের সেজোমা ছিলেন তিনিও ওদের চিরদিনের মতো ছেড়ে চলে গেলেন। পিকলু তার ঠাকুমা অর মেজোমার ভাগে মানুষ হতে লাগল। মেজোমার মেয়ে রাঙাদি, যদিও পিকলুর চাইতে পাঁচ বছরের বড়, তবু সে বেশ একটু হিংসে করতে লাগল পিক্লুকে। পিক্লু এসবের মধ্যে মাথা না গলিয়েই চলে গেল



ছোটকার হেফাজতে। কেননা, সেখানে ওর ছিল একচেটিয়া রাজত্ব। কোলা ব্যাঙ পোষা থেকে সাপ পর্যন্ত সব চলে যায় ছোটকার চিলেকোঠার ঘরে।

কবি-দাদা অতনু বলল, "ভাল করে দ্যাখ্ মানু। হঠাৎ একটা ভয়ানক পেডেগ্রি বেরিয়ে পড়বে না তো?"

পিকলুর মেজদা মানু প্রথমে পেলেকে ঘুরিয়ে-ঘারিয়ে দাড়ি টেনে-টেনে পরখ করে (পেলের ভয়ানক আপত্তি সত্ত্বেও) দেখে, নিজের দাড়িতে আঙুল ঘষতে ঘষতে বলল, "হুঁ মনে হচ্ছে ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষে কিছু এদিক-ওদিক আছে। হয় পোলাইগার হাউন্ডের সঙ্গে এয়্যারডেলের সংমিশ্রণ নতুবা ফক্স টেরিয়ারের সঙ্গে পারেয়ার।"

বলে এক পেল্লায় কুকুরের অ্যালবাম বার করে কুকুরদের আদি, সেই নেকড়ে বাঘের বাচ্চা থেকে শুরু করে, তার মানুষের সবচাইতে নিকটাত্মীয় হবার ইতিহাস, নোট ছাড়াই ঝাঁ ঝাঁ করে বলে গেল। ফলে পেলের দাড়ির ব্যাপারটা আরও ভীষণ পাঁচালো হয়ে দাঁড়াল।

মুশকিল আসান করলেন ছোটকা। ধাঁ করে একটা ওস্তাদি গান ধরে দিলেন এবং যেই টেবিলের ওপর তবলার লহরা তুললেন, 'তা ধিন্ ধিন্ তা, না তিন তিন তা করে, অমনি পেলে শুয়োরের মতো মুখ ছুঁচলো করে গলা আকাশের দিকে তুলে বিকট গলায় 'উ আ উ আ' আওয়াজ তুলে বাড়ি মাথায় করল। ব্যস্, সঙ্গে-সঙ্গে পেডেগ্রির ওপর সভা হ-য-ব-র-ল'র আকার ধারণ করল। কেননা, পিক্‌লু আর বাবুই ঠিক সেই মুহূর্তে ছুটে ঘরে ঢুকতে গিয়ে পেলের ঘাড়ে পড়ে যাওয়ায়, ভয়ানক আধুনিক এক অরকেস্ট্রার মতো নানাবিধ শব্দ আর আওয়াজ উঠল চারধার থেকে।



ইতিমধ্যে আর-এক বিপদ দেখা দিয়েছে বাবুইকে নিয়ে। তার সকাল-বিকেল, আত্মীয়স্বজন, এসব সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে সকাল মনে করে বলে, 'বারাশ্ দেবে পিকলুদাদা, দাঁত মাজব।' রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ফুটবল খেলতে শুরু করে। 'এই বাই বল কেলবি,' বলে ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণ, ভীষণ জোরে ছুটে-ছুটে হয়রান হয়। একদিন তো মশারি-টশারিসুদ্ধু ছোটকার ঘাড়ে পড়ে এক মহামারি কাণ্ড। ছোটকার ঘুম খুব গভীর হয়। তার ওপর ওর স্বপ্নগুলো সিরিয়াল চলে। সেদিন স্বপ্নে একটা ডিটেকটিভ সিরিয়াল চলছিল। ঠিক সেই সময় পেলে আর বাবুই বলটল সুদ্ধু পড়ল মশারি জড়িয়ে ছোটকার পেটের ওপর। "বাপ রে বাপ," বলে লাফিয়ে উঠে ছোটকা ভীষণ

যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। আসলে ঠিক তখনই তো ওর স্বপ্নের ভিলেন ওর দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ছিল কিনা। তারপর যা হল ভাবা যায় না! কুকুরের ডাক, বাবুইয়ের চিৎকার করে কান্না, ছোটকার হুঙ্কার পিকলুর হঠাৎ "জ্যাঠামণি, বড়দা, শিগগির এসো। রবারি, ব্যাঙ্ক-রবারি হচ্ছে," বলে উঁচু গলা চেঁচানি! একতলা, দোতলা থেকে পড়িমড়ি করে সবাই ছুটে এলেন।

আলো জ্বলামাত্র সবাই ব্যাপারটা আঁচ করে হাসবে কিনা ভাবছে, গেল লোডশেডিং হয়ে। ভোর হয়ে আসার লক্ষণ হিসেবে, কলকাতার বিখ্যাত কাকেদের একজন 'কা-কা' করে ডেকে উঠতেই সবাই নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু মোমবাতি জ্বেলে আবিষ্কৃত হল বাবুই আর পেলে দৃশ্যে নেই। 'সে কী কথা, গেল কোথায়!' বলে মেজোমা ভয়ানক কান্না-কান্না মুখে ছুটে নীচে নেমে গেলেন খুঁজতে। দিদির দল, দাদার দল, জ্যাঠারা, বাড়ির কাজের লোকেরা, এমনকি মোক্ষদাদিদি পর্যন্ত হ্যারিকেন জ্বেলে রান্নাঘরের আনাচ-কানাচ দেখে এল। উপে গেল নাকি বাচ্চা দুটো!

রাত ভোর হতে ছাদটাদগুলো দেখা হল। নীচের দরজা সব বন্ধ, কাজেই তাদের তো বাইরে যাবার উপায় নেই। যাবে কোথায়?

ছোটকা হঠাৎ বললেন, "একটা উ উ আওয়াজ পাচ্ছি, কান পেতে শোনো তো।"

অতনু আর মানু কান পেতে শুনে শব্দের দিক ঠিক করতে করতে পৌঁছল জলের ট্যাঙ্কের সামনে। তারপর দুজনেই একসঙ্গে নিচু হয়ে দেখে, হাত বাড়াল ট্যাঙ্কের তলায়। কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে ঘুমিয়ে থাকা দুটো বাচ্চাকে টেনে বার করার সময় ওদের কোল থেকে গড়িয়ে এল বলটাও। এমন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে যে, চোখও চাইল না একবার।

মেজোমার ঘরে ওদের সবাই ভাবছে বাবুইকে নিয়ে কী করা যাবে? এরকম সময়জ্ঞান নিয়ে ও বাড়বে কী করে?

বড় জ্যাঠাইমা বললেন, "দণ্ডবৎ হই বাবা এই পরিবারের খুরেখুরে! আর পেন্নাম হই গো তোমায় মেজোবউ! কুকুরছানাটাকেও বিছানায় তুলেছ, বুঝবে, বুঝবে!"

ওঁর কথার পিঠে যেন সায় দিতেই পেলে লাফিয়ে উঠল এবং একলাফে কোলে চড়ে বড়জ্যাঠাইমার থুতনিটা বেশ ভালমতো চেটে দিয়ে দাড়িটা ঘষে দিল গালে।

ভীষণ রাগতে গিয়ে বড়জ্যাঠাইমা ফ্যাচ করে হেসে ফেললেন। আর বাবুই চোখ চেয়ে মেজোমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "দুধ?"

তারপর একজনের ঢকঢক করে এবং একজনের চকচক করে দুধ খাওয়ার আওয়াজ উঠতেই মোক্ষদাদিদি "আদিখ্যেতা ছেড়ে সব চা জলখাবার খেতে এসো তো," বলে ঘরে ঢুকল।

জলখাবার-ঘরে বসল পেল্লায় মজলিশ। কেবল পিকলুর বাবা আর মা ছাড়া সব নম্বরগুলোই, 'প্রেজেন্ট প্লিজ' বলতে পেরেছিল। আর পারেনি পেলে। অবশ্য বয়স অনুপাতে ওর দাড়ি গজানোর বহরের জন্যে ওকে ছোটকা, পিকলু এবং বাবুইয়ের নম্বর থেকে দশমিক ভাগ করে নম্বর দেওয়া হয়েছিল। কুকুর বলে নয় কিন্তু মাতৃভাষা শিখতে পারেনি বলে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে ও পড়েছিল মেজোমা'র ইউনিট নম্বর দুই'তে।

নাম ডাকা যখন প্রায় শেষ, দুম করে দরজা খুলে ঢুকলেন পিকলুর বাবা।

"এ কী! হাউসফুল! এত সকালে। ব্যাপার কী? কী আনন্দ, কী আনন্দ! আয় পিকলু।"



উনি এরকমই হুট্‌হুট্ করে চলে আসেন বিদেশ থেকে। সাংবাদিক মানুষ। পিকলুর টানটাই বেশি। তারপর বড়দের প্রণাম-ট্রনাম সেরে বললেন, "এঁরা আবার কারা?"

পিকলু আনন্দে সব ক'টা দাঁত বার করে বলল, "ছোটকার আবিষ্কার। ফ্যামিলির ২১ নম্বর মেম্বর—হল বাবুই। পেলে ফাউ দশমিকে ভাগ করা মেজোমার ইউনিট নম্বর দুই'তে আছে।"

পিকলুর বাবা হেসে উঠে পেলের দাড়ি টেনে দিয়ে মুখটা বাবুইয়ের কাছে এনে চুল ঘেঁটে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে?"

বাবুই অবাক হয়ে চেয়ে বলল, "তুমি কে?"

পিক্‌লুর বাবা হেসে বললেন, "পিক্‌লুর বাবা।"

পিকলুদাদার বাবা নেই।"

"সে কী!"

আমার বাবা নেই যে।"

"তা ধরো না, আমি তোমার বাবা।"

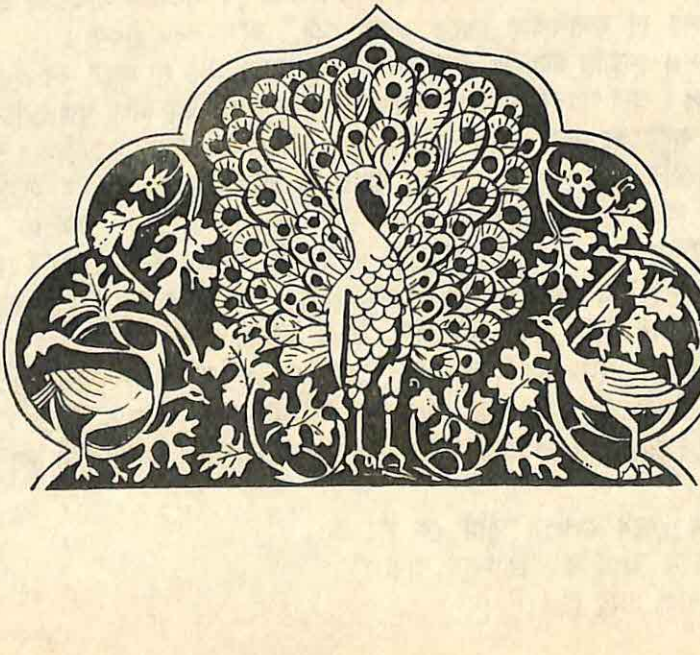
"বাজে কতা। আমার বাবা ছিল। একন নেই আমার চোটকা আছে, পিকলুদাদা আছে, মেজোমা আচে, অনেক অনেক আচে।"

বলতে বলতে ও ঢুলতে লাগল।

যাক বাবা। সময়জ্ঞান না হয় না হল, অসময়ে ঘুমোয় ঘুমো, কিন্তু সম্পর্কগুলো বুঝছে।

ছোটকা 'হুররে' বলে উঠে পিকলুর বাবার হাত দুটো ধরে বললেন, "সেজদা, তুমিই বলো, জাতীয় ঐক্যটৈক্যের লেকচার এর কাছে লাগে?"

"একদম না। এ একেবারে সাগর-ছ্যাঁচা ব্যাপার ভারতবর্ষ ছাড়া কোথাও পাবে না," বলে সেজদা হেসে তাকিয়ে দেখলেন বাবুই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে, পেলে ঘুমোব-ঘুমোব করছে। স্কুল, কলেজ, আপিস-কাছারির জন্যে সবাই তৈরি হতে উঠে পড়ল। ছোটকা হঠাৎ তাঁর সেজদার কানের কাছে মুখ নিয়ে জোরে জোরেই বললেন, "কিন্তু সাবধান, সেজদা। যেন রাতদুপুরে সিরিয়াস স্বপ্ন দেখো না। সব লণ্ডভণ্ড করে ছেড়ে দেবে। ঐকতান, হ্যাঁ সে এক ভয়ঙ্কর ঐকতান!"



শিশিরকুমার মজুমদার

আপদ

মুকুন্দপুরের পণ্ডিতমশাই দেবলহাটির চৌধুরীদের বাড়ির মানত পুজো সেরে ফিরছিলেন। বেলা পড়ে এসেছে। দিনমানে পুজোর পর বেশ পেট ভরে খাইয়েছেন চৌধুরীরা। তা ছাড়াও চৌধুরীদের বুড়ো কর্তার নজর খুব উঁচু, দেবদ্বিজে ভক্তিও খুব। তাই দিয়েছেন থুয়েছেন ভাল। হাতের পুঁটুলিটাও তাই বেজায় ভারী। বয়ে আনতে আনতে বেশ হাঁপিয়ে পড়েছেন পণ্ডিতমশাই। অনেকটা পথ হেঁটে এসে আপন গাঁয়ের বাইরে ডোম পাড়ার কাছে পৌঁছলেন উনি। এ পথ দিয়ে সাধারণত



গাঁয়ের ভদ্র সাধারণ বড় একটা চলাচল করে না কারণ এদিকেই ডোম পাড়ার পর মরা নদীর খাদ, যা এখন ধান ক্ষেতে ভরে গেছে। তাই আলে আলে যেতে হয়। সে বড় অসুবিধা। ও দিকের হাটতলার পথ দিয়েই ঘুরে যায় সকলে। তাছাড়া ডোমগুলো তো আর মানুষ নয়! ওদের ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলাই উচিত।

আজ বোঝা নিয়ে ঘুর পথে যেতে ইচ্ছা হল না পণ্ডিতমশাইয়ের। বয়সও তো কম হয়নি। স্ত্রী মারা গেছেন সেই কবে। একমাত্র মেয়েরও তো বয়স কম হল না। তাড়াতাড়ি ঘরে পৌঁছাতে পারলে দু'দণ্ড বিশ্রাম পাবেন।

ডোম পাড়ার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন উনি। পায়ে চলা বড় পথটা থেকে বাঁ দিকে একটা সুঁড়ি পথ বার হয়ে গিয়েছে। সে পথটা ঘিরেই ডোম পাড়া। ধ্বসা খসা দেওয়াল আর খড়ের ফুটো চাল, খানকতক মেটে বাড়ি নিয়েই ডোম পাড়া। সেখান থেকেই অতি ক্ষীণ কণ্ঠে এক কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে, ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া! ডোমেদের কারও ঘরে সদ্যজাত কোন শিশু কাঁদছে।

বাচ্চারা ত কাঁদবেই সুযোগ পেলে। সে কান্নার আর জাত পাত কি?—ভাবলেন পণ্ডিতমশাই,আর ওই ভাবনাই ওঁকে বড় বড় পা ফেলে ও জায়গাটা পার হয়ে আসতে দিল না। বাচ্চার কান্নাটা যেন কেমন অন্য রকম! যেন কেঁদে কেঁদে বড় বেশী কাতর হয়ে পড়েছে ও! কি জানি, হয়ত এত বেলাতেও হতভাগাটার পেট ভরে খাওয়া জোটেনি, তাই অমন করে কঁকিয়ে কেঁদে হেদিয়ে পড়েছে! আহা, হয়ত ঘরে কিছু না থাকাতে ওর মা গেছে গাঁয়ের দিকে, দু'মুঠোর ধান্ধায়। জোটেনি এখনও। আপনি খেলে তবেই না সে খাওয়াতে পারবে বাচ্চাটাকে।

বেশ জোরেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পণ্ডিতমশাই। নিজের হাতের পুঁটুলিটা যেন হঠাৎ ওঁর কাছে আরও বেশী ভারী বলে মনে হল। মনে হল ওর ভিতরে তো অনেক চাল, আলু, কাঁচকলা আছে। অনেক, হয়ত গোটা ডোম পাড়ার সকলের এক বেলার ভর পেট খোরাক হয়ে যাবে। ভাবলেন কথাটা উনি, কিন্তু তখুনি নিজেকে সামলে নিলেন। আর তখুনি ভীষণ রাগ হল ওঁর। বাচ্চাটার মা না হয় ঘরে নেই, কিন্তু পাড়াতে তো আরও ক'ঘর মানুষ আছে। তাদের কেউ গিয়ে বাচ্চাটাকে একটু দেখতে পারছে না? সাধে কি আর সবাই এদের ছোটলোক বলে, আর ছোঁয়াছুয়ির বাচবিচার করে!

শুনেছেন উনি, সেই বেহুলা-লক্ষীন্দরের আমলে নাকি গঙ্গার মূল ধারা এদিক দিয়ে বয়ে যেত। মুকুন্দপুরে ছিল মহাশ্মশান। আশপাশের বিশ-ত্রিশখানা গাঁয়ের মানুষজন তাদের বুড়োবুড়িদের অন্তর্জলি করাতে, সতীদাহ করাতে আনত এখানে। গাঁয়ের ধারে নাবাল জমির আশে পাশে এখনও ভাঙ্গা সিঁড়ির ঘাট, অন্তর্জলির ঘর, আর হাজার সতী পাথর ছড়িয়ে আছে দেখা যায়। সেই মহাশশ্মানে ডোমদেরই ছিল রাজত্ব। তখন তারা শ্মশান যাত্রীদের লুটেপুটে খেত। বিশত্রিশ দিন বুড়ো বা বুড়িকে অন্তর্জলি করিয়ে বসে থাকা তো আর সহজ কাজ ছিল না। সহজ ছিলনা জলজ্যান্ত সতীদাহ করা। ও কাজে ডোমরাই সাহায্য করত, মোটা অঙ্কের কড়ি গুণে নিয়ে।

তাদের সেই পাপেই নাকি মা গঙ্গা ক্ষোভে দুঃখে ধারা ফেরান। তারপর বহুযুগ কেটে গিয়েছে। গোটা ডোম পাড়ার মানুষজনগুলো মরে হেজে গিয়ে মাত্র দু'চার ঘর যারা এখনও বেঁচে আছে কোন মতে, গুণতিতে তারা হবে বড় জোর বিশ বাইশ। তাদের আর মানুষ বলে চেনা যায় না। যে যেখানে যা পারে তাই করে। চাষের সময় জন মুনিষ খাটে। ক্ষেতে হাল দেয়, ধান বোনে, ধান কাটে। সে কাজই বা আর জোটে ক'মাস। তারপর পেটের তাগাদায় জোয়ান মদ্দ বুড়ো সবাই রোগাপটকা শরীরে জবজবে করে তেল মেখে বার হয় রাতবিরেতে, মুকুন্দপুর পার হয়ে চলে যায় এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে। নিঃশব্দে ঢোকে গেরস্থের বাড়িতে। ঘটিটা বাটিটা যাতে হাত দিতে পারে তুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। যা পায় তাতে তারা নিজেদেরই পেট ভরাতে পারেনা তো সংসারের অন্যদের মুখে দেবে কি?



আশেপাশের গাঁয়ের মানুষজন তাই ওদের ঘেন্না করে। ঠাকুমা-দিদিমারাও দুষ্টু অবাধ্য নাতী নাতনীদের গলা কাঁপিয়ে ভয় দেখান, ওই এল মুকুন্দপুরের হীরে ডোম, তোকে ধরবে বলে! শুনে বাচ্চারাও ভয়ে সিঁটিয়ে যায়।

হীরে ডোমের দলের কেউ অবশ্য কোন দিনও কোন গাঁয়ের কোন বাচ্চাকে ধরেনি।

বর্ষার ক'মাস ওরা অপরের ক্ষেত খামার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তারপর জীবনের অনেকটাই ওদের অনেকের কাটে সরকারের উঁচু দেওয়াল ঘেরা অতিথিশালায়। ওরা বলে, থাকা খাওয়া ফিরি।

তখন নাকি বেশ মোটাসোটা হয়েই ফিরে আসে ওরা!

কিন্তু বাচ্চাটা কঁকিয়ে কেঁদেই মরবে এবারে। পথের ধারে এগিয়ে গিয়ে পণ্ডিতমশাই গলা খাঁকারি নিয়ে হাঁক পাড়লেন, 'হীরে, হীরে আছিস নাকিরে ? ওরে বেটা হীরে !'

অবাক হলেন কেউ ওঁর ডাকে সাড়া দিল না দেখে। ব্যাপার কি ? গলা চড়িয়ে আবারও উনি হাঁক পাড়লেন, 'ওরে হীরে, নরেন, হলধর, বটুকের মা, বলি পাড়ায় কেউ নেই নাকি রে ? মরেছিস সবাই ? দেখ দেখ, কাদের ঘরে বাচ্চা কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে ওযে মরবে রে ! তোরা কি মানুষ না ভূত ?'

থমকে গেলেন পণ্ডিতমশাই। কোথাও কারও সাড়া পাওয়া গেল না ! নিশ্চয়ই তাহলে কোথাও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে। হয়ত পাল রাজাদের দেবমন্দিরে চুরি, তা না হলে জমিদার বাড়িতে সিঁদেল চুরি। গাঁ ছেড়ে তাই সবাই গা-ঢাকা দিয়েছে ! দরকার কি ছোটলোকদের ব্যাপারে নাক গলিয়ে। শেষে কি ঝামেলায় পড়বেন এত বেলায়। থাক পরোপকার। বড় বড় পা ফেলে গাঁয়ের দিকে আবার হাঁটা দিলেন পণ্ডিতমশাই।

হাঁটা তো দিলেন, কিন্তু কানের মধ্যে ওঁর কেমন যেন সেই অস্বস্তিকর আওয়াজটা লেগেই রইল—ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া। দুধের বাচ্চা, ওতো কারও বাড়িতে সিঁদ কাটেনি, চুরি-চামারির ও কি বোঝে ! কিন্তু জন্ম যে ওর ছোটলোকদের ঘরে, ওর বাপটাই হয়ত পাড়ার সব থেকে বড় সিঁধেল ! বাপের দোষেই দোষ ঘটেছে ওর। বড় হলেও ওতো হয়ে উঠবে ভয়ঙ্কর। ওকে দয়া করে কে ?'

হন হন করে হাঁটতে লাগলেন পন্ডিতমশাই। ভগবানই যাদের মেরেছেন, তাদের ভাল করবে মানুষে ! তাও ওর মতন চালকলাখেকো অং বং বলা পণ্ডিত, সারা জীবন ঘণ্টা নেড়েই কেটে গেল যার ! বাবার কাছে শেখা মন্ত্রগুলো বটতলার ছাপান পুঁথি দেখে পড়ে ঘণ্টা নাড়েন উনি। অর্ধেক মন্ত্রের মানেই বোঝেন না। বাকী অর্ধেকের উচ্চারণই করতে পারেন না ভাল করে, বড় বড় সমাসবদ্ধ সব পদ !

তবুও ব্রাহ্মণের ঘরেই জন্ম ওঁর। ওঁর বাবা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর বাবা, তাঁর বাবাও। জন্মটাই সব কিছু। আর সেই জন্মও হয় সবার পূর্ব পূর্ব আর সব জন্মের পুণ্যের ফলে। যার কপালে জন্ম থেকেই কান্না লেখা, সে তো কাঁদবেই।

তাড়াতাড়ি নাবাল জমির খাদে নেমে পড়লেন উনি। চারদিকে ছড়ান ছিটানো পুরনো দিনের ভাঙ্গা দালানের ফাঁকে ফাঁকে সাপের ভয়। তার ওদিকেই আদ্যিকালের ঝাঁকড়া বট। ওখানেই ওলাইচণ্ডীতলা। মূল বটের ঝুরির ফাঁকে ফাঁকে বহু ইটপাথরের দেখা মেলে। বেশ কিছুতেই তার নানান নক্সা কাটা। ওরই আশপাশে কোথাও সেই মহাশ্মশান ছিল। এখন এই জায়গা, গাঁয়ের বাইরে দেবস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাঁয়ের মানুষজন মেয়ে-পুরুষ হাজার মানত করে বটের ঝুরিতে ইঁটের টুকরো ঝুলিয়ে যায়। এ জায়গাটা পার হলেই সামনে সদর মহকুমায় যাওয়ার পাকা সড়ক। সে সড়কে আজকাল বাস চলে। মুকুন্দপুরের মানুষজনও ওই বাসে চেপে সদর মহকুমায় মামলা-মকদ্দমা করতে, সাক্ষী সাবুদ দিতে যায়।

মুকুন্দপুরে কায়েতের বাসই বেশী। অতীতে নদীপথে ব্যবসা করত তারা। এখন নাবাল জমিতে চাষ ভালই হয়। তাই এখনও অবস্থা তাদের মন্দ নয়।

তবে আশেপাশের বেশ ক'খানা গাঁয়ের মধ্যে বামুন বলতে একা উনিই আছেন তাঁর সংসার নিয়ে। সে সংসার তাঁর বিঘে তিনেক জমি আর একমাত্র মেয়েকে নিয়েই। সত্যি বলতে কি, সুখেই আছেন পণ্ডিতমশাই। পাওনা-গন্ডা ভালই। মান্যিগন্যিও করে সকলেই।

তবুও কোথায় যেন কেমন একটা গোলমাল আছে পণ্ডিতমশাইয়ের। কেমন যেন মাঝে মাঝে খিটখিটে হয়ে পড়েন। কেমন যেন অন্যমনস্ক ! তখন রাতদিন মুখ গুঁজে বসে থাকেন ঘরের কোণে। দরকারে কাজে-কম্মে যান বটে, না হলে গেরস্থদের ধম্মকম্ম চলবে কি করে, কিন্তু সে যাওয়ার পিছনে যেন ওঁর মন প্রাণ থাকে না। সব কাজই তখন ওঁর কেমন যেন ঢিলেঢালা। গাঁয়ের সবাই বুঝতে পারে, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, মাধব পণ্ডিতের আবার উদ্ধুবায়ু হয়েছে !

কি যে হয় ওঁর তা কেবল উনি নিজেই বুঝতে পারেন। হয়ত একটু বোঝে ওঁর মেয়েও। কিন্তু ওঁর মনের খবর নিয়ে এ গাঁয়ের কার মাথা ব্যথা।

বটতলার কাছ বরাবর পৌঁছবার আগেই ওদিক থেকে কেমন যেন একটা হট্টগোল শুনতে পেলেন পণ্ডিতমশাই। কারা যেন কাঁদছে। কারা যেন এক সঙ্গে কাকুতি মিনতি করছে কারও কাছে। তাদের গলা ছাপিয়ে এক মোটা গলায় হুঙ্কার শোন যাচ্ছে ! গলা চিনতে পারলেন পণ্ডিতমশাই, এ গলা মহকুমা সহরের দারোগার। কিন্তু একি ! মুকুন্দপুরের মাতব্বরদের গলাও কেন মাঝে মাঝে মিলছে দারোগার গলার সঙ্গে !

তবে কি ওঁর গ্রাম ছাড়ার পর কোথাও একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে গিয়েছে ?

বড় বড় পা ফেলে বটতলার কাছে পৌছে চমকে উঠলেন উনি । দারোগাবাবু বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার দিচ্ছেন, 'সব কটাকে চালান করে দেব । মেয়ে, পুরুষ, বাচ্চা, বুড়ো কাউকেই ছাড়ব না । বিশ বছরের জন্য ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়ব । তবে আমার নাম নগেন দারোগা ! ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি ?' হাউমাউ কান্নায় ওঁর বাকী কথাগুলো হারিয়ে গেল ।

গোটা ডোম পাড়ার সবার কোমরেই দড়ি পড়েছে । কেউই বাদ যায়নি । মেয়েরা, বাচ্চারা কাঁদছে । শিশুরা চেঁচাচ্ছে । যোয়ানগুলো উদাস ফাঁকা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে কোন দিকে যেন । আর ক'জন বুড়ো আশেপাশের পুলিশ বাবাদের আর দারোগাবাবুর দয়া ভিক্ষা করছে ।

গাঁয়ের দাশরথিবাবু থপথপ করে এগিয়ে এসে বললেন, 'এতদিনে নিশ্চিন্তে ঘুমুবার সুযোগ হ'ল । দারোগাবাবু বিচক্ষণ, ঠগ বাছতে গাঁ উজোর করে দিলেন । এখন সরকার আপদগুলোকে ফাঁসিতে ঝোলালেই সব রক্ষে ।'

একথা শুনে দারোগাবাবু গোঁফ চুমড়ে হেঁকে উঠলেন, 'ফাঁসি হবে না মানে ? সিকিন্দার বখত সাহেবের বাড়ির তিন তিন জন মনিষের লাস পড়েছে । রক্তগঙ্গা ব্যাপার যথাসর্বস্ব লুটপাট । দশ বিশটা ফাঁসিতে ঝুলবেই, এ বলে দিলাম । ব্যাটাদের বিষদাঁত চিরকালের মত ভেঙে যাবে ।'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল হীরে । কাতর ভাবে বলল, 'আমার কথাটা শোনেন আজ্ঞে দারোগাবাবু । চুরিচামারি করে আজ্ঞে পাড়ার অনেকেই । সে তো পেটের দায়ে । ডাকতি, গুমখুন—ওসব আজ্ঞে আমরা কখনও করি না । না খেয়ে খেয়ে এই শরীরের হাল । ওসব আমরা পারব কেমন করে !'

'চোপ রও শুয়োর ।' হেঁকে উঠলেন দারোগাবাবু, 'সব তোরা যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা । ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানিস না । বল, বল, বামাল কোথায় গস্ত করেছিস ? কে কে দলে ছিল ? তা যদি বলিস তো বাকিগুলোকে ছেড়ে দেব । নইলে যা বলার তা উকীলবাবুকে বলিস । সে-ই পারলে তোদের জামিন যোগাড় করে দেবে ।'

শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'তা দারোগাবাবু, আর দেরী করছেন কেন ? রওয়ানা দিন আজ্ঞে । আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি । গত সনে খরা গেছে । এদিকে ধান তেমন ওঠেনি কারও । তাদেরই বলে ভাল করে জুটছে না । তা ওই হা ঘরেদের জুটবে কোথা থেকে ? চুরিচামারি ছিঁচকেমিটা তাই বেড়েছে এদিকে খু-উ-ব । ও দিকে ভাগ্যের জোরে আমার ক'বিঘেয় ধানটা উঠেছে ভালই । উঠোনে মরাই ভরা । রাতে তাই ভাল করে ঘুমুতে পারি না । এদের তো আর ধম্মজ্ঞান বলতে কিছুই নেই ! এবারে নিশ্চিন্তে ঘুমুব ।'

দারোগাবাবু হেসে বললেন, 'রওয়ানা দিন বললেই তো আর হ'ল না । ডাকাতি, সঙ্গে তিন তিনটে খুন ! এমন আসামীদের নিয়ে হাঁটা পথে রওয়ানা দিলে কে কোথায় পালাবে, অত কাঁচা আমি নই । ভ্যান আসছে, ভ্যানে তুলে নিয়ে যাব ব্যাটাদের । তেমন করে কেস সাজাতে পারলে, বেশ কটাকে ঝোলাতে পারব । একবার থানায় নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে কচুয়া ধোলাই দিলেই পেট থেকে সব কথা হড় হড় করে বার হয়ে আসবে ।'

কথাটা এতই মজার যে আশেপাশের মাতব্বর সবাই প্রাণখুলে হেসে উঠলেন ।

শিবতোষ বাবু বললেন, 'নে বেটারা ফাটকে যাবার আগে সরকারি খরচে ভ্যানে চেপে নে । তবু তোদের জন্ম সার্থক হবে ।'



আবার সবাই মজা করে হেসে উঠল । হীরে যেন কেমন গুম মেরে গেছিল । মাথা তুলে তাকালও না আর । হীরে চুপ তো দলের সবাই চুপ ! সবার চোখে আতঙ্কভরা চাউনি । কি আছে ভাগ্যে ওদের, তা যে ওরা কল্পনাই করতে পারছে না !

সবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন পণ্ডিতমশাই । অবাক হলেন । অমন দৃষ্টি কি ডাকাত, খুনে আসামীদের হয় ? না, না, ওরা বদ হতে পারে, মন্দ হতে পারে, হতে পারে চোর ছ্যাঁচোড় । ওরা খুনে নয় !

থাকতে না পেরে বলেই ফেললেন, পণ্ডিতমশাই, 'আজ্ঞে দারোগাবাবু, হীরের কথাটাও একটু শুনুন আজ্ঞে । ওরা চুরিচামারি করে তা শুনেছি । তবে আজ্ঞে এ গাঁয়ের কারও বাড়িতে নয় । সোমবছর খোরাক জোটে না ওদের । ওই তো চেহারা ! আজ্ঞে ওরা করবে খুন ডাকতি ! আর করেই যদি তো লুটের মাল গেল কোথায় ? তাতো আজ্ঞে পাননি আপনি ডোম পাড়ায় । শুধু সন্দেহবশে কারও কোমরে দড়ি দেওয়াটা কি উচিত আজ্ঞে ?'

থমকে গেলেন সবাই !

ফুঁপিয়ে কান্নাও থেমে গেল ডোমদের ! অবাক চোখে তাকাল তারা ।

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না নগেন দারোগা ! মুকুন্দপুরের পণ্ডিতকে বেশ ভাল করেই চেনেন উনি । থানার বাবুদের বাড়িতেও গেছেন উনি পূজাআচ্চা করতে । মাথায় বেশ ছিট আছে ওঁর, তাও জানেন । কিন্তু তা বলে এতটা ! বাজ পড়ল যেন ! হাঁকলেন দারোগাবাবু, 'নিজের চরকায় তেল দিনগে যান পণ্ডিত মশাই । নেহাত আপনাকে চিনি, তা না হলে আসামীদের সাঙ্গাৎ বলে কোমরে দড়ি পরাতাম । যান, যান, যান এখান থেকে । গেলেন ?'



বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল পণ্ডিতমশাইয়ের । কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন উনি । পাশে দাঁড়ান শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'আহা, এখনও কেন এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন আপনি ? সারাদিন তো বাইরে ছিলেন দেখছি । যান্ এখন ঘরে বিশ্রাম করুন গিয়ে । দারোগাবাবুকে তাঁর কাজ করতে দিন ।'

কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল পণ্ডিতমশাইয়ের, বড় বড় পা ফেলে সদর রাস্তা পার হলেন উনি । পিছনে তখন দশদিকের ধুলো উড়িয়ে দু'দুখানা কালো থানার গাড়ি এসে দাঁড়াল বটতলায় । রাস্তার পাশের ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলেন উনি, লাথি গুঁতো মেরে জন্তুজানোয়ারের মত গাড়ি দুটো বোঝাই করল পুলিশ বাবারা । তারপর আবার দশ দিকের ধুলো উড়িয়ে সদরের দিকে চলে গেল ।

কাঁপতে কাঁপতে বাসায় ফিরলেন পণ্ডিতমশাই । মা মরা মেয়ে সরলা কি যেন করছিল উঠোনে । এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ও কি, অমন করছ কেন তুমি বাবা ? কি হয়েছে শুনি ?'

ধপ্ করে দাওয়ায় বসে পড়ে হাতের পুঁটুলি নামিয়ে রাখলেন পাশে । তারপর যা দেখে এসেছেন তা খুলে বললেন মেয়েকে ।

সরলা ভীষণ রাগ করে বলল, 'তা তুমি অমন করছ কেন শুনি ? গাঁয়ের কেউই যখন কিছু ভাবছে না ও নিয়ে, তখন তোমার ভাবনার কি ? নাও ওঠো, মুখ হাত ধুয়ে এসো । তোমাকে কিছু খেতে দি ।'

খাবার কথা শুনে ভীষণভাবে চমকে উঠলেন পণ্ডিতমশাই । চোখ তুলে তাকালেন এদিক ওদিক । শেষ বেলার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে মাঠে, ঘাটে পুকুর পাড়ে । আর কিছু পরেই নাবাল জমির ওপরে ঝোপে জঙ্গলে শেয়ালগুলো ডেকে উঠবে, হুয়া হুয়া ! ওঁয়া ওঁয়া কান্না কি সেই জানোয়ারগুলো শুনতে পাবে না ! শিউরে উঠলেন উনি । কি করে এই সহজ কথাটা ভুলে ছিলেন এতক্ষণ । দেরী হয়ে যায়নি তো, ভীষণ দেরী !

'কি হ'ল আবার বাবা ?' ভয় পেয়ে সরলা চেঁচিয়ে উঠল ।

'আমি বোধহয় মা দেরী করে ফেললাম রে !' আর্তনাদ করে উঠল পণ্ডিতমশাই ।

উঠোন থেকে একখানা নারকেলের ছড়ি তুলে নিলেন উনি। গায়ের নামাবলীখানা উনি ছুঁড়ে দাওয়ায় ফেলে দিয়ে বললেন, 'একটু দুধের যোগাড় কর তো মা। আমি আসছি এখুনি।'

ছুটেই উনি বার হয়ে গেলেন বাইরে। অবাক সরলা ওঁর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

গাঁয়ের সবাই আজকাল বলাবলি করেন, পণ্ডিতমশাইয়ের মাথার ব্যামো হয়েছে। সে কথা তো কানে যায় সরলার। শুনেছে, শ্রীমন্ত জ্যাঠা নাকি চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডায় বলেছেন, ভিন্ দেশ গাঁ থেকে নতুন পণ্ডিত আনিয়ে জমি জিরাত দিয়ে বসাবেন এখানে। সে কথা কি ওর বাবার কানে যায়নি ? কিন্তু কে বোঝে সে কথা। উনি ভাবেন, ওঁর তিন বিঘে জমিতেই সংসারের সব কিছু চলে ! চলে না ছাই। তবুও আপন তালেই আছেন বাবা ওর। এখন যে আবার কোথায় কি ঘটাতে গেলেন কে জানে ! ভীষণ চিন্তা নিয়ে পথে বার হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল ও। দুদিকের ঝোপেঝাড়ে জোনাক জ্বলতে আরম্ভ করেছে। আঁধার ঘনাল। বাবাকে ওর কোথাও দেখা গেল না।

নাবাল জমির মাঝ বরাবর পৌঁছলেন যখন পণ্ডিতমশাই, তখনি শেয়ালগুলো আবার হাঁক দিয়ে ফিরে গেল ডোমপাড়ার আশপাশ থেকে। আঁকুপাঁকু করে ছুটলেন পণ্ডিতমশাই। কোঁচার খুঁট খুলে খুলে পড়তে লাগল, এখানে ওখানে হোঁচট খেলেন বার কতক। ডোমপাড়ার গলির সামনে দাঁড়িয়ে নারকেলের ছড়িটা মাথার উপরে তুলে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হেই হেই, দূর হ দূর, যা,' যাঃ। দু'চার বার ছড়িটা পথের উপরে বেশ জোরে জোরে আছড়ালেন। ছড়ি নামিয়ে রেখে বার কতক বেশ জোরে জোরে হাত তালিও দিলেন। শেষ পর্যন্ত সাহসে ভর করে ছড়ি বাগিয়ে পায়ে পায়ে ঢুকে পড়লেন পাড়ার মধ্যে। এখানে ওখানে দু'চারটে থালাবাসন, ঘটিবাটি ছড়ান। ছেঁড়া কাঁথা কাপড় এদিক ওদিক ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। একটা বালিস ফেঁড়ে গিয়ে হাওয়ায় তুলো উড়ছে। এক জায়গায় বাড়া ভাতের থালার সামনে ডালের হাঁড়ি উল্টে রয়েছে। আর একটা ঘরের কপাট আধ ভাঙ্গা হয়ে ঝুলছে। কোথাও কোন মানুষজন নেই। ওঁয়া ওঁয়া কান্নাটা যে কখন থেমে গেছে কে জানে। ঘর কখানার মাঝে একটু নিকোনো উঠোন। উঠোনের মাঝেই থমকে দাঁড়ালেন পণ্ডিতমশাই। তাহলে কেউ কি এসে নিয়ে গিয়েছে বাচ্চাটাকে ? হতেও তো পারে তা। হয়ত ওর মা দারোগাকে দেখে ঝোপ জঙ্গলে পালিয়েছিল। পরে ফিরে এসেছে। কথাটা বেশ মনে ধরল পণ্ডিতমশাইয়ের। বেশ খুশি মনেই ডাক দিলেন, 'কি গো তোমারা কেউ আছ নাকি এদিকে ? আমি মুকুন্দপুরের পণ্ডিতমশাই গো, সাড়া দাও।'

কেউই সাড়া দিল না। আতঙ্কে সামনের ঘরটায়ই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন পণ্ডিতমশাই। কিছুই থাকে না ডোমদের ঘরে, তা জানেন উনি। যা ছিল, তা-ও লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে আছে। মানুষজন কেউ কোথাও নেই। নেই সে-ও, যাকে খুঁজছেন উনি !

ছুটে বার হয়ে গেলেন পাশের ঘরে, সে ঘরেও কেউ নেই ! তার পাশেরটাও খালি। তার পাশেরটাও।

ঠাই ঠাই করে নিজের কপাল চাপড়াতে লাগলেন পণ্ডিতমশাই। চেঁচিয়ে উঠলেন আপন মনেই, 'এ কি করলে ভগবান, এ কি করলে !' উঠোনের মাঝখানেই বসে পড়লেন উনি।



হঠাৎ উল্টো দিকের আধভাঙ্গা হেলে পড়া ঘরটার মধ্যে নজর পড়ল ওর। অন্ধকারে দেখলেন, দোরের কাছেই এক গাদা ছেঁড়া খোড়া ন্যাকড়ার মাঝে যেন একটা শিশুর দেহ। শিউরে উঠলেন উনি, প্রাণের সাড়া নেই কি ওর ! হায় ভগবান !

ধড়ফড় করে দাওয়ায় উঠে ঝুঁকে পড়লেন ছোট্ট দেহটার উপরে, অল্প কিছুক্ষণ বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। আঃ ভগবান, ক্লান্তিতে কেঁদে কেঁদে ছেঁড়া কানির মাঝে ঘুমিয়ে আছে এক কেলে মাণিক !

ভাঙ্গা ঘর, হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে ফাটল দিয়ে। ছেঁড়া কানি থেকে আধখানা শরীর ওর বার হয়ে আছে। এখুনি ঠাণ্ডা লেগে যাবে। কি করবেন উনি ? তুলে বুকে জড়িয়ে ধরবেন ? জাত যাবে ওঁর ? যাক। প্রাণের দাম তার থেকেও হাজার গুণ বেশী। ঝুঁকে তুলতে যাবেন যেই, পিছনে পায়ের আওয়াজে চমকে ফিরে দেখলেন, সরলা দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে ! পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ও। ঝুঁকে দেখে বলল, 'এ-কি সর্বনাশ ! ও কে ?'

'ডোমদের ছেলে।' কেমন করে যেন বললেন পণ্ডিতমশাই, 'গাঁ উজোড় করে সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়েছে সদরের দারোগা। কেউ নেই ওর।'

'সর্বনাশ ! এখন তা হলে কি হবে বাবা ?' ভীষণ ভয় পেয়ে সরলা জিজ্ঞাসা করল।

'তুই বল মা, তুই বল, এখন আমি কি করি ?' অসহায়ের মত জিজ্ঞাসা করলেন পণ্ডিতমশাই, 'দেবলহাটি থেকে ভারী বোঝা নিয়ে এদিক দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরছিলাম ঘরে। যাবার সময় ওর কান্না শুনে গেছিলাম। গোটা গ্রামের সবাইকে যে দারোগা ধরেছে তখন বুঝিনি। পথে দেখলাম, ওদের কোমরে দড়ি দিয়ে গাড়িতে তুলছে, চালান দেবে বলে। এখন ওকে দেখবে কে ? শেয়ালে ছিড়ে খাবে না ?'

কোলে উঠে বাচ্চাটা নড়ল চড়ল না। চোখও খুলল না। কাঁদলও না। ভয় পেয়ে সরলা বলল, 'বাবা জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে ওর !'

'চল্, চল্, পা চালিয়ে চল্।' বললেন পণ্ডিতমশাই, 'বাড়ি গিয়ে তোর কবিরাজ কাকাকে ডেকে আনব'খন। ও কিছু না, কান্নার তরাসে হয়েছে। ওষুধ পথ্যি করলেই সেরে যাবে দেখিস।'

বড় রাস্তায় উঠে সরলা বলল, 'এ্যাঃ ম্যা, কি কুচ্ছিত কাল দেখতে বাবা, এত কালও হয় কেউ ?'

হেসে পণ্ডিতমশাই বললেন, 'রূপের গরব করিসনে মা। ওতো ভগবানের দান। কালোধলোয় কি এসে যায় ? মানুষ মানুষই।'

নিজের এই কথাটা নিজের কানেই কেমন যেন হঠাৎ বাজল পণ্ডিতমশাইয়ের ! কেন যেন মনটা ওঁর হঠাৎ খুব খুশিতে ভরে উঠল। মনে হল উনি যেন আর সেই অং বং বলা লোক ঠকান পণ্ডিত নন। বটতলার ছাপান মহাজনদের পদাবলিতে লেখা মহাজনদের মতই কথা বলছেন ! কথা, যা খু-উ ব সহজ, অথচ যার মানে কেন যেন এতদিন উনি নিজেই কিছুতে বুঝতে পারছিলেন না ! আর পারছিলেন না বলেই নিজের মনে জ্বলে পুড়ে মরছিলেন ! খিটখিটে হয়ে যাচ্ছিলেন। লোকে আড়ালে ওঁকে ছিটগ্রস্ত বলছিল !

ঘরে পৌঁছে ওকে ভাঙ্গা চৌকির মাঝখানে শোয়াল সরলা। দড়ি থেকে ওর সব থেকে ভাল শাড়িগুলো এনে পাট করে বিছানা বানাল। বাবার একখানা নামাবলী ভাঁজ করে ওর গায়ে চাপা দিল। ব্যস্ত হয়ে বলল, 'ও বড় নির্জীব হয়ে পড়েছে বাবা। আমি দুধ গরম করছি। তুমি ছুটে যাও কবরেজ কাকার কাছে। এখুনি তাঁকে আসতে বলো।'

ব্যস্ত হয়ে পণ্ডিতমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'দুধ, খাওয়াবি কি করে তুই ? ঝিনুক বাটি কি আছে বাড়িতে ?'

ধমকে সরলা বলল, 'তুমি যাও তো বাবা। সে আমি বুঝব। কবরেজ কাকা যেন ওষুধ পথ্যি সব নিয়েই আসেন সঙ্গে করে। বড় দেরী হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। যাও, তুমি আর দেরী কর না।'

পণ্ডিতমশাই বার হয়ে যাচ্ছিলেন যখন তখনই সরলা আবার চেঁচিয়ে বলল, 'ফুলটুসিদের বাড়ি থেকে আমার নাম করে পারলে একটা ঝিনুক বাটিও চেয়ে এনো বাবা। ওদের অনেক আছে। চাইলেই দেবে।' 'আচ্ছা, আচ্ছা', বলে মাথা নাড়তে নাড়তে বার হয়ে পড়লেন পণ্ডিতমশাই। আজ যেন ওঁর সব কিছু করতে খুব ভাল লাগছে ! যেন মনে হচ্ছে ওঁর অনেক বয়স কমে গেছে। আবার জীবনের সব কিছুই নতুন করে সুরু করতে পারেন উনি। দশ ক্রোশ দূরের সরকারী বিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হতে পারেন উনি। আবার মন দিয়ে



লেখাপড়াও করতে পারেন । তা হলেই তো মিথ্যা ঘণ্টা নেড়ে আর লোক ঠকিয়ে খেতে হবে না ! কি যে লেখা আছে মন্ত্রগুলোতে, তা-ও ভাল করে বুঝতে পারেন না উনি । একটা ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে নিজেই অন্ধকারে ফেরেন । নিজে অন্ধকারে থেকে অপরকে ধর্মের নামে, ঈশ্বর দেবতা ভগবানের নামে, আলো দেখাতে চেষ্টা করেন । এ অন্যায়, এ পাপ ! এই তো সারা জীবন করে চলেছেন উনি ! ব্রাহ্মণ উনি ? ছি ছিঃ, ব্রহ্মতেজ কই ওঁর ? ডোমেরা চুরিচামারি করে, ধরা পড়ে, বিচার হয়, সাজা পায় । উনি কি করেন ? কি করছেন ?

পথ চলতে চলতে থমকে গেলেন পণ্ডিতমশাই । এতো তঞ্চকতা, মিথ্যাচার ! তাই করেছেন উনি সারাজীবনভোর দুমুঠো অন্নর জন্য !

বটতলার পদাবলী বইতে লেখা আছে, 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই ।' শুধু এই কথাটার মানে যেন এত দিনে একটু একটু বুঝতে পারছিলেন পণ্ডিতমশাই । আর বুঝতে পারছিলেন বলেই তাঁর অন্তরের জ্বালা যেন শতগুণ বাড়ছিল । উঃ, কি বলেছেন মহাজন, মানুষ ভগবানের থেকেও বড় ! উনি কিনা অং বং বলে সেই মানুষকেই ঠকাচ্ছেন !

সব শুনলেন কবিরাজ মশাই । তবুও যেন কেন তেমন গা করলেন না । ঘোষেদের কর্তার নাড়ী টিপে বসে রইলেন চোখ কড়িকাঠের দিকে করে । ব্যস্ত হয়ে পণ্ডিত বললেন, 'একটু তাড়াতাড়ি কর হে তারিণী জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে দেখে এসেছি । অতটুকু প্রাণ আর কত ধকল সইবে ? শেষে কিছু না হয়ে যায় ।'

এ-কথার উত্তরে খেঁকিয়ে উঠলেন ঘোষ কর্তা । অঙ্গ ভঙ্গি করে বললেন, 'আপনার ভীমরতি ধরেছে পণ্ডিত মশাই । তাই ভর সন্ধ্যেবেলা মরতে গেছিলেন ডোম পাড়ায় পরোপকার করতে । বলি বাচ্চাটাকে দুধকলা দিয়ে পুষবেন নাকি ? তা পুষুন গে যান । আমি বলার কে ? তবুও বলি ধম্মো বলে তো একটা কথা আছে ? ডোম, মুদ্দোফরাস, চাঁড়ালদের ঘরে ঠাঁই দিয়ে তারপর আপনি কি সকাল সন্ধ্যে গেরস্থ বাড়ি বাড়ি গিয়ে পূজোআচ্চা করে বেড়াবেন নাকি ? আপনার পাগলামো আর কত সহ্য করব বলতে পারেন ?'

থতমত খেয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন পণ্ডিতমশাই, তারিণী কবিরাজ মশাই ঘোষ কর্তার নাড়ি ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'এখনও, অনেক আয়ু আপনার । দিব্যি স্বাস্থ্য ।'

একথা শুনে ঘোষ কর্তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ।

তারিণী কবিরাজ তাক থেকে একটা বোতল পেড়ে গোটা কতক কাল বড়ি বার করে একটা কাগজে মুড়ে এগিয়ে ধরে বললেন, 'এই ঔষধের একটা বটিকা মধুর সঙ্গে মেড়ে জিভে লাগিয়ে দেন গিয়ে পণ্ডিতমশাই । বাঁচার হলে ও আপদ ওতেই বাঁচবে । ভর সন্ধ্যেয় ছোঁয়াছুয়ি করে আমি আর পুকুরে ডুব দিতে পারব না । যান, মধু দিয়ে মেড়ে খাওয়ান গিয়ে । ডোম মুদ্দোফরাসের প্রাণ অত সহজে যাবার নয় ।'

মনের ভিতর কেমন যেন করে উঠল পণ্ডিতমশাইয়ের । অসহায় কালো কুচকুচে মুখটা একবার যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল ! কেমন যেন বোকার মত বললেন, 'জ্বরটা খুব বেশী হে তারিণী, তাছাড়া নির্জীব হয়ে পড়েছে । তুমি একবার গেলে ভাল করতে । একেবারে দুধের বাচ্চা, সরলা বলছিল.....'

কথা শেষ করতে পারলেন না উনি ।

ঘোষ কর্তা আবার গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠলন । কবিরাজমশাই জোড় হাত করে বললেন, 'আমার ঔষধে যদি কাজ না হয় তো অমি গিয়ে করব কি বলুন তো পণ্ডিতমশাই ?'



দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন পণ্ডিতমশাই । ফুলটুসির কাছে আস্তে আস্তে কথাটা পাড়লেন উনি । বললেন, 'তোর মাকে গিয়ে একবার বল মা ক'দিনের জন্য ধার চাই ঝিনুক বাটি । মেজে ঘষে ফেরত দেব ক'দিন পরেই ।'

অবাক ফুলটুসি বলল, হ্যাঁ কাকা, কই সরলা তো কখনও বলেনি আপনাদের বাড়িতে কুটুম আসবে ! আজই তো দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে বিকালে । তা কে এল কাকা ? সঙ্গে খোকা না খুকি ? বয়স কত ?'

এসব কথার কি যে উত্তর দেবেন তা ভেবেই পেলেন না পণ্ডিতমশাই । মাথা চুলকে সাহস করে সব কথাই ফের আস্তে আস্তে খুলে বললেন উনি । কাতর ভাবে বললেন, 'দে না মা, যা হোক করে একটা অন্তত দুধ খাওয়াবার ঝিনুক যোগাড় করে ।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ফুলটুসির । বলল, 'খবরদার কাউকে কিছু বলবেন না যেন । মার যা ছুঁচিবাই । আপনি বসুন, আমি এনে দিচ্ছি ।'

চোরের মত চুপিচুপি বাড়ি ফিরলেন পণ্ডিতমশাই । যে পৃথিবীটাকে এই কিছুক্ষণ আগেই বেশ সুন্দর বলে

মনে হচ্ছিল, তা যেন আবার কেমন বিশ্রী হয়ে গেল।

উঠোনে পা দিয়ে দেখলেন ঘরের টিমটিমে আলোয় বাচ্চাটার উপরে ঝুঁকে রয়েছে সরলা ! ধক্ করে উঠল ওঁর বুকের ভিতরটা, তবে কি··· ? উঠোন থেকেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কিরে মা, একটু গরম দুধ খাইয়েছিস ওকে ?'

কেমন করে যেন তাকিয়ে মাথা নাড়ল সরলা।

ব্যস্ত হয়ে উনি ফের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন রে, কি হয়েছে ? এই নে, ঝিনুক এনেছি।'

ঝিনুক হাতে নিয়ে মাথা নাড়ল সরলা। জিজ্ঞাসা করল, 'কবরেজ কাকা কখন আসবেন ? ওর তো হুঁসই নেই বাবা ! হুঁস না এলে, কে খাবে ?'

'তারিণী আসবে না বলেছে', বললেন পণ্ডিতমশাই।

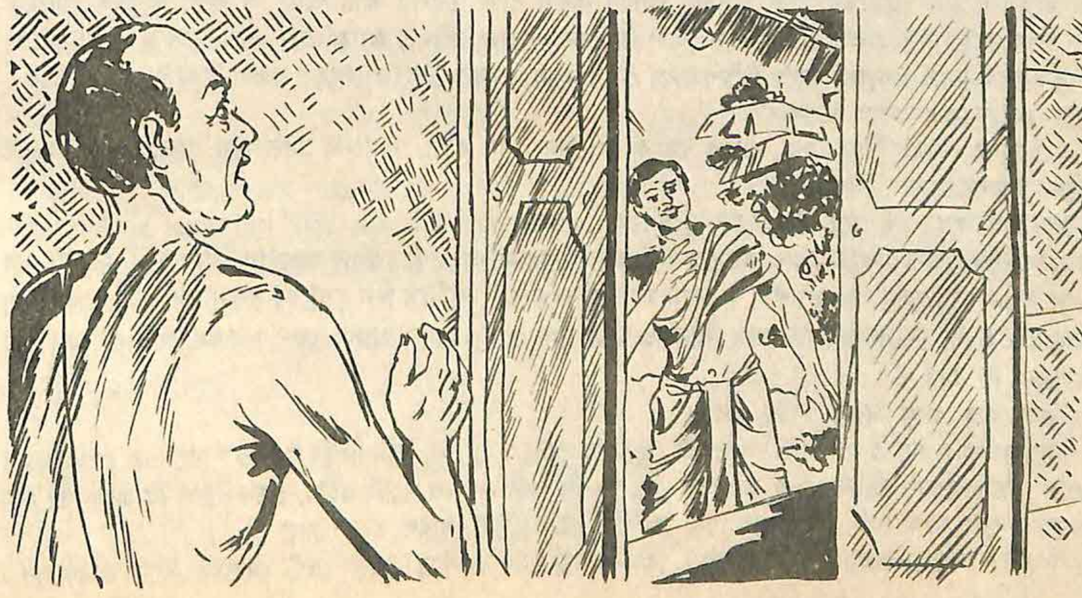
'কেন ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল সরলা, 'তুমি বলেছ জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে ?'

বলেছি। তবুও সে আসবে না। এত রাতে ডোম মুদ্দোফরাস ছুঁয়ে সে নাইতে পারবে না। ওষুধ দিয়েছে, মধুর সাথে মেড়ে জিভে মাখিয়ে দে। হবার যদি হয় মা, ওতেই হবে বলেছে।'

বাচ্চাটার মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে সারা মুখে ওষুধ মাখিয়ে দিল সরলা। তারপর গভীর আগ্রহে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ বসে থেকে ভয়ে ভয়ে বলল, 'ও বাঁচবে না বাবা। শেষে থানাপুলিশ হবে। বিপদে পড়ব আমরা। কি হবে তখন বল তো ?'

'চুপ করতো মা তুই।' যেন ধমকে উঠলেন পণ্ডিতমশাই। মনের ভিতরে তখনও যেন ওঁর কেমন করছিল। এত করেও বাঁচবে না বাচ্চাটা ! বাঁচবে না ? কেন ? কি এমন হয়েছে ওর ? সামান্য অবহেলায় কেঁদে আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়েছে। না হয় একটু জ্বরই হয়েছে, অমন জ্বর তো সব বাচ্চারই হয়। তারিণী কবিরাজ এলেই পারত। তা হলে তো আর কোন ভয়ই থাকত না। না আসুক, ওষুধ তো দিয়েছে। ওর ওষুধের খুব নাম ডাক। দশখানা গাঁয়ের মানুষ খেয়ে বাঁচে। আর বাঁচবে না ওই অপগণ্ড অপদার্থ আপদটা ? হ্যাঁ আপদই তো ! তাইতো ভাবছে সবাই !

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পণ্ডিতমশাই। গাঁয়ে মানুষ আছে অনেক। টাকা আছে, পয়সা আছে, তাদের আছে কত ক্ষমতা ! কিন্তু নেই সেই সামান্য জিনিসটা, যেটা থাকলে অসহায় একটা শিশুর কান্নার দাম দেওয়া যায়। বোঝা যায় মহাজনদের পদাবলীর মানে ! হায় রে, মানুষগুলো মানুষই হতে পারল না !



তখনি বাইরে অনেক পায়ের আওয়াজ উঠল। কারা যেন হাঁক পাড়লেন, 'পণ্ডিতমশাই, পণ্ডিতমশাই, বাড়িতে আছেন ? একবার এদিকে আসুন তো। জরুরী কথা আছে।'

ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল পণ্ডিতমশাইয়ের। অসহায়ের মত একবার শুধু তিনি তাকালেন তাঁর মেয়ের মুখের দিকে। মেয়েও যেন তাঁর কেমন ভয় পেয়েছে বলে মনে হল ওঁর। তারিণী কবিরাজের বাড়ি থেকে ফিরে এসে ইস্তক মনে মনে যেন এমনই একটা কিছু ঘটার কথাই উনি ভাবছিলেন। ঘোষ কর্তার সঙ্গে গাঁয়ের মাতব্বররা সবাই আসবেন। আসবেন তাঁরা ধর্ম অধর্মের বিচার করতে ! যে ধর্ম মানুষের প্রাণের থেকেও অনেক নাকি বেশী দামী !

বাইরে থেকে আবার ডাক পড়ল, 'পণ্ডিতমশাই, বাড়িতে আছেন ! বাইরে আসুন তো। জরুরী বিষয়ে আলোচনা আছে।'

এ গলা শ্রীমন্ত বাবুর।

বিচার হবেই। বিধান দেবেনই ওঁরা। ওঁরাই প্রবল। কিন্তু সারা জীবনে যে না-পাওয়া জিনিসটার জন্য পাগলের মত অন্ধকারে খুঁজে ফিরেছেন উনি, আজ প্রাণ মন ভরে সেই জিনিসটাই পেয়েও ভয়ে সিঁটিয়ে যাবেন উনি ! বাকী জীবনটাও অমনি করেই অং বং বলে ঘণ্টা নেড়ে কতকগুলো ভয় দেখান মানুষের মন যুগিয়ে চলবেন !

সব ভয় যেন মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেল পণ্ডিতমশাইয়ের। বাইরে এসে দাঁড়ালেন উনি।

'আমরা খবর দিয়েছি গোবিন্দপুরে হাঁদু শেখ আসছে। আপদটাকে তার হাতে তুলে দেবেন। তারপর বাপ বেটিতে গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে আসবেন কাল। যাতায়াতের খরচ আমরা দেব। পাগলামির সীমা থাকা উচিত।'—চারদিক কাঁপিয়েই বললেন শ্রীমন্তবাবু।

আবার রাজ্যের ভয় এসে পেয়ে বসল পণ্ডিতমশাইকে। ঘণ্টা নাড়া বন্ধ হলে খাবেন কি উনি ! মেয়েটাকে নিয়ে এ বয়সে যাবেনই বা কোথায়, এখানকার পাট চুকলে ? ওঁয়া ওঁয়া করে কেঁদে এক আপদই এসেছে ওর ঘরে। না যদি দেখতেন উনি না যদি আসতেন ও পথ দিয়ে, তাহলে কি হত ! চুপ করেই এসব কথা ভাবতে থাকলেন উনি।

ধমকে উঠলেন শ্রীমন্তবাবু, 'কই, কিছু বলুন ! ইদানিং অনেক পাগলামি আপনার অনেক সহ্য করেছি। তা বলে তো ধম্ম কম্ম রসাতলে দিতে পারি না ! স্পষ্ট শুনুন, আমার শ্বশুরবাবড়ির গাঁয়ের এক ঘর পুজুরি বামুন সে গাঁয়ের বাস তুলে এখানে এসে থাকতে চান। বললেই আসেন। আমি তো আগেই আনতে চেয়েছিলাম। সবাই বাধা দিচ্ছেন সাবধান করে দিতে। কিন্তু এ কি করছেন আপনি ? একি বেরাহ্মণের কাজ !'

অগোচরে কত পাপই তো ঘটে যায়, কে তার জন্য দায়ী ? ভাবলেন পন্ডিতমশাই। এতো তা নয়। উনি দেখেছেন ! উনি শুনেছেন সেই অসহায় কান্নার করুণ ব্যথা এরপর আর অন্য কি কথা থাকতে পারে ?

হাঁপাতে হাঁপাতে একটা ছেলে এসে ঢুকল উঠোনে। বলল, 'শ্রীমন্ত জ্যাঠা, হাঁদু শেখ আসছে ও গাঁ থেকে, তার দলবল নিয়ে। বলল, আগে পঁচিশ টাকা নেবে নগদ, তবে দায় বুঝে নেবে। বলল টাকাটা এনে রাখতে। ওরা মোছলমান করবে ওকে।'



'ও টাকা আমিই দিয়ে দেব', ওদিক থেকে বললেন ঘোষ কর্তা, 'বামুনের জাত মান বলে কথা ! যা তুই ওদের আসতে বল গিয়ে।'

ছেলেটা ফের হাঁপাতে হাঁপাতেই ছুটে চলে গেল।

চারদিকের অন্য সকলে ঘোষ কর্তাকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'গঙ্গা স্নান করলেই সব পাপ খণ্ডন। বুঝলেন পণ্ডিতমশাই ? কোন মতে আজ রাতটা কাটিয়ে দিন ভোরেই রওনা দেবেন। এখন চলি আমরা। ও গাঁ থেকে শেখের পোর আসতে ঘণ্টা পার হবে। তখন আসব ফের ! এখন আর ছোঁওয়া ছুঁয়ি করবেন না অত।'

এক এক করে সবাই চলে গেল।

উঠোন খালি হতেই ধমকে উঠল সরলা, 'তুমি কি বাবা ? হ্যাঁ, না, তুমি কিছুই বলতে পারলে না ! শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলে ! চল, ঘরে চল। ও আপদ যখন এখনও ঘরেই রইল, তখন বাঁচল কি মরল তা তো দেখতে হবে আমাকেই। তোমার তো আবার ছোঁওয়াছুঁয়ি বারণ হয়ে গেল !'

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলেন পণ্ডিতমশাই। কেমন করে যেন কাপড়ে মোড়া ছোট্ট দেহটার দিকে তাকালেন।

ভীষণ লজ্জায় কেন যেন আপনা থেকেই মাথা নিচু হয়ে গেল। ভাল করে তাকাতেই পারলেন না বাচ্চাটার দিকে। মিথ্যাই এতক্ষণ তিনি কি যে এক পরমার্থ পাওয়ার আনন্দ অনুভব করছিলেন। সব মিথ্যা। কিছুই পাননি উনি। কিছুই পাবার ক্ষমতা নেই ওঁর। নেই ওঁর বিদ্যে, নেই ওঁর সাহস। অং বং বলা পণ্ডিত তুই, ঘণ্টা নেড়েই বেঁচে থাক! ফের শিউরে উঠলেন পণ্ডিতমশাই।

হঠাৎ সরলা চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা, বাবা দেখত ওর দিকে দেখনা একবার!'

ভয়ে ভয়ে তাকালেন পণ্ডিতমশাই। ভাল করে দেখলেন একবার, চোখে মুখে কেমন যেন সতেজ ভাব ফিরে এসেছে বাচ্চাটার। ছোট্ট বুকটা ওর এতক্ষণে যেন স্বাভাবিক ভাবেই ওঠানামা করছে। আস্তে হাতটা বাচ্চাটার কপালে রাখলেন উনি। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ লজ্জা, ভয় ভুলে গিয়ে একগাল হেসে বললেন, 'জ্বর অনেক নেমে গিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে মা আমার। তুই দেখ তো একবার।'

কপালে হাত রেখে সরলা বলল, 'একটু দুধ গরম করে দেব বাবা? খায়নি তো মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ।'

'আহা দে, মা, দে। বললেন পণ্ডিতমশাই, 'এতটুকু একটা প্রাণ, ওর আবার জাতপাত কি রে? আর জাতপাতই বা কি? হাঁদু শেখ ওকে নিয়ে গেলে ও যদি মোছলমান হতে পারে, তবে আমি রাখলে ও বেরাহ্মণ হবে না কেন?'

দুধ গরম করতে সরলা ধমকে বলল, 'আবার ওসব, কথা বলছ বাবা। ছিমন্ত জ্যাঠা যখন ধমকাচ্ছিলেন তখন তো এসব কথা বলনি? আবার এসে ধমকাবেন যখন, তখনও মাথা নীচু করে থাকবে।'

অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে বসে রইলেন পণ্ডিতমশাই। দেখলেন চুক চুক করে দুধ খাচ্ছে বাচ্চাটা ওঁর মেয়ের কোলে। এক সময় যেন একটু হাসল ও! আবার যেন সব কেমন করে উঠল পণ্ডিতমশায়ের। কেমন যেন একটা কিছু করার ইচ্ছা যেন একটা বিরাট অনড় অচল পাহাড়কে ধাক্কা মেরে ফেলে গুঁড়ো করে দেবার ইচ্ছা! গাঁয়ের ছেলে রাঘব, রেলে কাজ করে। রাগ করে গাঁ ছেড়ে চলে গেছে চিরকালের মত। একবার এসেছিল জমি জায়গা বেচে দিতে। বলেছিল। পাহাড় ফাটিয়ে রেল লাইন পাতার কাজ করে ও। রেল দেখেন নি পণ্ডিত, পাহাড়ও দেখেননি। তবে শুনেছেন, পাহাড় বড়ই উঁচু জিনিস। তাই তো কাটায় রাঘব, গাঁয়ের ছেলে! তবে?

তখন থেকে তেমনই একটা ইচ্ছা পণ্ডিতমশায়ের! আজ যেন তেমনই একটা সুযোগ এসেছে!

তবুও ভয়ে ভয়ে বললেন উনি, 'আরে মা, বাচ্চাটাতো তোর হাত থেকে বেশ খাচ্ছে রে! তুই কি ওকে এমন করে খাইয়ে পড়িয়ে রাখতে পারবি? বল? তাহলে আর হাঁদু শেখের হাতে একে দেই না। কটা দিন তো মাত্র। জেল থেকে ওর মা ছাড়া পেলে, সে-ই তো নিয়ে যাবে ওকে ফের।'

সরলা চোখ পাকিয়ে বলল, 'ছিমন্ত জ্যাঠা তাহলে তোমাকে গাঁ থেকে দূর করে দেবেন বাবা। তাই কিন্তু বলে গেছেন।'

মুখ তুলে বললেন পণ্ডিতমশাই, 'দিক গে যাক। পূজো আচ্চা আমার আর ভালই লাগে না। ওর আমি কি বুঝি? বাপ-পিতেমোর তিন বিঘা জমি তো আর কেড়ে নিতে পারবে না। ওতে ধান, কলাই, মুগ লাগাব। মানুষের বাচ্চাকে শেয়াল কুকুরের মুখে ফেলে দিয়ে গঙ্গায় ডুব দেব, অমন পুণ্যিতে মা আর আমাদের কাজ নেই। কি বলিস তুই!'



দুধের বাটি নামিয়ে রেখে বাচ্চাটার মুখ কাপড়ে মুছিয়ে দিয়ে সরলা বলল, 'হ্যাঁ বাবা, গুচ্ছের পয়সা খরচ করে সেই দূর গঙ্গায় চানে গিয়ে কাজ নেই আর। পুকুরে ডুব দিলেই শুদ্ধ হয়ে যাব। হাঁদু শেখকে না করে দিও। কেলেমানিক এখানেই থাকবে। তাতে যার চোখ টাটায় টাটাক। এখন উঠে মুখ হাত ধুয়ে খেয়ে নাও তো। রাত হল।'

বুক থেকে অনেক বোঝা যেন নেমে গেল পন্ডিতমশায়ের। তাকিয়ে দেখলেন, আপদটাও যেন ঘুমের মধ্যে মুচকি মুচকি হাসছে!

জ্বরের ঘোরে শোনা

সমরেশ বসু



গোগোলের শরীর খারাপ। ঘরের মধ্যে খাটের বিছানায় শুয়ে আছে। পাশ ফিরে চোখ বুজে রয়েছে। মাথার বালিশের কাছ রয়েছে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা ছোটদের জন্য লেখা গল্পের বই। আর একটা কিশোর-পত্রিকা। বাবা ঘণ্টাখানেক আগে অফিসে বেরিয়ে গেছেন। মায়ের এক বান্ধবী এসেছেন, রেখামাসি। মা তাঁর সঙ্গে বসার ঘরে গল্প করছেন। শরীর কেউ ইচ্ছে করে খারাপ করে না। মা'র ধারণা গোগোল বৃষ্টিতে ভিজে ইস্কুলে খেলতে গিয়ে ঠাণ্ডা লাগিয়েছে। আর তার জন্যই ওর জ্বর আর কাশি হয়েছে। অবিশ্যি জ্বর বা সর্দিকাশি কোন ওটাই এমন কিছু

বেশি নয়, জ্বর এখন অল্পই আছে। চার দিন ও ইস্কুল কামাই করে শুয়ে রয়েছে। শুয়ে থাকতে আর মোটেই ভাল লাগছে না। কিন্তু মা'র কড়া বারণ, চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম নিতে হবে। গোগোল বুঝেছে, সবসুদ্ধ এক সপ্তাহ ইস্কুল যাওয়া হবে না। বন্ধুরাও কেউ বাড়ি নেই যে, ডেকে নিয়ে এসে গল্প করবে। সবাই এখন ইস্কুলে গেছে।

গোগোল মা'র কথায় বাধ্য ছেলের মতো চোখ বুজে শুয়েছিল। বাড়িতে নতুন কোনও বই বা পত্রিকাও নেই যে পড়বে, মাঝে মাঝে নীচে থেকে গাড়ির হর্নের শব্দ ভেসে আসছে। কোনও গাড়ি আসছে, অথবা বেরিয়ে যাচ্ছে। ওদের বিল্ডিংয়ের সামনে রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা গাড়ির একটুআধটু শব্দ শোনা যায়। আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

গোগোলের এক সময়ে একটু যেন তন্দ্রামতো এসেছিল। এই অবস্থায় ও শুনল, কোথায় ঠুক ঠুক করে শব্দ হচ্ছে। শুনতে শুনতে ওর তন্দ্রা ভেঙে গেল, আর তখনই শব্দটাও থেমে গেল। কোথা থেকে শব্দটা আসছিল ? ওদের নিজেদের ফ্ল্যাটেই কি শব্দ হচ্ছিল ? বঙ্কিমদা কি কোনও ঘরের দেয়ালে পেরেক বা কিছু পুঁতছিল ?

গোগোল মিনিট খানেক কান পেতে থেকে, আবার চোখ বুজে অন্য পাশ ফিরে শুল। তন্দ্রার ঘোরে নয়, হয়তো জ্বরের ঘোরে ভুল শুনছে, ফ্ল্যাটের মধ্যে কোনও ঘরে পেরেক ঠুকলে আরও জোরে শব্দ হয়। কিন্তু ঠুক ঠুক শব্দটা শোনা যাচ্ছিল খুব আস্তে আস্তে। গোগোলের মন থেকে ভাবনাটা চলে গেল। আবার একটু তন্দ্রার ঘোর এল। ওর কানে শব্দ ভেসে এল। কেউ যেন খুব আস্তে কোথাও করাত ঘষছে। শুনতে শুনতে আবার ওর তন্দ্রা ভেঙে গেল। কেউ কোথাও করাত চালাচ্ছে ? শব্দটা যেন সেই রকমই শোনাচ্ছে। কাঠের ওপর করাত চালাচ্ছে। নাকি লোহার ওপর কিছু ঘষছে ? ভাবতে-ভাবতেই শব্দটা থেমে গেল। কোথা থেকে শব্দটা ভেসে আসছিল ? ওদের ফ্ল্যাটের মধ্যে নিশ্চয়ই নয়। ওপরের ফ্ল্যাটে শব্দ হচ্ছে কি ? ওপরের ফ্ল্যাটটা ঠিক গোগোলদের মতোই। ওদের শোবার, বসবার, খাবার, রান্নাঘর আর বাথরুমের ওপর ওপরের ফ্ল্যাটেও একই রকম সব।

বঙ্কিমদা ঘরের মধ্যে ঢুকল। সে গোগোলদের বাড়িতে অনেকদিন আছে। গোগোলের জন্মের সময় থেকে। বঙ্কিমদা ওকে রীতিমত শাসন করে। বাবা-মা'র সেই রকম নির্দেশ আছে। গোগোল জিজ্ঞেস করল "বঙ্কিমদা, আমাদের ওপরের ফ্ল্যাটে কোনও কাজ হচ্ছে ?"

"কী কাজ হবে ?" বঙ্কিমদা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের ওপরে তো টুকাইদের ফ্ল্যাট।"

গোগোল তা জানে। টুকাই ওর বন্ধু। ওদের ফ্ল্যাটের নাম্বার বাষট্টি-এ। টুকাইদের ফ্ল্যাটে কি কোনও কাজ হতে পারে না ? গোগোল বলল, "টুকাইদের ফ্ল্যাটে বোধহয় কিছু কাজ হচ্ছে।"

"কী সব আজেবাজে কথা বলছ ?" বঙ্কিমদা কাঠের আলমারি খুলে কী যেন বের করে নিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, "তোমার জ্বরটা বেড়েছে নাকি ?"

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন, জ্বর তো বাড়েনি।"

বঙ্কিমদা'র যেন বিশ্বাস হল না। খাটের কাছে এসে গোগোলের কপালে হাত দিয়ে দেখে, চোখ কপালে তুলে বলল, "এ কী, জ্বর তো বেশ ভালই রয়েছে। বেড়েছে বলেই মনে হচ্ছে। তাই তুমি টুকাইদের ফ্ল্যাটে শব্দ শুনতে পাচ্ছ ! কিন্তু ওদের ফ্ল্যাট তো খালি। কেউ নেই। ওরা কয়েকদিনের জন্য কলকাতার বাইরে কোথায় গেছে। জ্বরের ঘোরে ও-রকম অনেক কিছু শোনা যায়। চুপ করে শুয়ে থাকো।"



বঙ্কিমদা হাসতে হাসতে ঘরের বাইরে চলে গেল। গোগোলের মনে পড়ে গেল, তাই তো ! টুকাইরা যে ওর মামাতো দিদির বিয়েতে কয়েকদিনের জন্য কৃষ্ণনগর গেছে। তা হলে কি ও ঠুকঠুক ঘঁসঘঁস কোনও শব্দ শোনেনি ? নেহাতই জ্বরের ঘোরে ভুল শুনেছে ? কথাটা ভাবতেই বেশ স্পষ্ট সেই ঠুকঠুক শব্দ আবার শোনা গেল ! খুব আস্তে শব্দটা হচ্ছে। ঠিক যেন গোগোলের মাথার ওপরেই শব্দটা হচ্ছে। এখন তো ও আর তন্দ্রার ঘোরে নেই। রীতিমত চোখ চেয়ে জেগে শুয়ে আছে। কোনও সন্দেহ নেই। শব্দটা হচ্ছে ওর মাথার ওপরে, ঘরের মেঝেয়। অথচ টুকাইদের ফ্ল্যাটে কেউ নেই !

গোগোল উত্তেজনায় উঠে বসল। আর তৎক্ষণাৎ শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। কী রে বাবা ! যেন ওপরে তন্দ্রা ভাঙা আর উঠে বসার সঙ্গে শব্দ থেকে যাবার একটা যোগ আছে ? ও মুখ তুলে তাকাল। সিলিং পাখা বন্ধ করা আছে। তাকিয়ে দেখে বোঝার কিছুই নেই। নিজেরই সন্দেহ লাগে, সত্যি শব্দটা শুনেছে কি না।

আবার আচমকা বেশ ভারী কিছু পড়ার একটা শব্দ হল। কিন্তু শব্দটা এ-ঘরের মাথার ওপরে মেঝেয় হয়নি। পাশের বা পশ্চিমের ব্যালকনির দিকে ঘরের মেঝেয় যেন শব্দটা হল। বেশ ভারী কিছু যেন হঠাৎ পড়ে গেছে। শব্দটা হল মাত্র একবার। আর কোনও শব্দ নেই।

গোগোল ওপরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। মনেই হচ্ছে না, ওপরের কোনও শব্দ হয়েছে। সব চুপচাপ কিন্তু শব্দ যে হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গোগোল ওর নিজের কানকে এতটা অবিশ্বাস করতে পারে না। আর এই শব্দের অভিজ্ঞতা ওর ছেলেবেলা থেকেই ভারী গোলমেলে। কাশ্মীরে পহলগামে বেড়াতে গিয়ে,



একটা অদ্ভুত গাড়ির ভেতরে ইঁদুরের ঠুকঠুক শব্দ শুনে কী ভয়ঙ্কর ঘটনাই না ঘটেছিল! বিরাট এক ব্যাঙ্ক-ডাকাতির ডাকাতরা আর টাকা সবই ধরা পড়েছিল। এই বাড়িরই ছ'তলায় ডাবুদা'কে যখন চুরি করা হয়েছিল, গোগোল তখন সেই ফ্ল্যাটের ভেতরে একজনের গলার স্বর শুনতে পেয়েছিল। অথচ মহেশানিদের ফ্ল্যাট তখন খালি ছিল। ডাবুদা'কে সেই ফ্ল্যাটেই পাওয়া গেছল।

গোগোলের হঠাৎ মনে হল টুকাইরা ফিরে আসেনি তো? বঙ্কিমদা হয়তো জানে না। কথাটা মনে হতেই, ও খাট থেকে আস্তে-আস্তে নামল। মা টের পেলে খুব রেগে যাবেন। আর ও কী করতে যাচ্ছে, সে-কথা তো মাকে বলাই যাবে না। ওকে বাবার ঘরের মাঝখানে যেতে হবে না। বসার আর খাবার ঘরের পাশ দিয়ে বাবার ঘরে যাওয়া যায়। ও ঘরের দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বসার ঘরের দিকে উঁকি দিল। মা আর রেখামাসিকে খানিকটা দেখা যাচ্ছে। দুজনেই এত ব্যস্ত, এদিকে তাকাবার সময় নেই।

গোগোল ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে বাবার ঘরের দরজায় চলে গেল। বঙ্কিমদা দেখলে মা জেনে যাবেন। ও বাবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বাবার ঘরেই টেলিফোনটা থাকে। টুকাইদের টেলিফোন-নাম্বারও গোগোলের মনে আছে। ওর ধারণা টুকাইরা কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে এসেছে, নইলে ওই রকম শব্দ হতে পারে না। ও টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল করল। টুকাইদের ফ্ল্যাটে টেলিফোন বাজছে। এখন টুকাই ইস্কুলে গেছে। ওর বাবা অফিসে গেছেন। ওর মা বা দিদি টেলিফোন ধরতে পারেন। কিন্তু কেউ টেলিফোন ধরছেন না। বেজেই যাচ্ছে।

গোগোল রিসিভারটা চোখের সামনে তুলে দেখল। আবার কানে চাপল। বাজছে। সন্দেহ হল, ঠিক নাম্বার ডায়াল করেছিল তো? সন্দেহ হতেই, রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার তুলল। ডায়ালের শব্দ হচ্ছে। টুকাইদের নাম্বারটা মনে মনে আউড়ে প্রত্যেকটি নাম্বার ধরে ধরে ডায়াল করল। রিং হচ্ছে। কিন্তু সেই একই ব্যাপার। বেজেই যাচ্ছে। কেউ লাইন ধরছে না। গোগোল বেশ খানিকক্ষণ শুনে, হতাশ হয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল। হয় টুকাইদের টেলিফোন খারাপ আছে। গোগোল শুনতে পাচ্ছে, অথচ ওদের ফোনে বাজছে না। অথবা ওরা সত্যি-সত্যি কৃষ্ণনগর থেকে ফেরেনি। তা হলে যে ভারী মুশকিল!

গোগোল পা টিপে টিপে আবার নিজের ঘরে ফিরে এল। খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করতে দেখলেই মা রেগে যাবেন। ও খাটের ওপর উঠে বসল। আর ভাবল, তবে শব্দগুলো কোথা থেকে এল? ওকি সত্যি ভুল শুনেছে? বসে না থেকে ও আবার শুয়ে পড়ল। এখন কোনও শব্দই শোনা যাচ্ছে না। ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইটা টেনে নিল। সব গল্পই পড়া। মাঝখান থেকে একটা পাতা খুলল। শরদিন্দুবাবুর গল্প একবার-দু'বারের বেশিও পড়া যায়।

পাতা মেলেও গল্প পড়া হল না। আবার শব্দ ! করাত ঘষার শব্দ। খুব আস্তে শব্দটা শোনা যাচ্ছে। করাত যে কাঠের ওপর চলছে না, তা বোঝা যায়। টিন বা লোহার ওপরে খুব আলতো চেপে একটা কিছু চালানো হচ্ছে। আর শব্দটা স্পষ্ট ওর মাথার ওপরেই হচ্ছে। মিনিটখানেক শব্দটা হল। হঠাৎ ওপরের মেঝের ওপর ঠং করে একটা কিছু পড়ে যেন একটু গড়িয়ে গেল, তারপরেই আবার শব্দ বন্ধ। টু শব্দটিও নেই।

গোগোল আবার উঠে বসল। এখনও কি ওর নিজের কানকে অবিশ্বাস করতে হবে ? এও কি জ্বরের ঘোর। এর পরে ওর ওপরে যাওয়া ছাড়া কী উপায় আছে ? ওকে ওপরে গিয়ে দেখতে হবে, টুকাইরা আছে কি নেই। না থাকলে, শব্দ কেন হচ্ছে ? কারাই বা শব্দ করছে ? ইঁদুর, ছুঁচোতে ওই রকম শব্দ করতে পারে না। কিন্তু এ রকম জ্বর নিয়ে, যদি বা বাবার ঘরে যেতে পেরেছিল, ওপরে উঠতে পারবে কি ? অবিশ্যি দরজা খুললেই লিফট। কিন্তু মা যদি দেখতে পান। ও ফ্ল্যাটের বাইরে এক পা-ও বেরোতে পারবে না। তা ছাড়া বেরোতে গিয়ে যদি মাথা ঘুরে পড়ে যায় ?

"কী ব্যাপার গোগোল ?" মা দরজায় উঁকি দিলেন, "বসে কী করছ ? জ্বর-গায়ে তোমাকে আমি শুয়ে থাকতে বলেছি।"

গোগোল কিছু বলতে যাচ্ছিল। রেখামাসি ঘরে ঢুকে খাটের সামনে চলে এলেন। গোগোলের কপালে আর গলায় হাত দিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, "এ কী, জ্বর তো বেশ ভালই রয়েছে। চোখও লাল দেখাচ্ছে। শুয়ে পড়ো গোগোল।"

"গোগোল সত্যি বড় অবাধ্য হয়েছে," মা বললেন, "ইস্কুলে খেলতে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর করেছে। শুয়ে থাকতে বলেছি। দ্যাখ, উঠে বসে আছে।"

গোগোল বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়ল। রেখামাসি বেরিয়ে গেলেন। মা রেখামাসিকে বাইরের ঘরের দরজায় এগিয়ে দিতে গেলেন। আর তখনই আবার ঠুকঠুক শব্দ শোনা গেল। ও কি জ্বরের ঘোরে শব্দ শুনছে ? মা, বঙ্কিমদা, কারও কানেই কি এই হঠাৎ-হঠাৎ শব্দ যাচ্ছে না ? ভাবতে-ভাবতেই ঠুকঠুক শব্দ থেমে গেল। গোগোল ওপরের দিকে তাকাল। কিন্তু সেই করাত চালাবার শব্দটা শোনা গেল।

মা রেখামাসিকে বিদায় দিয়ে ঘরে এলেন। খাটের সামনে গিয়ে গোগোলের কপালে হাত দেবার আগেই বললেন, "চোখ দেখেই অবস্থা বোঝা যাচ্ছে। সেই আগের মতোই একশো দুই জ্বর রয়েছে। আমি চান করে এসে থার্মোমিটার দিয়ে দেখব। ওষুধও খাওয়াব। উঠবে না একদম। শুয়ে থাকবে।"

গোগোল তখন অবাক। মা ঘরে ঢোকামাত্র শব্দটা বন্ধ হয়ে গেছে। ও কিছু বলতে পারল না। মা যেমনি বেরিয়ে গেলেন, আবার শব্দটা শোনা গেল। কিন্তু শব্দ কি কেবল এ-ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে ? মা বা বঙ্কিমদার কানে কি শব্দ যাচ্ছে না ? কয়েকমিনিট অপেক্ষা করে গোগোল উঠে বসল। খাট থেকে আস্তে আস্তে নামল। বুঝতে পারছে, ফ্ল্যাটের বাইরে যাওয়া হবে না। বঙ্কিমদা টের পাবে। একটা হইচই লেগে যাবে। ও আবার বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। টেলিফোনের রিসিভার তুলে একটা নাম্বার ডায়াল করল। সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে একজন ভদ্রলোকের মোটা গম্ভীর স্বর ভেসে এল, "ইয়েস।"

"আমি বাতায়নী বিলডিং-এর বাহান্ন নম্বর ফ্ল্যাট থেকে বলছি।" গোগোল বলল।

ওপার থেকে ভদ্রলোক মোটা গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কে কথা বলছেন আপনি ? কোনও মহিলা ?"

"না। আমি গোগোল বলছি।"

"তোমার গলার স্বরটা এ রকম নাকি-নাকি শোনাচ্ছে কেন ?"

"আমার জ্বর হয়েছে।"

"কী দরকার বলো।"

গোগোল ঘটনাটা বলল। ওপার থেকে মোটা গম্ভীর স্বর ভেসে এল, "জ্বরের ঘোরে এসব শুনছ। ঠিক আছে। যাও শুয়ে থাকো গে। ওসব শব্দ নিয়ে তোমাকে জ্বর-গায়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না।"

গোগোল বুঝল, কিছুই হবে না। ও রিসিভার নামিয়ে রেখে টলতে টলতে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

গোগোল ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমোবার আগে, ও সেই শব্দ শুনেছিল। ঘুমটা ভাঙল প্রচণ্ড জোরে একটা শব্দ শুনে। শব্দটা ওর মাথার ওপরেই হয়েছে। তারপরেই ওদের কলিংবেল বেজে উঠল। আর ওপরেও

তখন ধুপধাপ অনেক শব্দ শোনা যাচ্ছে। ও শুয়ে শুয়েই শুনল, বাইরের ঘরে অনেকের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। তার মধ্যে টেলিফোনে-শোনা সেই গম্ভীর স্বরও। তিনি তখন জিজ্ঞেস করছেন, "কই কোথায় গোগোল ? ওর কাছে আমাকে একবার নিয়ে চলুন।"

মা'র সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন উনিফর্ম-পরা একজন পুলিশ অফিসার। বেশ দশাসই তাঁর চেহারা। গোগোল তাঁকে চেনে। ওদের লোকাল থানার অফিসার ইনচার্জ। তিনি তাড়াতাড়ি খাটের কাছে এসে গোগোলের কপালে হাত দিলেন। বললেন, "ও যে ঘামছে! মিসেস চ্যাটার্জি দেখুন তো জ্বরটা কি ছাড়ছে ?"

মা এসে দেখলেন, গোগোল সত্যি ঘামছে। শিয়রের কাছে রাখা তোয়ালে দিয়ে গোগোলের জামার ভেতরে মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, "এর মধ্যে তুমি আবার কী ঘটিয়েছ ?"

"ঘটিয়েছে খুব মোক্ষম ঘটনাই। থানার ও-সি বললেন, "আপনারা শুনতে পাননি, আপনাদের মাথার ওপরের ফ্ল্যাটে চুপচাপ মস্ত ডাকাতি হয়ে যাচ্ছিল।



একটা স্টিলের আলমারিকে পেট কাটার মতো, মাঝখানে থেকে কেটে ফাঁক করে ফেলেছে। ভেতরে রয়েছে সোনার গহনা নগদ টাকা। আরও অনেক কিছু। গোগোল জ্বরের ঘোরে যেটুকু শুনেছে, তাই আমাকে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছে। জ্বরের ঘোরে হলেও, গোগোলের কানে যখন ঢুকেছে তখন আমি তো ছাড়তে পারিনি। খুব সময়মতো এসে পড়েছিলুম যা হোক।"



গোগোলের বুকের মধ্যে তখন ধকধক করছে। জিজ্ঞেস করল, "মা, আমি একটু উঠে বসব ?"

"বোসো।" মা নিজেই গোগোলকে উঠে বসতে সাহায্য করলেন।

ঘরের মধ্যে তখন অন্যান্য ফ্ল্যাটের অনেক মহিলা, পুরুষ এসেছে, ও-সি তাঁর টুপি খুলে বললেন, "গোগোল জ্বরের ঘোরে তুমি আজ মস্ত বড় ডাকাতি ধরিয়ে দিয়েছ। তুমি সন্দেহ না করলে, কিছু ধরা পড়ত না। দাও, তোমার হাত দাও।"

গোগোল হাত বাড়াবার আগেই ও-সি তাঁর মস্ত বড় হাত বাড়িয়ে গোগোলের হাত ধরলেন,বললেন, "এবার তোমার জ্বর সেরে যাবে। পরে আবার আসব। এখন ডাকাত-মহাশয়দের একটা হিল্লে করি।"

গোগোলের দিকে সবাই অবাক মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিলেন, গোগোল মায়ের কাঁধের কাছে মুখটা গুঁজে দিল। মা ওর মাথায় হাত দিলেন। জানালা দিয়ে তখন বিকেলের রোদ ঘরের মেঝেয় এসে পড়েছে।

ভীষণ যুদ্ধের পরে

মহাশ্বেতা দেবী

বছর দশেকের ছেলেটা, মাথায় রুক্ষ, লালচে চুল। কোমরে থাকে একটা হাফপ্যান্ট আর মাথাটি ঝোঁকে ঝোঁকে ও যখন চলে তখন চার দিকে চেয়ে চেয়ে যায়। শুকনো কাঠকুটো দেখলেই কুড়িয়ে নেয় খপ করে। অনেকদিন ঘোরাঘুরি



করে ও রোহিনী বাজারের দোকানীদের কাছ থেকে একটা নুনের বস্তা পেয়েছে। বস্তাটা ওর সঙ্গের সাথী। এখন ও কাঠকুটো যা পাবে তাই ওতে ভরবে। বাবুদের বাগানও। গাই বাগালি করতে গিয়ে ওর গরু খোঁজে ঘাস, আর ও খোঁজে ঝোড়ো হাওয়ার পোড়ো আম, শুশনি-কলমি শাক, মেটে আলু। সব ও তুলে তুলে বস্তাটায় ফেলে।

বাজপাখির মত ধারালো চোখ ওর

বাবুদের গরু নিয়ে ও ডুলং-এর একটুখানি জল পেরিয়ে চরে ওঠে। চরের ঘাসে গরু চরে আর খায়। ও এই চর পেরিয়ে দৌড়ে যায় সুবর্ণরেখার জঙ্গলে। এখানে ডুলং নদীর এক ধারা। সুবর্ণরেখার দুই ধারা। তিনটি স্রোত, দুটি চর। আরো উজিয়ে গেলে সুবর্ণরেখা আর ডুলং হাত ধরাধরি করে নেচে চলেছে।

ছেলেটা সুবর্ণরেখার জলে ধোচনা পেতে রেখে যায়। ধোচনা হ'ল বাঁশে বোনা খাঁচা জাল। ধোচনার ফাঁদে মাছ পড়ে কাঁদে। ছেলেটা যদি মাছ পায় গুঁড়ো কুচো তাহলে মহা নিশ্চিন্ত। তখন ও মাথা ঝেঁকে ঝেঁকে আঙ্গুলে গোনে,—শাক তুলেছি, শাক খাব। কুচো মাছ টক খাব। মেটে আলুটা দোকানে দেব, নুন তেল নেব।

তারপর, একা একা তিনটে নদী, দুটো চর, গাইগরু আর ঘাস কাশকে শুনিয়ে ও গল্প বলে মাথা নাচিয়ে নাচিয়ে,—তারপরে না, যুদ্ধ হ'ল ! সে কি ভীষণ যুদ্ধ, কি যুদ্ধ ! তীর চলেছে শন্ শন্। কামান হাঁকছে দম দম। ঘোড়া ছুটছে খট খট সে কি যুদ্ধ।

যুদ্ধ আর যুদ্ধ। কিসের যুদ্ধ কাদের যুদ্ধ, কেন যুদ্ধ কিছু জানে না ছেলেটা। শুধু জানে যে ভীষণ যুদ্ধ হ'ল।

কেন যে ছেলেটা শুধু যুদ্ধেরই গল্প বলে, আকাশ-বাতাস, কাশ-তিনটে-গাইবাছুর আর কালো-সবুজে জেব্রা ফড়িংদের, তা কেউ জানে না, কেননা কেউ গরু-বাগাল ছোট ছেলেদের কথা ভাবতে সময় পায় না।

ছেলেটা কেন যুদ্ধের কথা বলে তা জানতে হলে ছেলেটার সকাল থেকে কিছুক্ষণের রুটিনটা জানতে হবে।

কাক ভোরে ও ওঠে আর ওদের অসম্ভব নীচু ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে। খুব অধৈর্য হয়ে পুব আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। সূর্যকে যেন ও বলতে চায়, উঠে পড়ো বন্ধু, তুমি আর আমি, আমাদের তো ছুটিছাটা নেই। দেরি করছ কেন ?

এই সময় ও ছুটে যায় ডুলং নদীর ধারে। সেখানে যায় কেন বল তো ? নদীর জল আর নদীর পাড় ওর বাথরুম। ওর মত অনেক মানুষের।

ঘুম চোখ ধুয়ে একছুটে ফিরে এসে ও ঘর থেকে ছাগল দুটোকে বের করে উঠোনে কাঁঠালগাছের সঙ্গে বেঁধে দেয় অনেক কাঁঠালপাতা আর জল রাখে। বেলা হলে ওর বন্ধু যখন ছাগল চরাতে যাবে, এ দুটোকে নিয়ে যাবে।

তারপর ওর মস্ত ঘরে আবার ঢোকে। খুব বড় ঘর। কেন না দুদিকে দেয়াল ভেঙে আকাশ ও মাঠ দেখা যাচ্ছে। তাতেই ছোট ঘরটা খু-ব বড় হয়ে গেছে। ওর ঘরে রাতে চাঁদ আর দিনে সূর্য বাঁধা আছে। কেন না ঘরের চাল ভাঙা। সে ফোকর দিয়ে জ্যোৎস্না আর রোদ যে যার সময়ে খেলা করে ডিউটি দিয়ে চলে যায়। এই ঘরে ওর রাজপালঙ্ক হ'ল এক বাঁশের মাচা। সে মাচাতে চাটাইয়ের ওপর কাঁথার ডানলিপিলো। মাচার নীচে ঢুকে ও এক খোরা পান্তা ভাত বের করে। খানিক ঢেলে নিয়ে হুশহাশ করে খেয়ে চলে যায় কাজে।

কত যে কাজ ওর থাকে। বাবুদের বাড়ি কত বড়। পাথরে বাঁধানো মস্ত উঠোন। বাবুদের পূর্বপুরুষ তৈরী করেছিল বাড়ি। বড় বড় চৌকো পাথর কোথা থেকে কারা এনেছিল ? বাবুদের হাতি রাখার জন্যে পাথরের এক খুব উঁচু থাম দেয়া ঘর ছিল। বর্ষায় বা শীতে হাতি থাকবে কোথায় ?

সে-ই হাতিঘরের চারিদিকে দেয়াল গেঁথে তুলে বাবু ধান রাখে। পূর্বপুরুষের তৈরী পাথরের একতলা বাড়ির ঘরে ঘরে ধান-চাল-কলাই। বাবু নতুন বাড়ি তুলে নিয়েছে।

এই মস্ত উঠানটা ঝাঁট দেয় ছেলেটা ছুটে ছুটে। দেউড়ি ঝাঁট দেয়। টিউবওয়েলের জল নিয়ে দেউড়ি ফটকের সামনে ছিটোয়। বাগানে জল দেয়।

এত কাজ সারা হলে তারপর ও গরুবাছুর নিয়ে বেরোয়। গরুবাছুর নিয়ে যাবার পথ ওর গ্রামের বেসিক প্রাইমারি স্কুলের পাশ দিয়ে। স্কুলের নতুন মাস্টার ছেলেদের রোজ গল্প বলে। গল্প বলে খানিকক্ষণ, তারপর পড়াতে থাকে।

গল্পটা যে মহাভারত, তা ছেলেটা জানে না। ও শুধু একটু শোনে, তখন ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। খুব তীর চলল, খুব যুদ্ধ।

একদিন মাস্টার বলল, সিপাহী যুদ্ধের কথা। কি বলছে তা তো ছেলেটা জানে না। ও শুধু শুনল, তখন ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। খুব কামান ছোঁড়া হ'ল।

মাস্টার ওর ঝকঝকে চোখ আর জিজ্ঞাসা ভরা চোখ পড়তেই ও মাথা ঝেঁকে ঝেঁকে চলে যায়। কাঁধে বস্তাটাই থাকে।

বস্তাটা নিয়ে ও ভীষণ যুদ্ধই করে। রোজ শাকটা, মাছটা, কাঠকুটোটা নিয়ে ও বস্তায় ভরে, গরুর পিঠে

চাপায় আর ঘরে নিয়ে আসে।

কি যত্ন যে করে বস্তাটাকে, তা যদি দেখতে। ডুলংয়ের জলে বস্তা কাচে আর গাছের ডালে ডালে শুকোয়। বর্ষার জলে বস্তাটা ওর জল আটকাবার বর্ষাতি। শীতকালে বস্তাটা ওর লেপ।

বিকেল হলে ও বাবুর বাড়িতে বসে চারটি মুড়ি খায়। তারপর গরুবাছুরকে খেতে দিয়ে গোয়ালে তুলে দিয়ে, গোয়ালে সাঁজাল দিয়ে তবে ওর ছুটি।

তখন ও বস্তাটা নিয়ে ঘরের দিকে ছোটে। বাপ রে বাপ এখনি তো ওর আসল কাজ। ঘরে বসে থাকে ওর দাদু।

দেখ কি কাণ্ড। না বলেছি ছেলেটার নাম, না বলেছি ওর দাদুর নাম।

ওর দাদুর নাম মতিরাম। ওর নাম পতিত। ওরা জাতে মুণ্ডা। মুণ্ডা মানে আদিবাসী। তবে পতিত নিজের ভাষা, যার নাম মুণ্ডারী ভাষা তা জানে না।

মতিরাম বসে থাকার মানুষ নয়। আদিবাসীরা যত বুড়ো হোক, বসে থাকে না। মতিরাম বসে থাকার মানুষ নয়। কিন্তু পতিত যখন এতটুকু ছেলে, কলেরায় ওর বাবা আর মা মরে গেল। সে ভারি এক অবাক কাণ্ড!

ওরা ছত্রিশজন লোক জেলে গিয়েছিল। বছরের পর বছর যে বাবুর জমিতে বর্গা করে, সেই বাবুর জমির ধান লাগাতে গিয়েছিল। বাবু যে ওদের কিছু জানায়নি আর শহরে বসে আরেক বাবুকে জমিজমা বেচে দিয়েছে, তা তো কেউ জানে না।

নতুন বাবু বলল, আরে! এরা কে এসে আমার ক্ষেতে ধান চারা রুইতে লেগেছে বাবু? আমি তো জানি না।

এ হল গে, আট নয় বছর আগেকার কথা। নতুন বাবুর কথায় পুলিশ সকলকে জেলে নিয়ে গেল। ঘরে ফেরার সময় কোন মেলায় পচা খাবার খেয়ে কলেরা হয়ে পতিতের বাপ মা মরে গেল।

মতিরাম বলল,—ঠিক আছে। আমি কাজ করে নাতিকে মানুষ করব।

মতিরামই এখানে চলে আসে আর বাবুদের বাড়ী কাজ নেয়। বাবু অবশ্য বলত,—মতিরাম! তোর নাতিটাকে দে। বাগানের কাজ করবে।

—না বাবু। তা হবে না।

কেন রে?

—আমার জনম গেল বাগালি কাজ করে আর পরের জমিতে খেটে। ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখাবার বড় ইচ্ছে ছিল। তা ছেলের মা মরে গেল। বাবু তো একা আমাকে খেতে দিত। বাড়িতে ভাতটা আনতে দিত না। ছেলেটা কি খায়? সে লাগল বাগালি কাজে। তাতেই তার লেখা-পড়া শেখা হ'ল না।

—সে তো ভালই করেছিলি।

—কি ভাল করলাম বাবু?

—ছেলেকে যে বাগালি কাজে দিলি!

—কেন? খেতে পায়নি, তাতেই তো সে গিয়ে বাগাল হ'ল, না কি বল?

—খেতে তো পেত!

—মুড়ি…পান্তা…

—নাতিটাকে দে।

—না বাবু। নাতিকে আমি লেখাপড়া শেখাব। আমি জানতাম না লেখাপড়া, তাতেই না জমি চলে গেল। কত কষ্ট করলাম সারা জীবন।



—লেখাপড়া শিখাবি? তোদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখলে আমাদের কাজগুলো কে করবে?

—না বাবু, ওকে কাজে দেব না।

খুব জেদ ছিল মতিরামের। ওর যখন ভারি অসুখ হ'ল, হাসপাতাল যেতে হ'ল। সে সময়েই পতিত হ'ল বাবুর বাগাল।

ফিরে এসে মতিরাম পতিতকে খুব মেরেছিল। বলেছিল তোর বাবা যখন তোর মত ছোটো, তখন এত ইস্কুল ছিল না? এখন গ্রামে গ্রামে ইস্কুল হয়েছে, তুই পড়বি না?

সুবল সিং, এক বুড়ো মুণ্ডা, সে মতিরামকে খুব বকেছিল। বলেছিল,—মতিরাম! এখন তো শরীর

খারাপ। পরিশ্রমের কাজ তুই পারবি না। ছেলেটা পড়বে যে, খাবে কি ?

এ সব কথার কি জবাব হয় ? মতিরাম আর কিছু বলেনি। রাগের চোটে ওর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল। ও বলল,—বেশ ! বাবু যা বলেছিল তাই হ'ল তো ? আমাদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখলে বাবুদের কাজ চলে না। তাই হোক, তাই হোক।

যেন কেমন হয়ে গেল মতিরাম। এখন কাজের মধ্যে ঘরে বসে খেজুর পাতার চাটাই বোনে আর হাটে বেচে। ও কেনে চাল। পতিত আনে তেল নুন।

আজ, পতিত ঘরে ফিরতে মতিরাম বলল,—মাস্টারটা এসেছিল। তোকে ইস্কুলে পাঠাতে বলে।

—তুই কি বললি ?

—আমি বললাম, ইস্কুলে যাবে তো খাবে কি ? বাতাস খেয়ে থাকবে ?

—কি বলল ?

—আর কি বলবে ?

—আমি তো পড়তে চাই।

আর কথা বলল না পতিত। কাজ তো ফুরায় না ওর। এখন টিউবওয়েল থেকে জল আনবে, রান্না করবে। রান্না তো হয় রাতে। সকালে পান্তা খাও, সারাদিন চুপ করে থাকো।

রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল, ভীষণ একটা যুদ্ধ হচ্ছে আর পতিত নিজেও খুব লড়ছে।

পরদিন মাস্টার ওকে ধরে ফেলল।

—এই, শোনো শোনো।

—কি বাবু ?

—তুমি ইস্কুলে আস না কেন ?

—কেমন করে আসব ?

—তুমি আস না, তোমার মত আরো কয়েকটা ছেলে আসে না।



আমরা যে বাগাল গো !

পড়লে পরে টাকা পাবে, মাইনে লাগবে না।

পতিত এ কথার জবাবে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ল খানিকটা। তারপর বলল,—যুদ্ধ যুদ্ধ বল তুমি, যুদ্ধটা কোথায় হয়, না কি হয়ে গেছে ?

মাস্টার ওর চোখের দিকে চেয়ে দেখে। চোখ নয়তো হীরের ছুরি।

—যুদ্ধ তো অনেকই হয়েছে রে।

—এখন আর হয় না ?

—হলে কি করবি ?

পতিত হাসল। তারপর বলল,—তুমি তো রেঁধে খাও। মেটে আলু খাবে ? বেশ খেতে।

—তুই স্কুলে আয়, তখন নেব। ছাত্র দিলে নিতে পারি, নইলে নেব কেন ?

পতিতের চোখ দিয়ে মেঘ ভেসে চলে যায়। সে বলে,—দাদু তো পড়তে বলত।

—তাহলে ?

—আমি গিয়ে বাগাল হলাম।

—কেন ?

—দাদুর অসুখ হইছিল। খুব অসুখ।

এতেই ওর সব কথা বলা হয়ে যায় যেন। মাথা ঝেঁকে ঝেঁকে চলে যায় ও। ওর দিকে চেয়ে খুব কমবয়েসী মাস্টারটি বোঝে যে পতিতও মস্ত একটা যুদ্ধ করছে, শুধু ও তা জানে না।

মুণ্ডাপাড়ায় প্রৌঢ়া আলোমণি সারাদিন অন্যের ক্ষেতে খাটে। বিকেলে ও মাস্টারকে খাওয়ার জল এনে দেয়। স্কুলের আঙিনায় মাস্টারের একাখানা ছোট ঘর। মাস্টার তাকে "মাসি" বলে। আলোমণি খুব শক্তপোক্ত মানুষ।

—মাসি, পতিত পড়ে না কেন ?

—পড়লে তাকে কে খাওয়াবে ?

তোদের ছেলেমেয়েরা পড়বে না, সরকারের ব্যবস্থা যে বিফলে যায়।

—তুই কি বুঝবি ?

—পড়লে পরে ভালো কত।

—সে তো জানি। আমাদের ছেলেগুলো আজ বাগাল, কাল ক্ষেতমজুর, বাস ! জনম শেষ। পড়লে তো ভালো। কিন্তু খেতে দেব কি ? বাগালি করে, দুটো ভাত মুাড় পেল, মাসে পাঁচটা টাকা আনল। তাতে সংসার বাঁচে। আমরা সংসার বাঁচাই আর ছেলেদের চোখ রইতে কানা করে রাখি, এ কি সাধ করে করি ?

পরদিন পতিতকে ডেকে মাস্টার বলে,—দেখ্, যুদ্ধের কথা ভালবাসিস, এই ছবিটা দেখ।

কার ছবি ?

—বীরসা ভগবানের। নাম জানিস ?

না তো।

তোর জাতের লোক। মুণ্ডা। খুব যুদ্ধ জানত আর যুদ্ধ করেই মরে যায়। পড়তে এলে পতিত সব জানতে পাড়তিস। নিজেই পড়তিস।

আজ আর পতিত নদীর চরে গিয়ে অন্য কথা বলে না। দুই হাত ছাড়িয়ে চরের ওপর দিকে দৌড়ে চলে যায়। রিনরিনে গলায় আকাশ-নদী-ঘাস কাশকে বলে যায়। জাতের লোক বীরসা ভগবান। ভীষণ যুদ্ধ করেছিল, ভীষণ যুদ্ধ।

পতিতের আনন্দ দেখে ডুলংয়ের ঘোলাজল সুবর্ণরেখাকে বলতে চায় গল্পটা। ছুটে চলে যায় কলকল শব্দে। নদীর ওপার থেকে রামেশ্বরের মন্দিরটা ঝুঁকে পড়ে সে কথা শোনে। ডোরা কাটা ফড়িংরা পাখনা কাঁপিয়ে উড়ে যায়।

সন্ধেবেলা পতিত মতিরামকে বলে,—দাদু ! বীরসা ভগবানের নাম জান ?

—সকল মুণ্ডা জানে।

—কি করেছিল সে ?

—তা তো জানি না ! নামটা জানি ।

পতিত ভাত নিয়ে নাড়েচাড়ে । তারপর বলে,—আমি পড়তে যাব ।

—কেন ?

—এখন তোমার অসুখ নেই । ইস্কুল হয়ে গেলে উঠানে লঙ্কার গাছ করব । রোহিনীর হাট কত বা দূর, বেচে আসব তরকারি । পড়ব আমি ।

মতিরাম ওর দিকে চেয়ে থাকে । তারপর শুকনো গলায় বলে,—দেখব ।

—বল পড়তে দিবে ?

পতিত ! তুই জানিস না, দেখিস নাই কখনো । আমাদের সমাজের সভা হবে । সেথা কথাটা উঠাই । পাঁচবলা কি বলে তা দেখি ?

—সভা হবে ? আমি দেখব ?

—যাবি ? নিয়ে যাব ।

পতিত সমাজের সভায় যাবে সেদিন বাগালি করবে না শুনে বাবু বেজায় রেগে যায় । রাগটি সে মনের মধ্যে চেপে রাখে ও বলে,—এ আবার কি কথা রে তোদের ? শুনে যে হেসে বাঁচি না । জংলী ভূত তোরা, তোদের



আবার সমাজ ! তোদের আবার সভা ।

পতিত বাবুকে কিছু বলতে পারে না । কোনোদিন বলেনি, চট করে বলতে পারে না । কিন্তু বাড়ি এসে গোঁজ হয়ে থাকে । সবসময় যে পতিত বড়দের মত কাজকর্ম করে, সে হঠাৎ ছোট ছেলে হয়ে যায় । দাদুকে বলে,

—আমরা জংলী ভূত ?

—কে বলেছে ?

—বাবু ।

—না পতিত । আমরা কেন জংলী ভূত হব ?

—লেখাপড়া শিখি না, ভাঙা ঘরে থাকি, তাতে বলল ? রং কালো, তাতে বলল ?

—ভূত হলে ভূত আছি। ভূত ছাড়া তো তাদের গরু চরানো, মাঠে ধান চাষ, কোনো কাজ হয় না।
—আমি যাব না বাবুর বাড়ি আর।
—বুঝেছি। চল্, গিয়ে সাবান কিনি, সোডা আনি। কাপড়টা তো কাচতে হবে। সমাজে যাব বলে কথা।
সবাই ওরা সমাজের সভায় চলে। যে যা খাবে মুড়ি ছাতু, ভাত, বেঁধে নিয়ে নিলো। গরিবের সমাজসভা। যে যার খাবার খাবে। আলোমণিরাও এসে পড়ে।
কত বড় সভা, কত লোক। পতিত অবাক হয়ে দেখে। তার দাদু গরিব বলে কেউ হেলা করছে না। কতজন কথা বলছে। কেউ বলল,—নাতি বুঝি ? মুখ দেখলে বলে দিতে হয় যে কার ছেলে। এ যেন মাণিকচাঁদকেই দেখছি।
তারপর পতিতের অবাক চোখের সামনে একটা মস্ত ছবি তুলে ধরা হয়। বাঁশের চাটাইয়ের ওপর কাগজ এঁটে তাতে মোটা তুলিতে আঁকা কি সুন্দর চেহারা, কি রকম পাগড়ি বাঁধা মাথায়, চোখ যেন জ্বলছে আলোর মত।
বীরসা ভগবান ! বীরসা ভগবান ! ভীষণ যুদ্ধ করেছিল ! !—পতিত চেঁচিয়ে ওঠে।
তার গলা ছাপিয়ে কয়েক হাজার গলা বলে ওঠে,—জয়ার বীরসা ভগবান !
পতিতের বুক ভরে ভরে ওঠে। জংলী ভূত ! জংলী ! জংলী ভূতদের এমন বীরসা ভগবান থাকে না কি ? দাদুর হাত ধরে ও দেখতে থাকে আর মাথাটা খুব উঁচু হয়ে যায়। কক্ষনো ওরা জংলী নয়, আর বাগাল হয়ে থাকাই ওদের কাজ নয়। কেন ওরা ভাঙা ঘরে থাকে, কেন দাদুর ধুতিটা এমন ফুটিফাটা, সব পতিত একদিন জেনে ফেলবে। সব জেনে ফেলবে ও। বুকের মধ্যে কি যেন তোলপাড় করে। যেন ডুলং আর সুবর্ণরেখা এ-ওর বুকে ঝাঁপাচ্ছে। গেরুয়া জলে বান ডেকেছে। সেই যে সমাজ—সভায় যায় পতিত, আর সে বাবুর বাড়ি যায় না। বাবু তো বেজায় লাফঝাঁপ জুড়ল। বেটা বাগাল এমন কামাই করছে ? দেখাব মজা।
কাকে মজা দেখাবে, কে দেখাবে ? গণ্ডগ্রাম, গণ্ডগ্রাম। খড়্গপুর থেকে গুপ্তমণি বাসে এসো। আবার বাসে চড়ো। নামো গিমড়াতলা। তারপর পায়ে হেঁটে ধানক্ষেতের আল ধরে চার মাইল। তবে পৌঁছবে গ্রামে।
বাবুরা ছয় ঘর। বাকি সব তো ওরাই। ঘরে ঘরে বাগাল ছেলেগুলো গরহাজির। পতিতের বাবু শেষে মতিরামের কাছে গেল।
—ব্যাপার কি মতিরাম।
—কিসের ব্যাপার ?
—পতিত যে গেল না ?
—পতিত আর যাবে না। সে ইস্কুলে গেছে। ইস্কুলে গেলে টাকা পাবে, খেতে পাবে। বইখাতা পাবে। ও পড়বে।
—বটে !
বাবু রেগে উঠল, ইস্কুলে গেলে কি রাজা হবে ?
—তা কেন ? মানুষ হবে।
—এ তোদের ষড়যন্ত্র। ঠিক আছে। ক্ষেতক্ষামারের কাজও তোদের দেব না আর।
মতিরাম হেসে বলল,—বাইরে থেকে লোক আনবে ? স-ব আমাদের সমাজের লোক। কেউ কাজ করতে আসবে না। আমাদেরি নিতে হবে। জংলী ভূত তো আমরা। আমাদের মধ্যে মিলমিশ খুব বেশি ?
বাবুর মুখ চুন হয়ে গেল।
আজ পতিতের আনা মেটে আলুটা মাস্টার নিল। নেবে না কেন বলো ? পতিত তো ওর ছাত্র। ছাত্র কোনো জিনিস দিলে মাস্টার নেবে না ?
ইস্কুল ছুটি হলে পতিত একাই ছুটে চলে গেল নদীর চরে। ঘোলা জলে চিত হয়ে ভাসতে ভাসতে ও নীল আকাশকে হেঁকে বলল,—তারপর না ? ভীষণ যুদ্ধ হ'ল।
ডুলং নদীর জল। ঝুঁকে পড়া ঘাসবন সবাই যুদ্ধের কথা শুনতে শুনতে রোদ মেখে হেসে কুটিপাটি হ'ল। পতিতটা কি বোকা, কি বোকা ! ইস্কুলে গিয়ে ও যে নিজেই একটা ভীষণ যুদ্ধে জিতে গেছে তা ও নিজেই জানে না।

সত্যি ভূত মিথ্যে ভূত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সেদিন সন্ধ্যায় ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি ঝরছে।

টেবিলবাতির আলোয় জম্পেশ করে একখানা গপ্প লেখার জন্য কলম বাগিয়ে ধরেছি, এমন সময় কলিং বেল বাজল। বাজল বলা ভুল, বাজতে লাগল।

লেখার মুড নষ্ট হলে সব লিখিয়েই খাপ্পা হন। খাপ্পা হয়ে উঠে গেলুম। কলিং বেল একবার বাজনোই তো যথেষ্ট। অন্তত এই কথাটা বলেও মনের ঝাল ঝাড়ব, আগন্তুক যেই হোক না কেন।

দরজা খুলে দেখি, ঢ্যাঙা কেঠো চেহারার প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক! পরনে সাদাসিধে ধুতিপাঞ্জাবি। মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি-গোঁফ এবং মিটিমিটি হাসি। কিছু বলার আগেই করজোড়ে নমস্কার করলেন। "আপনিই কি বিখ্যাত লেখক নকুড় চন্দ্র গুঁই? আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথাবার্তা আছে।"

'বিখ্যাত' কথাটায় প্রশংসা ছিল। আর প্রশংসা শুনলে কোন লেখক না খুশি হন? আমিও খুশি হলুম বৈকি।



অমন করে বেল বাজানোর কৈফিয়ত চাইতেও ভুলে গেলুম। তাছাড়া 'জরুরি কথাবার্তা' ব্যাপারটাও আশাব্যাঞ্জক। ভদ্রলোক নিশ্চয় কোনও প্রকাশক। তাই খাতির করে বললুম, "আসুন, আসুন। ভেতরে এসে বসুন। তারপর কথাবার্তা হবে।"

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে সোফায় বসলেন। তারপর হাই তুলে বললেন, "আপনি তো ভূতের গপ্প লেখেন ?"

একটু হেসে বললুম, "মাঝেমাঝে দুচারটে লিখি। তা আপনি কি—"

ভদ্রলোক আমার কথায় বাধা দিয়ে বললেন, "আমার কথা পরে হচ্ছে। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন।"

এবার একটু অবাক হয়ে বললুম, "কী আপনার প্রশ্ন ?"

"ওই যে বললুম, আপনি ভূতের গপ্প লেখেন, আপনি কি কখনও ভূত দেখেছেন ?"

বিরক্তি চেপে বললুম, "লেখকরা যা লেখেন, কল্পনা করেই লেখেন। ভূতের গপ্প লিখতে হলে স্বচক্ষে ভূত দেখতেই হবে, এটা কোনও যুক্তি নয়।"

"তার মানে আপনি বানিয়ে লেখেন ! সুতরাং আপনি মিথ্যা কথা লেখেন। আপনি একজন মিথ্যুক !"

খাপ্পা হয়ে বললুম, "কী যা তা বলছেন আপনি ?"

ভদ্রলোক বাঁকা হেসে বললেন, "ঠিকই বলছি। আপনি জানেন চীনে, ভূতের গপ্প লেখা মানা ? লিখলেই জেলে ঢুকিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, জেলে ঢুকিয়ে মেথরের কাজ করিয়ে ছাড়ে।"

"চীনে কি হয়, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আর দেখুন, আমার সময়ের দাম আছে। আপনি আসুন।"

ভদ্রলোক আমাকে গ্রাহ্য করলেন না। বললেন, "ঢুকে যখন পড়েছি, তখন সহজে বেরুচ্ছিনে—অন্তত একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া যতক্ষণ না হচ্ছে।"

গলার স্বর আর কথার ভঙ্গিতে একটু দমে গিয়ে বললুম, "কী মুশকিল ! বোঝাপড়াটা কিসের ?"

"ভূতের ব্যাপারে।"

"বুঝলুম না।"

"আপনি—মানে আপনার মতো যাঁরা ভূত নিয়ে গপ্প লেখেন, তাঁরা কেউই ভূত দেখেননি। অথচ ভূত নিয়ে গপ্প লেখেন। আপনারা মিথ্যুক আপনাদের চীনা শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।"

"বেশ। গভর্মেন্টকে বলুন ব্যবস্থা করতে।"

"গভর্মেন্টকে বলে কিস্যু হবে না।" ভদ্রলোক পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করে নাকে একটিপ নস্যি গুঁজলেন। তারপর বিকট একখানা হাঁচি হেঁচে বললেন, "ভূতেদের না দেখে ভূতের গপ্প লেখা অন্যায়। কারণ এতে খামাকা ভূতেদের ডিসটার্ব করা হয়। চীনারা এটা বুঝেছে বলেই শাস্তির ব্যবস্থা করেছে।"

"ভূত না দেখে ভূতের গপ্প লিখলে ভূতেদের ডিসটার্ব করা হয় বলছেন। কথাটা বুঝলুম না।"

"খুব সহজ কথা। যাদের স্বচক্ষে দেখেন নি, তাদের কথা লিখছেন। তার মানে আপনি তাদের সম্পর্কে ভুলভাল ইনফরমেশন দিচ্ছেন। তারা যা নয়, তাই লিখছেন। তার মানেটা দাঁড়াচ্ছে, আপনি সত্যের অপলাপ করছেন।"

"তাহলে আপনি বলছেন সত্যিসত্যি ভূত আছে ?"

"আলবাৎ আছে। আপনারা তাদের সম্পর্কে যা লিখছেন, তা কখনও সত্যিকার ভূতের কথা নয়। স্রেফ নকল ভূতের কথা। আপনারা পাঠকদের ঠকিয়ে পয়সা কামাচ্ছেন।"



একটু হেসে বললুম, "দেখুন, গপ্প মানেই তো তাই। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার—"

ভদ্রলোক রেগে গিয়ে বললেন, "কোথায় বাস্তব ? বাস্তবের ব-টুকুও তো দেখেন নি !"

"আহা, দেখিনি। কিন্তু শুনেছি। সবই যে স্বচক্ষে দেখে লিখতে হবে, তার মানে নেই। ধরুন, সম্রাট অশোককে আমি স্বচক্ষে দেখিনি। কিন্তু তাঁকে নিয়ে গপ্প লেখা যাবে না ?"

"সম্রাট অশোক আর ভূত এক জিনিষ নয়।"

"দেখুন, এ নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছে আমার নেই। আপনি দয়া করে আসুন।"

ভদ্রলোক আগের মতো বাঁকা হেসে বললেন, "একবার ঢুকে যখন পড়েছি, হেস্তনেস্ত না করে সহজে বেরুচ্ছিনে।"

খাপ্পা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, "পুলিশকে ফোন করব বলে দিচ্ছি।"

"করুন।" ভদ্রলোক ফের হাই তুলে বললেন। "তবে আপনাকে একটা সুপরামর্শ দিতেই এসেছি। ভূতের

গল্প লিখতে হলে সত্যিকার ভূত আগে দেখা দরকার। তাদের সম্পর্কে রং ইনফরমেশন দিয়ে গুলতানি ঝাড়া অত্যন্ত অন্যায়। এতে ভূতেদের অপমান করা হয়।"

চার্জ করার ভঙ্গিতে বললুম, "সত্যিকার ভূত বলে কিছু নেই। ভূতপ্রেত মানুষের সেন্টপার্সেন্ট কল্পনা।"

"কল্পনা—সেন্টপার্সেন্ট ?"

"আলবাৎ সেন্টপার্সেন্ট।"

সত্যিকার ভূত নেই ?"

"না। নেই ?"

"দেখতে চান ?"

"চাই। দেখান।"

"দেখতেই তো পাচ্ছেন।"

"তার মানে ? কোথায় দেখতে পাচ্ছি ?"

"আপনার চোখের সামনে।"

না হেসে পারা গেল না। বললুম, "তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন যে আপনিই ভূত ?"

"ঠিক ধরেছেন।"

"কিন্তু আপনি যে ভূত, তার প্রমাণ ?"

"প্রমাণ আছে বৈকি। তবে এত সহজে, চাওয়ামাত্র প্রমাণ দিলে কি চলে ? আপনাকে যদি কেউ চার্জ করে বসে যে, 'আপনিই নকুড়চন্দ্র গুঁই, তার প্রমাণ দিন,' আপনার আঁতে ঘা লাগবে। প্রেস্টিজ বলে একটা কথা আছে না ? যখন তখন যে-কেউ প্রমাণ চাইলেই তো দেওয়া যায় না। ভূতেরও প্রেস্টিজ আছে।"

"বোঝা যাচ্ছে, আপনি একজন বদ্ধ পাগল। পুলিশকে খবর না দিয়ে উপায় নেই দেখছি।"

রেগেমেগে পাশের ঘরে গিয়ে থানায় রিং করলুম। কিছুক্ষণ রিং হবার পর ঘ্যানঘেনে গলায় সাড়া এল। তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললুম, "আমার ঘরে জোর করে একটা লোক ঢুকে পড়েছে। কাইগুলি কেউ এসে একটা ব্যবস্থা করুন।"

"হাতে অস্ত্রটস্ত্র আছে নাকি ?"

"না।"

"টাকাপয়সা দাবি করছে কি ?"

"না, না। ব্যাপারটা হল, লোকটা বদ্ধ পাগল।"

"তাই বুঝি ? তাহলে কোন মেণ্টাল হসপিটালে খবর দিন।"

"কী আশ্চর্য !"

"আশ্চর্য কিসের ? পাগলটাগলের হ্যাপা সামলানো পুলিশের ডিউটির মধ্যে পড়ে না।"



"কাইগুলি কথাটা শুনুন আগে।"

"বলুন।"

"লোকটা বলছে সে একজন ভূত।"

"তাহলে ভূতের রোজা ডাকুন !"

"আপনারা কেউ আসবেন না তাহলে ?"

"সরি। এটা পুলিশের ডিউটির মধ্যে পড়ে না।"

ফোন রাখার শব্দ হল। কী করব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টারে আমার পরিচিত এক অফিসার আছেন। বরাতজোরে তাঁকে পাওয়া গেল। ব্যাপারটা শুনে প্রথমে একচোট হাসলেন। তারপর বললেন, "এখনিই যাচ্ছি, ভাববেন না। ওকে কথাবার্তা বলে-টলে জাস্ট মিনিট পাঁচেক আটকে রাখুন।"

বসার ঘরে ফিরে দেখি, ভদ্রলোক চোখ বুজে যেন ঘুমোচ্ছেন। পুলিশ আসছে, অতএব আমি এবার বেপরোয়া। বললুম, "ও মশাই ! শুনছেন ?"

চোখ বুজে যেন ঘুমের মধ্যে বললেন, "শুনেছি।"

"লালবাজার থেকে পুলিশ আসছেন। এখনও বলছি, আপনাকে বিপদে ফেলতে আমি চাই নে। আপনি

কেটে পড়ুন।

একই অবস্থায় থেকে বললেন, "কে আসছে বললেন?"

"লালবাজারের ক্রাইমব্র্যাঞ্চের ইনস্পেক্টর বঙ্কুবিহারী ধাড়া।"

ভদ্রলোক চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। মুখে হাসি। "বঙ্কু আসছে বুঝি? বাঃ! খুব ভাল, খুব ভাল।"

অবাক হয়ে বললুম, "ভাল মানে? ওঁকে চেনেন আপনি?"

"খুব চিনি। বঙ্কু আর আমি ছেলেবেলার বন্ধু।"

"চালাকি করবেন না!"

"চালাকি কী সত্যি," বলে ভদ্রলোক আবার চোখ বুজলেন এবং আগের মতো সোফায় হেলান দিলেন। ঘুমজড়ানো গলায় স্বগতোক্তি করলেন, "সারারাত সারাদিন মাইকের চোটে ঘুমোতে পারিনি। বড্ড ঘুম আসছে।"

মিনিট দুই পরে কলিং বেল বাজল। এত শীগগীর এসে পড়লেন মিঃ ধাড়া! খুব খুশী হয়ে দরজা খুললুম। মিঃ ধাড়া সহাস্যে বললেন, "আছে, না পালিয়েছে?"

"আছে। ঘুমোচ্ছে।"

বঙ্কুবিহারী ধাড়া ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। তারপর প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "মুরারি না? কী কাণ্ড!"



ভদ্রলোক চোখ খুলে হাই তুলে বললেন, "আয় কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা!"

মিঃ ধাড়া তাঁর পাশে বসে কাঁধে হাত রেখে বললেন, "তুই আছিস কোথায় এখন?"

"মধ্যমগ্রামের ওদিকে। আজকাল যা অবস্থা, ডেরা খুঁজে পাওয়াই প্রব্লেম!"

"আমারও একই প্রব্লেম। এখনও ডেরা খুঁজে হয়রান হচ্ছি।"

"আমার ডেরায় চলে আয় না! খুব নিরিবিলি জায়গায়। তবে মাঝেমাঝে মাইকের বড্ড উপদ্রব।"

"পুলিশের চাকরি করে ওটা কানসওয়া হয়ে গেছে। অসুবিধে হবে না।" বলে মিঃ ধাড়া সহাস্যে আমার দিকে ঘুরে ফের বললেন, "মুরারি আমার ছেলেবেলার বন্ধু, বুঝলেন?"

বললুম, "তা না হয় বুঝলুম! কিন্তু উনি নিজেকে ভূত বলছিলেন কেন?"

মিঃ ধাড়া আরও হেসে বললেন, "কী কাণ্ড! ভূত নিজেকে ভূত বলবে না তো কি মানুষ বলবে?" বলে মুরারিবাবুর দিকে ঘুরলেন। "তবে মুরারি, কাজটা কিন্তু ঠিক করোনি। খামাকা এই নিরীহ লেখক ভদ্রলোককে জ্বালাতে না এলেই পারতে!"

মুরারিবাবু চোখ কটমট করে বললেন, "এসেছি কি সাধে? উনি ভূতেদের ব্যাপারে রং ইনফরমেশন দিয়েছেন। স্বচক্ষে ভূত না দেখে ভূতেদের ব্যাপারস্যাপার না জেনে একরাশ মিথ্যা কথা! অসহ্য! বঙ্কু, তোমারও উচিত এর একটা বিহিত করা।"

বঙ্কুবিহারী ধাড়া উঠে দাঁড়ালেন। "যাকগে মরুকগে! বিহিত করে হবেটা কী? এতদিন স্বচক্ষে ভূত দেখেন নি। এবার দেখলেন। ব্যাস, এবার থেকে আর বানিয়ে লিখবেন না। নাও, চলো—তোমার ডেরায় যাওয়া যাক। বাপস ডেরা খুঁজে পাওয়া কী যে প্রব্লেম হয়েছে আজকাল। কোঅপারেটিভ হাউসিং করলে মন্দ হয় না বরং।"

কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন। আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলুম মিনিটদুই। তারপর টনক নড়ল। ঝটপট দরজা বন্ধ করে হন্তদন্ত হয়ে পাশের ঘরে গেলুম। ফের থানায় রিং করলুম। তেমনি দেরি করে সাড়া এল। বললুম, "আমি লেখক নকুড় চন্দ্র গুঁই বলছি। একটু আগে একটা লোকের কথা বলেছিলুম—"

"লোকটা চলে গেছে তো?

"হ্যাঁ। কিন্তু একটা খবর জানতে চাইছি। লালবাজারে ক্রাইম ব্র্যাঞ্চের ইন্সপেক্টর বঙ্কুবিহারী—"

"কাগজে খবর পড়েন নি? ডাকাতদের সঙ্গে সংঘর্ষে গতরাতে উনি মারা গেছেন।"

এ পর্যন্ত শুনেই ফোন নামিয়ে রাখলুম। তারপর নাক এবং কানদুটো মলে প্রতিজ্ঞা করলুম, আর কখনও ভূতের গল্প লিখব না—লিখব না—লিখব না।...



ভোজন, ভজন, ভজু

পূর্ণেন্দু পত্রী



জামসেদপুর থেকে চিঠি এল বড় মেয়ে পিংকি ওরফে পুটুর। বাড়ির বড় মেয়ে।

শ্রীচরণেষু মা,
তোমার জামাইয়ের শরীর খারাপ। এবারে তাই পুজোর ছুটিতে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার বদলে আমরা কলকাতাতেই যাবো স্থির করেছি। তাতে এককাজে দুকাজ হবে। অনেকদিন বাদে তোমাদের সঙ্গে পুজো দেখা আর ওঁর ডাক্তার দেখানো। তাছাড়া ভজনকেও ডাক্তার দেখানোর দরকার আছে। ওর স্বভাব-চরিত্রির দিনকে-দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। আশা করি তোমরা সবাই কুশলে আছো।
প্রণামান্তে,
ইতি,

চিঠি পড়ে সারা বাড়িতে হৈ হৈ।
আদালতে আজ বড় কর্তার খুব বড় রকমের মামলা। তিনি সকাল থেকেই ব্যস্ত নথি-পত্র গোছাতে। অতি ব্যস্ততায় একটু আগে তিনি নথি-পত্রের মধ্যে নিজের নস্যির কৌটোটাকেই বেঁধে ফেলেছিলেন। আড়াই ঘণ্টা খুঁজেও যখন পাচ্ছিলেন না, তখন প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন তিনি। কেননা নাকে নস্যি না নিলে তাঁর মগজে বুদ্ধির মার-প্যাচ আসে না। মগজটাকে ঝাড়পোছ করার জন্যেই নস্যি। যে মামলায় আজ তাঁর রাজার মতো

জেতার কথা, সেখানে কি হরিজনের মতো হারবেন না কি ? রাগে হাতীর ভঙ্গীতে নিজের ঘরে থপ্ থপ্ পায়চারী করছিলেন তিনি । শেষ পর্যন্ত রাগটা যখন বাড়তে বাড়তে ব্রহ্মতালুতে উঠে গেল, তখন নথি-পত্রের লাল ফিতে বাঁধা ফাইলটাকে টেবিল থেকে ছুঁড়ে দিলেন জানলার দিকে । সেটা জানলার গ্রীলে না লেগে লাগল কাঁচের বই-ঠাসা আলমারীতে । আর তখনই খুটুস-খুট শব্দে নস্যির চারচৌকো রূপোর কৌটোটা গড়িয়ে পড়ল মেঝেয় । এক টিপ নস্যি নিয়ে এলোমেলো নথি-পত্রকে পুনরায় গোছাচ্ছেন যখন, সৌদামিনী পোষ্টকার্ডখানা হাতে নিয়ে হরিনাথের চেম্বারে ঢুকলেন ।

—পুঁটু চিঠি দিয়েছে । দেখেছো ?

পুঁটুর চিঠি তোমার পেটে থাকলে দেখবো কি করে ?

স্বামীর গুরুগম্ভীর প্রশ্নে প্রথমটা থতোমতো খেয়ে যান । চিঠিটা যে কার পেটে ছিল মনে করতে সময় লাগে তাঁর । মনে পড়লে তিনি ঝংকার দিয়ে ওঠেন ।

—তোমার কি মাথা খারাপ নাকি ? চিঠি কেউ আবার পেটে লুকিয়ে রাখে ? চিঠি কি গলদা চিংড়ী না ইলিশ মাছ ? এই তো এইমাত্র দিয়ে গেল নগেন ধোবা ।'

—নগেন ধোবা আবার পিয়নের চাকরী পেল কবে ?

—পিওন হতে যাবে কেন সে ? চিঠিটা এসেছিল গত সপ্তাহে । দেবু সেটা পকেটে রেখে আমাদের দিতে ভুলে গিয়েছিল । কাল রোববারে নগেন জামা-কাপড় নিয়ে গেল । দেবুর জামাটা কাচতে গিয়ে পকেট ঘেঁটে পেয়ে গেল বলেই একটু আগে দিয়ে গেল ।

—অ । দেখি ।

সৌদামিনীর হাত থেকে ছিঠিটা নিয়ে, এক নিশ্বাসে পড়ে, আবার সৌদামিনীর হাতে ফেরত দেওয়ার সময় হরিনাথের প্রশ্ন ।

—ভজনটি আবার কে ?

সৌদামিনী, পাছে হারিয়ে যায়, তাই পোষ্টকার্ডখানাকে চার ভাঁজ করে আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে

—ও যা, ভজনকে চিনতে পারলে না ? ভজন তো পুঁটুর মেজ ছেলের নাম ।

হরিনাথের গলায় মেঘ গর্জন ।

—তুমি কি কচি ছেলে ভেবেছো নাকি আমাকে ? সংসারের সাতে-পাঁচে থাকি না বলে, ভেবেছো কিছুই খবর রাখি না, আমি, হরিনাথ ব্যারিস্টার, আমার সামনে দুটো কান, পিছনে দুটো কান । সামনে দুটো চোখ, পিছনে দুটো চোখ । আমার একটা ঘাড়ে দুটো মাথা । আমাকে ছেলে ভোলাতে চেয়ো না তো ।

সৌদামিনীর গলায় ঝিরঝিরে বৃষ্টি ।

—সে তো হবেই । তুমি বাড়ির মাথা । তোমাকে কতদিকে মাথা ঘামাতে হয় । একটা মাথা হলে চলবেই বা কেন ? কিন্তু পুঁটুর ছেলে...

—আবার বলে পুঁটুর ছেলে । ভজন মোটেই পুঁটুর ছেলে নয় । পুঁটুর বড় ছেলের ডাক নাম ঝড়ু । বৈশাখে হয়েছিল বলে । ভালো নাম সর্বাঙ্গসুন্দর । মেজো ছেলের ডাক নাম খরু । খরার বছরে হয়েছিল বলে । ভালো নাম অনিন্দ্যসুন্দর । ছোট ছেলের নাম সরু । জন্ম থেকে পাকাটির মতো রোগা বলে । ভালো নাম চিরসুন্দর । এই তো ! এর মধ্যে ভজন আসছে কোত্থেকে ?

—ওমা, তাইতো ! তাহলে ভজন আবার কে জুটল ?

—বাড়ির কম বয়সী কোন চাকর-বাকর হবে হয়তো ।

সৌদামিনীর গলায় মাছের কাঁটা ঢোকে যেন একটা । ভজন কে জানতে না পারলে তাঁর গলা থেকে সে কাঁটা

নামবে না। হরিনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি সোজা চলে যান বড়বৌমার ঘরে, দোতলায়।
—বড়বৌমা। ভজন কে তুমি জানো কিছু ?
বড়বৌমা তখন খলে মকরধ্বজ মাড়ছিল। মকরধ্বজে তিন ফোঁটা মধু ঢেলে
—ভজন ? ভজন আমি বিয়ের আগে পর্যন্ত জানতুম। মীরা বাঈ-এর ভজন। কিন্তু এতগুলো বছর তো আর গাওয়া-গাওয়ি নেই। এখন কি আর গাইতে পারবো মা ?
—না বাছা, আমি ভজন গানের কথা জিজ্ঞেস করতে আসি নি। ভজন যে এক ধরনের গান সে কি আর তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে নাকি ? তুমি আর কখনো ভজন শুনেছো ? আমরা শুনেছি বটে ছেলেবেলায়। বেনারস থেকে আসতো রুককিনি নামে এক বাঈজী, কী পরমাসুন্দরী দেখতে। যেন পটের ছবিটি। গান হতো জলসাঘরে, মাঝরাতের পর। সে ঘরে আমাদের ঢোকা বারণ। আমরা চুরি করে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনতাম।
—আপনি ভুল করছেন মা। আপনি যা শুনেছেন সে তাহলে গজল বা ঠুংরী। বাঈজীরা কখনো ভজন গায় ?
—বা, তোমার তো দেখছি গান-বাজনায় খুব জ্ঞান ? বাঈজীরা ভজন গায় না বুঝি ? তুমি তো নিজেই মীরাবাঈ-এর ভজন বললে একটু আগে।

—বাই হলে কি বাঈজী হয় নাকি ?
তুমি থামো না। চুপ করো। সাতসকালে আর অতো লেকচার মেরো নি। আমি জিজ্ঞেস করতে এসেছিলুম পুঁটুর চিঠির ভজনের কথা।
সৌদামিনী দোতলা থেকে তিনতলায় উঠে মেজ বৌ সুমিতার ঘরের কড়া নাড়েন। ভজনের নাম শুনেই সুমিতার মুখ খুশিতে কাটা তরমুজের ফালির মত রাঙা হয়ে যায়।
—ওমা। ভজন এসেছে বুঝি ? কোথায় ? নীচে বসে আছে ? আমি যাই, উপরে ডেকে আনি।
সৌদামিনী কিছু বলার আগেই সুমিতা মাছের গন্ধ পাওয়া বেড়ালের মতো তরতরিয়ে নেমে যায় নীচে। সৌদামিনীকেও বাধ্য হয়ে নীচে নামতে হয়। নীচে নামার মুখেই তিনি দেখতে পান দোতলার করিডরের প্রান্তে রিংকি কার সঙ্গে কথা বলছে টেলিফোনে।



—শ্যামলীকে নিয়ে ছ'জন হল। তুই যে বললি সাতজন ? ওমা, আবার ভজনদাকেও ঢুকিয়েছিস পিকনিকে ? না, তা বলছি না, তবে বড্ড বক্‌বক্ করে, আর খাই-খাই বাতিক। তা ডেটটা ফিক্স্ করেছিস কিছু ? আমাকে আগে জানাস। আমার মা যা রায়বাঘিনী, পিকনিক বললে একদম বেরোতে দেবে না, আমাকে বলতে হবে অন্য কিছু বানিয়ে, বুঝতে পারছিস তো…
সৌদামিনীর, অন্য সময় হলে, কয়লার উনোনের মতো জ্বলে ওঠার কথা। পেটের মেয়ে টেলিফোনে অন্যের কাছে মায়ের নিন্দে করছে, এরকম একটা অগ্নিকাণ্ড হওয়ার যোগ্য ঘটনাকে নীরবে আমলকীর আচারের মতো হজম করে ফেলা তাঁর স্বভাবের পক্ষে অসম্ভব। তিনি ভাবছিলেন এগিয়ে গিয়ে চুলের ঝুঁটিটা চেপে ধরবেন রিংকির। কিন্তু সেই সময়েই দেবুর পড়ার ঘরে একটা প্রচণ্ড সোরগোলের শব্দ শুনে তাঁকে নেমে আসতে হল

একতলায়। তুমুল তর্ক বেধেছে দেবুর সঙ্গে মেজকাকার।
—না, তুমি হেরেছ। দশ টাকা দিতেই হবে।
—ফের চেঁচাচ্ছিস তুই ? আমি তোকে কি বলেছিলুম রে গাধা ? মিথ্যে কথা বলে আমার কাছে পার পাবি না। সব লেখা আছে আমার ডাইরীতে, সাল তারিখ সহ। বল, কি বলেছিলাম ?
—তুমি বলেছিলে ভজনলাল কোনদিনই টেস্‌টে চান্‌স পাবে না।
—নো, নেভার। একথা আমি বলতেই পারি না। আমার যদ্দুর মনে হচ্ছে, আমি বলেছিলাম, ইংলন্ড সফরে ভজনলালের ডাক পড়বে না। আমার স্মৃতিশক্তি পল্‌তা পাতার মত নরম হতে পারে, কিন্তু আমার ডাইরী ? সে তো বাবা চিত্রগুপ্তের খাতা। ভুলচুক ঢুকবে এমন ছিদ্র নেই কোথাও।
সৌদামিনী ওদের দুজনের মাঝে এসে দাঁড়ান।
—কি চেঁচামিচি লাগিয়েছ কাকা-ভাইপোয় ভজনলালকে নিয়ে। সে ভজনলাল আবার কোথাকার কে জানিনে বাবু। ইদিকে তো আমি জড়িয়ে পড়েছি আর এক ভজনকে নিয়ে।
মেজকাকা ঘুরে তাকান সৌদামিনীর দিকে।
—তুমি আবার আর এক ভজন জোগাড় করলে কোত্থেকে ?
—এই দেখো।
আঁচলের গেরো খুলে চার ভাঁজ করা চিঠিটা তিনি তুলে দেন দেওরের হাতে। চিঠিটা পড়ে মেজকাকার মুখ যেন রাঙা আপেল।
—বাঃ, এতো খুব শুভসংবাদ। কতদিন দেখিনি পুঁটুকে। তাহলে পুজোয় এবার জমজমাট আমাদের বাড়ি।
—সে না হয় হল, কিন্তু ভজনের কথাটা যে লিখেছে, ভজনটা কে ?
—ভজন ? হ্যাঁ' সত্যিই ভজনটা কে বলতো ?
—আমার যেন একবার মনে হয়েছিল ভজন বুঝি পুঁটুর মেজ ছেলের নাম। শুনে তো তোমার দাদা বললেন, তার ডাক নাম খরু। ভালো নাম অনিন্দ্যসুন্দর। সৌদামিনীর কথা শেষ হতে না হতেই মেজকাকার মুখে শাওয়ারের ফিন্‌কি—জলের মতো হাসি।
—কি হল, হাসছ কেন ?
—এ সব কথা তোমায় কে বলেছে ?
—কোন কথা ?
—পুঁটুর মেজ ছেলের নাম খরু।
—কেন ? তোমার দাদা।
—দাদার মাথাটা একদম গেছে। স্মৃতিশক্তি লোপাট। কি করে যে ব্যরিস্টারী করে আল্লা জানে।
—কেন গা ?

—আরে দাদা যা বলেছে, সে তো তোমার মেজ মেয়ের সেজ ছেলের নাম। পুঁটুর হবে কেন ? পুঁটুর বড় ছেলে জন্মেছিল কার্তিক মাসে। তাই তার ডাক নাম রাখা হয়েছিল কাতু। ভালো নাম সৌম্যকান্তি। মেজ ছেলে জন্মেছিল বোশেখে। কিন্তু পুঁটুর স্বামী তখন পাতিয়ালায় বদলী হয়ে গেছল বলে ডাক নাম রাখা হয়েছিল পাতু। ভালো নাম পীযূষকান্তি। আর ছোট ছেলের কি নাম রাখা হয়েছিল আমার ডাইরীতে লেখা নেই। কেননা সে তো প্রায় জন্মেই মারা গেল। আচ্ছা চিঠিখানা আমার কাছে থাক। ডাইরীটা ঘেঁটে দেখবো।
এই সময়েই কুংফু এসে দাঁড়ায় সেখানে।
—মেজবাবু, কে একজন লোক এয়েছেন। জিজ্ঞেস করনু, কি নাম আপনার ? তিনি বললে, ভজন সিং। বাবুকে গিয়ে বল, যে পুঁথি তিনি চেয়েছিলেন, সেই পুঁথি নিয়ে এসেছি।
—ওঃ পুঁথি ? বুঝেছি। ও তাহলে খুঁজছে টেবুকে। যা মেজবাবুকে খবর দে।
টেবু মানে রতিকান্ত। বাড়ির মেজ ছেলে। ইতিহাসের অধ্যাপক, এখন গবেষণা করছে রাজস্থানের পুঁথির উপর।

বিকেলে পাথুরেঘাটা থেকে বেড়াতে আসে হরিনাথের মামাতো ভায়ের বাড়ির লোকজন। গল্পগাছার মধ্যে সৌদামিনী পুঁটুর চিঠির প্রসঙ্গ তোলেন। গড়াতে গড়াতে প্রসঙ্গটা পৌছয় ভজনে। মামাতো ভাইয়ের বৌ কালোশশী জিজ্ঞেস করে

—ভজন আবার কে ?

সৌদামিনীর ঠোঁট এমনিতেই পানে রাঙা। মুখে আরও একটা পান পুরে, গাল ফুলিয়ে, জর্দার কৌটো খুলতে খুলতে

—ভাগ্য ভালো হলে দিদি এই রকমই হয়। আমাদের কপালে নেই তো হবে কি ? পুঁটু আমাদের ভজন বলে একটি বিহারী ছেলে পেয়েছে, সে যে কী ছেলে কী বলবো তোমাকে। সোনার টুকরো যেন। পুঁটু মুখ থেকে কথা খসাতে না খসাতেই দৌড়ে কাজ করে দিচ্ছে। যেমন ভদ্র স্বভাব তেমনি কাজের ছেলে।

—তাহলে স্বভাব-চরিত্রির খারাপ হয়ে যাওয়ার কথাটা লিখেছে কেন ?

—ঐ তো, পুঁটুর তো ঐ রকমই স্বভাব। একটুতে নেতিয়ে পড়ে। হয়তো চুরি-চামারি করেছে দু-চার পয়সা। পুঁটু আমাদের ভয়ে কাঁপবে, এ ছেলে না ডাকাত হয়।

এই কথোপকথনের মাঝখানেই হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হন মেজকত্তা। হাতে ডাইরী।

—বৌদি এখানে আছো ? এই যে পেয়ে গেছি তোমার ভজনকে। ৩রা অক্টোবর ১৯৮১। পুঁটু ২১ শে সেপ্টেম্বরে লেখা চিঠি জবাবে আমি লিখেছিলাম—

—স্নেহের পুঁটুরানী,

তোমার ২১ তারিখে চিঠি পাইয়া পরম শান্তিলাভ করিয়াছি। তুমি একটি বেড়াল পুষিয়াছ শুনিয়া অন্তরে আরও আনন্দ পাইলাম। 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'—এই মহাবাণী তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। তুমি বেড়ালটার জন্য একটি নাম চাহিয়াছ। অনেক ভাবিয়া আমি একটি নাম স্থির করিয়াছি। বেড়াল মাত্রই বড় লোভী ! শত খাওয়াইলেও উহাদের ক্ষুৎপিপাসা মেটে না। সুতরাং উহার নাম রাখিতে পারো ভোজন। আমি মনে করি পৃথিবীর সমস্ত বেড়ালেরই ঐ নামকরণ হওয়া উচিত। ভোজন নামটি আমার সেই কারণে পছন্দ। অবশ্য ডাকিতে ডাকিতে আদরের চোটে তাহা কোন একসময় ভজন বা ভজুতেই রূপান্তরিত হইতে পারে। তোমাদের মতামত জানাইলে খুশি হইব।



নীল মানুষের পরাজয়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শেষ রাতের দিকে দারুণ ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হলো হঠাৎ। শীতকাল, এ সময় এরকম বাদলা হওয়ার কথা নয়। রণজয় আর গুটুলির ঘুম ভেঙে গেল। পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট মতন গুহাকে ওরা বড়ো করে নিয়েছে, সেটাই এখন ওদের বাড়ি। রণজয় অন্য জায়গা থেকে একটা বড়ো পাথর এনে গুহার মুখটা আড়াল করে রেখেছে, বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না।

ঝড়ের শব্দে ঘুম ভেঙে যাবার পর গুটুলি প্রথমে উঠে এসে বাইরে একটু উঁকি মারলো। মড় মড় করে গাছ ভাঙার শব্দ হচ্ছে, বাতাসেও একটা গোঁ গোঁ শব্দ।



এরকম ঝড়-বৃষ্টি গুটুলি সাতজন্মে দেখেনি। সে ভয় পেয়ে ভেতরে ছুটে এসে রণজয়কে ডাকলো।

রণজয়ের ঘুম ভেঙে গেলেও সে সহজে উঠতে চায় না। বেশ শীত পড়েছে, সে কম্বলটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বললো, বৃষ্টি পড়ছে তাতে ভয়ের কী আছে ? আমাদের গুহার মধ্যে তো আর জল ঢুকবে না !

গুটুলি বললো, কী রকম ভয়ংকর একটা শব্দ হচ্ছে। বাইরে এসে একবার শুনে দ্যাখো ! মনে হচ্ছে যেন মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে। যদি সারা পৃথিবী ভেসে যায় !

রণজয় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, হেঃ পৃথিবী ভাসলেই হলো আর কী ! এখন ঘুমোও। সকালে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

এই সময় বাইরে যেন একসঙ্গে একশোটা কামান দাগার শব্দ হলো। গুটুলি রণজয়ের হাত চেপে ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, ও কী ? পাহাড় ভেঙে পড়ছে !

রণজয় হেসে বললো, এত ভয় কিসের গুটুলি ভায়া ? বাজের আওয়াজ শোনোনি কখনো ?

—এত জোরে বাজ পড়ে কখনো ?

—আমরা গুহার মধ্যে রয়েছি তো, তাই আওয়াজটা বেশি মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, চলো দেখি বাইরে। রঘু কোথায় ?

—রঘু কাঁদছে !

রণজয়কে এবারে উঠতেই হলো। গুহাটা অনেকখানি লম্বা, ভেতরে দু'তিনটে ঘরের মতন খোপ খোপ। তারই একটা খোপে ওদের রান্নাঘর, সেইখানেই থাকে রঘু। শীতের জন্য সেই ঘরটায় আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে।

রণজয় আর গুটুলি সেই ঘরে এসে দেখলো, রঘু দেয়ালে পিঠ দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে আর বলছে, আজ শেষ হয়ে গেলুম ! আজ আকাশ ভেঙে পড়বে, পাহাড় ভেঙে পড়বে, আর কোনোদিন বাড়ির লোকদের দেখতে পাবো না গো !

রণজয় বললো, দেশের কী অবস্থা ! ডাকাতগুলো পর্যন্ত এত ভীতু হয় ? এই রঘু, চল, আমার সঙ্গে বাইরে চল, একটু বৃষ্টিতে ভিজে আসি !

এই সময় মেঝেটা একটু কেঁপে উঠলো আর বাইরে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ হলো।

গুটুলি দারুণ ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠলো, ভূমিকম্প শুরু হয়েছে ! মহাপ্রলয় !

রণজয় এবারে খুব দ্রুত গুটুলি আর রঘুকে দু'হাতে তুলে নিয়ে ছুটে চলে এলো বাইরে। ভূমিকম্প হলে গুহার মধ্যে থাকা সত্যিই বিপজ্জনক। বাইরে বৃষ্টি একেবারে চাবুকের মতন। একের পর এক গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ হচ্ছে। কাছেই একটা ছোট পুকুর আছে, তার পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। রঘু আর গুটুলিকে দুটি বেড়ালছানার মতন দু'বগলে নিয়ে রণজয় ছুটলো সেদিকে।



পুকুরটার ধারে পৌঁছতেই হঠাৎ খুব জোরে একটা বিদ্যুৎ চমকে চতুর্দিক সাদা হয়ে গেল। রণজয় মুখ তুলে আকাশটা দেখবার চেষ্টা করেও পারলো না। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

রণজয়ের যখন জ্ঞান ফিরলো, তখন ঝড়-বৃষ্টির কোনো চিহ্ন নেই। দিনের আলো ফুটে গেছে। রণজয় ধড়মড় করে উঠে বসলো। কী হয়েছিল কাল রাত্তিরে ? ভূমিকম্পে পৃথিবী চৌচির হয়নি, পাহাড়ও ভেঙে পড়েনি, তবু শুধু বিদ্যুৎ চমকে সে অজ্ঞান হয়ে গেল কেন ? তার মাথায় কি বাজ পড়েছিল ? মাথায় বাজ পড়লে কি কেউ বাঁচে ?

রণজয় নিজের দু'গালে চড় মারলো কয়েকটা। ব্যথা লাগছে তো। তা হলে সে মরেনি। গুটুলি আর রঘু তার দু'পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। পুকুর থেকে আঁজলা করে জল এনে রণজয় ছিটিয়ে দিল ওদের মুখে। একটু বাদেই ওদেরও জ্ঞান ফিরলো।

রঘু চোখ মেলেই বললো, আমি কি মরে গেছি ? গুটুলি বললো, আমার কী হয়েছিল ?

রণজয় বললো, ঝড়ে শুধু কয়েকটা গাছ ভেঙে পড়েছে, আর কিছুই হয়নি। সামান্য একটু মাটি কেঁপেছিল। রঘু, যা উনুনে আগুন দে। চা আর রুটি বানা, আমার খিদে পেয়েছে !

রঘু আবার কাঁদতে শুরু করে দিল ভেউ ভেউ করে।

রণজয় অবাক হয়ে বললো, আরে এ ডাকাতটা দেখছি বাচ্চাদেরও অধম হয়ে গেছে। এই, তোর এখন

আবার কান্নার কী হলো ?

রঘু বললো, আমি দোষ করেছি বটে, তা বলে কি কোনোদিন ছুটি পাবো না ?

গুটুলি বললো, কতগুলো ডাকাতি করেছিলি মনে নেই ? তোকে যদি পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতুম, তা হলে সারাজীবন জেলে পচতে হতো !

রঘু বললো, রোজ রোজ রান্না করার চেয়ে জেলে থাকাও ভালো !

রণজয় ধমক দিয়ে বললো, যা, আগে চা-টা তৈরি কর। আমরা গুহায় আসছি একটু বাদে।

রঘু চলে যাবার পর গুটুলি বললো, ওস্তাদ, দ্যাখো, আকাশ এখন একেবারে পরিষ্কার। গতকাল বিকেলেও এরকম পরিষ্কার ছিল। তবু রাত্তিরে ওরকম ঝড়-বৃষ্টি হলো কী করে ? আমরাই বা অজ্ঞান হয়ে গেলুম কেন ?

রণজয় বললো, আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে...

সে কথা শেষ করার আগেই পেছনে শোনা গেল মানুষের পায়ের শব্দ। ওরা পেছন ফিরতেই দেখলো, দুটি কিশোরী মেয়ে পুকুরটার দিকে আসছে।

মেয়ে দুটিকে একেবারে হুবহু একরকম দেখতে। দু'জনেরই বয়েস হবে তের চোদ্দ, মাথায় লম্বা চুল, একজন একটা লাল রঙের, অন্যজন একটা হলদে ফ্রক পরা। দু'জনেরই কাঁধে ঝোলা-ব্যাগ। দু'জনেরই পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা জুতো।

ওরা যেমন মেয়েদুটিকে দেখে অবাক হয়েছে, তেমনি মেয়ে দুটিও ওদের দেখে অবাক ভাবে থমকে দাঁড়ালো। রণজয় প্রায় আট ফুট লম্বা, গায়ের রং আকাশের মতন নীল, আর গুটুলিকে দেখতে একটি বাচ্চা ছেলের মতন হলেও তার নাকের নিচে পুরুষ্টু গোঁফ।

রণজয় আর গুটুলিকে দেখার পর মেয়ে দুটি একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগলো।

রণজয়ের গলার আওয়াজ বাজখাঁই ধরনের, নতুন লোকরা শুনলে চমকে যায়। তাই সে গুটুলির চোখের দিকে তাকিয়ে একটা ইঙ্গিত করলো।

গুটুলি জিজ্ঞেস করলো, এই, তোমরা কারা গো ? এই বনে কী করে এলে ?

হাসি থামিয়ে লাল রঙের ফ্রক পরা মেয়েটি তার ঝোলা থেকে একটা ছোট্ট টেপ রেকর্ডার বার করে কানের কাছে এনে কী যেন শুনলো। তারপর সেটা অন্য মেয়েটির হাতে দিয়ে সে বললো, আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি !

গুটুলি বললো, তোমরা এখানে বেড়াতে এসেছো ? কোথা থেকে এলে ? কিসে করে এলে ? তোমাদের সঙ্গে আর কে আছে ?

হলদে ফ্রক পরা মেয়েটি এবার অন্য মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ও আমার সঙ্গে আছে, আমি ওর সঙ্গে আছি। আর কেউ নেই।



—তোমরা এই জঙ্গলের মধ্যে এলে কী করে ! তোমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে ?

লাল ফ্রক এবার হলদে ফ্রকের দিকে তাকিয়ে বললো, আমাদের গাড়ি কি খারাপ হয়ে গেছে ? কি জানি ! আমরা বেড়াতে এসেছি।

—এই জঙ্গলে তোমরা দুটি মেয়ে বেড়াতে এসেছো, সঙ্গে কেউ নেই, এ তো বড় আশ্চর্য কথা।

হলদে ফ্রক বললো, বেড়াতে আসা বুঝি আশ্চর্য কথা ? তোমরা এখানে কী করছো, তোমরা বেড়াতে আসোনি ?

রণজয় যতদূর সম্ভব আস্তে ফিসফিস করে গুটুলিকে বললো, সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কী জানিস, এই মেয়ে দুটো আমায় দেখে ভয় পেল না কেন ? এই প্রথম দেখছি, কেউ আমায় দেখে ভয়ে কাঁপছে না। মেয়ে দুটো তো মনে হচ্ছে, ক্লাস এইট-নাইনে পড়ে ! আমাদের দেখে হাসতে শুরু করলো ?

গুটুলি বললো, খুব পাকা মেয়ে। একা একা বেড়াতে এসেছে !

তারপর সে গলা তুলে ওদের বললো, না, আমরা এখানে বেড়াতে আসিনি। আমরা এখানে থাকি !

হলদে ফ্রক ও লাল ফ্রক চোখাচোখি করলো একবার, তারপর লাল ফ্রক বললো, তোমরা জঙ্গলে থাকো ? তোমরা কী জন্তু ?

এইবারে রণজয় প্রচণ্ড জোরে হুংকার দিয়ে বললো, অ্যাঁ, কী বললে ? আমরা জন্তু ?

রঘু ডাকাতের মতন লোকও প্রথমবার রণজয়ের এই রকম হুংকার শুনে ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছিল। মেয়ে দুটি আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো। তারপর তারা পুকুরের ধারে এসে বসে পড়লো হাঁটু গেড়ে।

গুটুলি রেগে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললো, এই খুকী, আমাদের জন্তু বললে যে? আবার হাসছো?

দুটি মেয়েই প্রত্যেকবার কথা বলার আগে নিজেরা চোখাচোখি করে কী যেন বলে নেয়। এবারে হলদে ফ্রক বললো, ভুল বলেছি বুঝি? তোমরা বললে কি না তোমরা জঙ্গলে থাকো, তাই আমরা ভাবলাম, জঙ্গলে তো জন্তুরাই থাকে।

গুটুলি বললো, জঙ্গলে মানুষও থাকে। কিন্তু তোমাদের বয়েসী মেয়েরা জঙ্গলে একা একা আসে না। এখানে অনেক রকম বিপদ হতে পারে।

লাল ফ্রক বললো, আমরা একলা আসিনি তো, দু'জনে এসেছি। এখানে কি রকম বিপদ হয়?

গুটুলি বললো, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার থাকে, অনেক চোর-ডাকাতও লুকিয়ে থাকে জঙ্গলে।

হলদে ফ্রক বললো, তোমারই বুঝি চোর-ডাকাত? তোমরা আমাদের বিপদে ফেলবে?

গুটুলি বললো, আচ্ছা মুস্কিল তো, এই মেয়ে দুটো কিছু বোঝে না। আমরা চোর-ডাকাত হলে কি তোমাদের আগে থেকে সাবধান করে দিতুম?

রণজয় বললো, আহা রে, মেয়ে দুটি সত্যি বড় সরল। ওরা বেড়াতে এসেছে, খুশী মতন বেড়িয়ে নিক। আমরা ওদের পাহারা দেবো।

মেয়ে দুটি আঁজলা করে পুকুর থেকে খানিকটা জল তুলে সেই জলের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তারপর সেই জলে জিভ ঠেকালো।

গুটুলি চেঁচিয়ে বললো, ঐ পুকুরের জল খেও না। কাছেই একটা ঝর্ণা আছে, সেই ঝর্ণার জল ভালো।

ওরা সেই কথায় তেমন আমল দিল না। চুমুক দিয়ে জলটুকু খেয়ে নিয়ে একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে কী যেন বললো।

পুকুরের ধারে ছোট ছোট ঘাস ফুল ফুটে আছে। ওদের একজন একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তাতেও জিভ ঠেকালো। অন্যজন আর একটা ফুল তুলে খেয়ে নিল টপ করে।



রণজয় বললো, আহারে, ওরা বোধহয় রাস্তা হারিয়ে বনের মধ্যে চলে এসেছে। খুব খিদে পেয়েছে ওদের। এই গুটুলি, ওদের ডাক না।

ওরা আমাদের সঙ্গে জলখাবার খেতে পারে।

গুটুলি জিজ্ঞেস করলো, ওগো, ও মেয়ে। তোমাদের নাম কী?

লাল ফ্রক পরা মেয়েটি বললো, নাম? আমাদের নাম? হ্যাঁ, আমাদের একটা করে নাম আছে। আমার নাম রুমুনা আর ওর নাম ঝুমুনা। এইবার বলো তো, তোমাদের নাম কী?

গুটুলি বললো, আমাকে সবাই গুটুলি বলে ডাকে। আর এই যে আমার বন্ধুকে দেখছো, এর নাম রণজয়, কিন্তু ওকে সবাই বলে নীল মানুষ।

ঝুমুনা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা একজন এত ছোট, আর একজন এত বড় কেন?

এই সময় দূর থেকে রঘু চেঁচিয়ে বললো, চা, চা রেডি! বাবুদের কি পুকুর পাড়ে চা দিতে হবে, না এইখানে আসা হবে?

রণজয় বললো, রঘু, এইখানে চা আর খাবার-টাবার নিয়ে আয়!

গুটুলি বললো, ওগো রুমুনা-ঝুমুনা, তোমরা আমাদের সঙ্গে চা খাবে এসো!

রুমুনা-ঝুমুনা পরস্পরের চোখের দিকে তাকালো। তারপর রুমুনা বললো, না, আমরা এখন ঐ দিকে বেড়াতে যাবো!

তারা দু'জনে নেমে পড়লো পুকুরে। তারপর পাশাপাশি দুটি হাঁসের মতন নিঃশব্দে সাঁতার কাটতে কাটতে চলে গেল ওপারে। তারপর নেচে নেচে গা থেকে জল ঝরাতে লাগলো।

একজন একটা ফুল ছিড়ে নিয়ে তাতেও জিভ ঠেকাল।

পুকুরের ঐ ধারে একটা বন-তুলসীর ঝোপ। মেয়ে দুটি সেখান থেকে টপাটপ ফুল ছিড়ে ছিড়ে খেতে লাগলো।

রণজয় বললো, কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওদের। ওরা কি মেয়ে, না প্রজাপতি?

গুটুলি চোখ গোল গোল করে বললো, ওরা জুতো পরে জলে নেমে গেল, জুতো পরে সাঁতার কাটলো। এই কী গুণ্ডা মেয়েরে বাবা! ওরা আবার ফুল খায়!

রণজয় বললো, অনেকে কুমড়ো ফুল আর বকফুল ভাজা খায়। আমরা ঐ ফুল খেয়ে দেখিনি, হয়তো ভালোই লাগবে!

এই সময় রঘু একটা থালায় করে চায়ের কাপ আর রুটি নিয়ে এলো। থালাটা নামিয়ে রেখে সে গোমড়া মুখে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি পাখির ডিমের ওমলেট খাবে?

গুটুলি বললো, সে আবার কী? পাখির ডিমের ওমলেট মানে?

রঘু বললো, কালকের ঝড়ে অনেকগুলো গাছ ভেঙে পড়েছে তো। আমাদের গুহার সামনে ওরকম দুটো গাছে দেখলুম যে বেশ কয়েকটা পাখির বাসা। তার থেকে আমি আট-দশটা ডিম কুড়িয়ে রেখেছি।

রণজয় বললো, ধুৎ! পাখির ডিম আবার কেউ খায় নাকি? ডিমগুলো যেখানে পেয়েছিস, সেখানে রেখে আয়। তবে একটা ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস। অনেকদিন মুর্গীর ডিম খাওয়া হয়নি। এই জঙ্গলে আমি কয়েকবার বন-মুর্গীর ডাক শুনেছি। দেখতে হবে তো ওরা কোথায় ডিম পাড়ে।

গুটুলি বললো, মেয়ে দুটো গেল কোথায়?

মেয়ে দুটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। তারা ঢুকে পড়েছে পেছন দিকের জঙ্গলে।

গুটুলি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললো, এটা কিন্তু বেশ চিন্তার বিষয়। এখান থেকে গাড়ির রাস্তা অন্তত দশ-বারো মাইল দূরে। সেখান থেকে মেয়ে দুটো কি এত সকালে হেঁটে চলে এলো? কিংবা, কাল রাত্তিরে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ওরা এই জঙ্গলেই কাটিয়েছে? ওদের সঙ্গে কোনো পুরুষ মানুষ নেই কেন?

রঘু বললো, মেয়ে? কোথায় মেয়ে? তোমাদের ভয়ে এই জঙ্গলে ভূত-পেত্নী ছাড়া আর কোনো মানুষ ঢুকবে না!

রণজয় বললো, রঘু, চাল আর ডাল আছে তো? দুপুরে ভালো করে খিচুড়ি বানা। বৃষ্টি পড়লেই আমার খিচুড়ির জন্য মন কেমন করে। গুটুলি আর আমি ততক্ষণ দেখে আসি, মেয়ে দুটো কী করছে!

রঘু বললো, সত্যি দুটো মেয়ে এসেছে নাকি? আমি তাদের দেখতে যাবো না? রান্না না হয় পরে হবে!

রণজয় আঙুল তুলে ধমক দিয়ে বললো, যা, নিজের কাজ কর গিয়ে!

গুটুলি বললো, রঘু, আবার যদি পালাবার চেষ্টা করিস, তা হলে এবার কিন্তু তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো!

রণজয় গুটুলিকে তুলে নিল কাঁধের ওপর। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে পুকুরের ধার ঘুরে পেছন দিকের জঙ্গলটায় ঢুকে পড়লো।

একটু খুঁজতেই দেখতে পাওয়া গেল মেয়ে দুটিকে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। একটা ফাঁকা জায়গায় মুখোমুখি বসে আছে রুমুনা আর ঝুমুনা, তাদের মাঝখানে দুটো ছাই রঙের খরগোশ। মেয়ে দুটি হাততালি দিচ্ছে আর খরগোশ দুটো নাচছে।

গুটুলি বললো, বুনো খরগোশ ওদের কাছে পোষ মেনেছে, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার?

রুমুনা গুনগুন করে একটা গান শুরু করলো, ঝুমুনা তার ঝোলা থেকে একটা ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে লাগলো।

গুটুলিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে রণজয় বললো, তুই ঐ দিকটায় দাঁড়া। খরগোশ দুটো ধরতে হবে। খিচুড়ির সঙ্গে খরগোশের রোস্ট খুব ভালো জমবে।

রণজয়ের গলার আওয়াজ পেয়ে গান থামিয়ে রুমুনা বললো, নীল মানুষ, এই জিনিস দুটোর নাম কী?

রণজয় বললো, জিনিস মানে? এ দুটো তো খরগোশ।

তোমরা খরগোশ চেন না? তোমরা কোন দেশের মেয়ে?

গুটুলি বললো, এরা আসলে মেয়ে কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে।

রণজয় বললো, ওগো রুমুনা, ঝুমুনা আজ দুপুরে আমাদের গুহায় তোমাদের নেমন্তন্ন। খিচুড়ি আর খরগোশের রোস্ট।



খরগোশ দুটো নাচ থামিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পালাচ্ছে না। রণজয় হাত বাড়িয়ে খরগোশ দুটোকে ধরতে যেতেই রুমুনা বললো, এই, ওদের ধরবে না! রণজয়ের হাত দুটো সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে গেল। তার থেকেও শক্তিশালী যেন কেউ চেপে ধরলো তার হাত। সে প্রচণ্ড চেষ্টা করেও তার হাত দুটো নামাতে পারলো না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রণজয় বললো, এইবার বুঝেছি। প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিল··· তোমরা দু'জন অন্য গ্রহ থেকে এসেছে, তাই না?

ঝুমুনা খরগোশ দুটোর গায়ে হাত বুলিয় বললো, এই যাঃ যাঃ। তোরা খেলতে যা!

খরগোশ দুটো এবার তিন লাফে পালিয়ে গেল পাশের ঝোপে।

রুমুনা বললো, আমরা তো অন্য গ্রহ থেকে আসিনি। আমরা অনেক দূরে থাকি, রাত্তিরবেলা তোমরা যে ছায়াপথ দেখতে পাও, সেইখানে। ছুটির সময় আমরা বেড়াতে যাই। আমরা দু'জনেই তো ফুল নিয়ে পড়াশুনো করি, তাই তোমাদের এখানে ফুল চেখে দেখতে এসেছি। তোমাদের এই ছোট্ট জায়গাটায় অনেক রকম ফুল ফোটে।

ঝুমুনা বললো, আমরা নিজের মনে বেড়াবো, তোমরা তোমাদের কাজ করতে যাও না!

রণজয় বললো, কাল রাত্তিরে একটা মহাকাশযান তোমাদের এখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে, ঠিক কিনা? সেই জন্যই হঠাৎ ওরকম ঝড়-বৃষ্টি আর ভূমিকম্প হলো। বেশ বড় স্পেসশীপ মনে হচ্ছে। তোমরা সঙ্গে অদৃশ্য বডিগার্ড নিয়ে এসেছো বুঝি?

রুমুনা বললো, বডিগার্ড আবার কী ? কেন, আমরা নিজেরা বুঝি বেড়াতে পারি না ?

রণজয় বললো, আমার হাত দুটো কে চেপে ধরে আছে ? ছেড়ে দিতে বলো !

মেয়ে দুটি একথা শুনে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগলো । খুব মিষ্টি তাদের হাসির শব্দ । ঝর্ণার কুলকুল শব্দের মতন ।

ঝুমুনা বললো, তোমার হাত আবার কে ধরে থাকবে ? আমরা তো কারুকে দেখতে পাচ্ছি না । তুমি হাত দুটো ওরকম উঁচু করে আছো কেন, নিচে নামাও !

রণজয়ের হাত দুটো আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল । সে তাকালো গুটুলির দিকে । গুটুলির মুখখানা ভয়ে শুকিয়ে গেছে । সে ফিসফিস করে বললো, ওস্তাদ, এই মেয়ে দুটোর চোখ একেবারে সবুজ । ভেতরে যেন আলো জ্বলছে ! এরা কি সত্যিকারের মেয়ে ?

রণজয় বললো, সেটাও একটা কথা বটে । ওগো রুমুনা-ঝুমুনা, তোমরা কি সত্যিকারের মেয়ে ? নাকি তোমাদের চেহারা অন্যরকম, ইচ্ছে করে পৃথিবীর মেয়েদের রূপ ধরেছো ?

রুমুনা বললো, আমরা আমাদের মতন, আমরা হঠাৎ পৃথিবীর মেয়ে সাজতে যাবো কেন ? তোমরা বাপু এখন যাও, আমাদের অনেক কাজ আছে । তোমাদের পৃথিবীর সব রকম ফুল আমাদের একটু একটু খেয়ে দেখতে হবে । ঐ যে ঐ বড় গাছটায় ফুল ফুটে আছে, ওগুলো কী ফুল ?

রণজয় বললো, ও তো শালগাছের ফুল । অত উঁচু থেকে তোমরা পাড়বে কী করে ? দাঁড়াও, আমি পেড়ে দিচ্ছি ।

রণজয় উঠে দাঁড়াবার আগেই ঝুমুনা তরতর করে সেই গাছে উঠে গেল । ঠিক গাছ বেয়ে ওঠা নয়, জুতো পরা অবস্থাতেই সে যেন হেঁটে উঠে গেল গাছটার ডগায় । খানিকটা ফুল পেড়ে এনে নিজে একটু খেয়ে দেখলো, বাকিটা দিল রুমুনাকে ।

রণজয় বললো, হুঁ বুঝলুম মাধ্যাকর্ষণে তোমাদের আটকাতে পারে না । তা শোনো রুমুনা আর ঝুমুনা, এই পৃথিবীর মানুষ তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে যাবে । কিন্তু আমি মহাশূণ্যের অন্য অনেক গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরে এসেছি । আমি নীল মানুষের গ্রহে গেছি, অদৃশ্য মানুষদের গ্রহ দেখেছি, তারপর যেখানে মানুষখেকো রাক্ষুসে গাছ আছে···তোমরা ঠিক কী উদ্দেশ্যে এসেছো বলো তো ? শুধু ফুল খেতে ? আমাদের পৃথিবীর কোনো ক্ষতি করতে আসোনি তো ?

রুমুনা বললো, কী বিচ্ছিরি কথা ! আমরা তোমাদের ক্ষতি করবো কেন ? আমরা বেড়াতে এসেছি, আজ রাত্তিরেই আবার ফিরে যাবো ।

—বাঃ, তা হলে তো তোমরা আমাদের অতিথি । আজ দুপুরে খিচুড়ি খেতে চলো আমাদের সঙ্গে । আচ্ছা আমি যে খরগোশ দুটো ধরার চেষ্টা করলুম, তোমরা বাধা দিলে কেন ?

—বলছি তো, তোমরা আমাদের বিরক্ত করো না । আমাদের ইচ্ছে মতন বেড়াতে দাও । তোমরা অন্য জায়গায় যাও ।



—আমাকে এরকম বকে বকে কথা বলছো ? জানো, তোমার বয়েসী ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখেই কত ভয় পায় !

—যারা ভয় পায়, তুমি তাদের ভয় দেখাওগে ! আমরা ভয় পেতে একদম ভালোবাসি না ।

গুটুলি বললো, ওস্তাদ, চলো কেটে পড়ি ! ওদের চোখের দিকে তাকালেই আমার বুক কাঁপে !

রণজয় বললো, সে কিরে, দুটো পুঁচকে মেয়েকে দেখে আমরা ভয় পেয়ে পালাবো ? তা হলে দ্যাখ্—

রণজয় দু'হাতে রুমুনা আর ঝুমুনাকে তুলে নিয়েই ছুঁড়ে দিল শূণ্যে, তারপর তাদের হাত বদল করে আবার লুফে নিয়ে বললো, এবার ? কেমন লাগলো ?

রুমুনা বললো, আমাদের মাটিতে নামিয়ে দাও !

ঝুমুনা মুচকি হেসে বললো, এটা আবার একটা খেলা নাকি ? তোমরা অন্য একটা খেলা দেখবে ?

মাটিতে দাঁড়িয়ে ঝুমুনা এক আঙুলের ছোঁয়া দিয়ে গুটুলি আর রণজয়কে শুধু ঘুরিয়ে দিল একবার । সঙ্গে সঙ্গে ওরা দু'জন দুটো দু'সাইজের লাট্টুর মতন বনবন্ করে ঘুরতে লাগলো ।

রণজয় চেঁচিয়ে বললো, থামাও, আমাদের থামিয়ে দাও !

রুমুনা আর ঝুমুনা হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলো মাটিতে। দূরে হঠাৎ অনেক লোকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। কারা যেন এইদিকেই আসছে।

রুমুনা-ঝুমুনা এবার হাসি থামিয়ে উঠে বসলো। ওদের মধ্যে একজন থামিয়ে দিল রণজয় আর গুটুলিকে।

রণজয় বললো, এবারে তোমাদের আর একটা খেলা দেখাই ?

হুড়মুড় করে গাছপালা ভেদ করে বেরিয়ে এলো কয়েকজন পুলিশ। সবার হাতে বন্দুক। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে রঘু।

রঘু হাত তুলে বললো, ঐ দেখুন স্যার, ঐ সেই দৈত্যটা। খুব সাবধান, ওকে পালাতে দেবেন না। এই দৈত্যটাই এদিককার সব ডাকাতি করে। আর ঐ যে বেঁটে বাঁটকুলটা, ঐটা মহাশয়তান। এদের চিড়িয়াখানায় বন্ধ করে রাখুন স্যার।

রণজয়ের বিশাল চেহারা দেখে পুলিশের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। শুধু ওদের মধ্যে যে ইন্‌সপেকটর, সে রিভলভার উঁচিয়ে বললো, হ্যাণ্ডস্ আপ ! দৈত্য কোথায়, এ তো একটা লম্বা লোক। গায়ে নীল রং মেখেছে। গীনেস বুক অফ রেকর্ডসে এর চেয়েও লম্বা লোক আছে।

রঘু বললো, না, স্যার, ও সত্যি দৈত্য। ওর গায়ে গুলি লাগলেও বোধহয় মরবে না। ঐ বেঁটে গুটুলিটাকে আগে ধরুন !

ইনস্‌পেকটর বললো, এই মেয়ে দুটি কোথা থেকে এলো ? রঘু বললো, দৈত্যটাই নিশ্চয়ই ওদের ধরে এনেছে, স্যার। ইনস্‌পেকটর রুমুনা আর ঝুমুনাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কে মা ? তোমরা কোথা থেকে এসেছো ?

রুমুনা মিষ্টি হেসে বললো, আমরা বেড়াতে এসেছি। তোমরা কে ? তোমরা বুঝি চোর-ডাকাত ?

ইনস্‌পেকটর শব্দ করে হেসে উঠলো। তারপর রণজয়কে বললো, চল, চল্ ব্যাটা ?

একজন পুলিশ গুটুলির ঠিক মাথার কাছে বন্দুক তাক করে আছে। রণজয় বুঝতে পারলো, সে একটু এগোবার চেষ্টা করলেই ওরা আগে গুটুলিকে গুলি করবে। বিশ্বাসঘাতক রঘু ওদের আগেই বলে দিয়েছে যে সে গুটুলিকে কতটা ভালোবাসে।

সে রুমুনা আর ঝুমুনার দিকে তাকিয়ে বললো, ওরা আমাদের ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। তা হলে যাই ? আর খেলা হলো না !

ইন্‌সপেকটর বললো, এই মেয়ে দুটিকেও যেতে হবে থানায়। চলো তো মা, চলো, কোনো ভয় নেই, আমার সঙ্গে চলো !

রুমুনা বললো, না, আমরা যাবো না। আমরা বেড়াতে এসেছি !

রণজয় বললো, তোমাদের যদি ওরা জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চায়, আমি তোমাদের বাঁচাবো। দেখবে ?

সে রুমুনা আর ঝুমুনাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে খুব উঁচুতে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, যাও ! তোমরা তোমাদের দেশে চলে যাও !



রুমুনা আর ঝুমুনা ঠিক দুটো পাখির মতন উড়তে লাগলো বনের মাথায়। পুলিশরা হাঁ করে ওপরের দিকে চেয়ে রইলো। সেই সুযোগে রণজয় একজন পুলিশের বন্দুকটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেই ইন্‌সপেকটরটি চালিয়ে দিল তার বুকে একটা গুলি ! রণজয় বসে পড়লো মাটিতে।

রুমুনা আর ঝুমুনা ওপরে উড়তে উড়তে একজন আর একজনকে বললো, ঐ লম্বা লোকটা মোটে একটাই খেলা জানে। আয়, ওদের আমি অন্য একটা খেলা দেখাই !

ঝুমনা বললো, পরে যে লোকগুলো এলো, ওদের মুছে ফেললে কেমন হয় ?

রুমুনা বললো, ওরা আমাদের জোর করে নিয়ে যেতে চাইছিল, ওরা লোক ভালো না। ওরাই বোধহয় চোর-ডাকাত ! ওদের ঘুম পাড়িয়ে দি ?

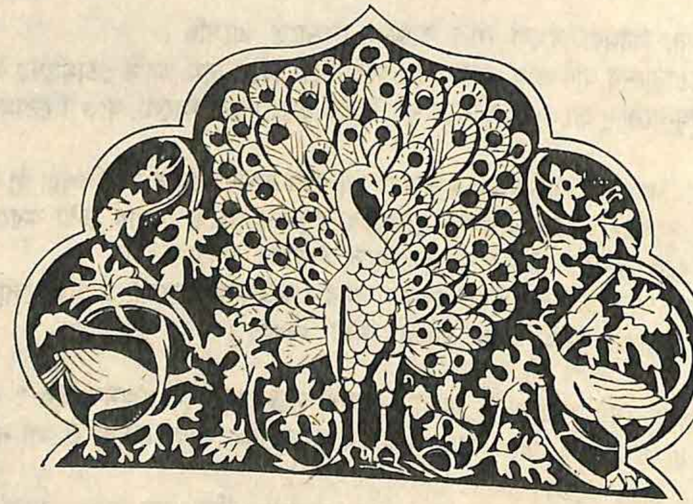
ঝুমুনা আর রুমুনা উড়তে উড়তে একটা সুন্দর গান ধরলো। ঠিক যেন বাঁশির মতন আওয়াজ বেরুলো তাদের গলা দিয়ে। সেই গান শুনে এক একজন পুলিশ ধুপধাপ করে পড়ে যেতে লাগলো মাটিতে। সবাই অজ্ঞান। এমনকি গাছের পাখিরাও ঘুমিয়ে পড়লো।

রুমুনা আর ঝুমুনা নিচে নেমে এসে রণজয় আর গুটুলির হাত ধরে আবার উড়ান দিল। বনের মাথা ছাড়িয়ে, অনেক অনেক ওপরে, প্রায় মেঘের কাছে চলে এলো ওরা। রণজয়ের বুকে গুলি লেগেছে, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে, কিন্তু তার প্রাণ আছে। রুমুনা আঙুলে করে তার মুখের একটু থুতু রণজয়ের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিতেই তার রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

চোখে ফুঁ দিয়ে ওদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো ঝুমুনা। তারপর বললো, এবারে মেঘের পিঠে বসিয়ে দেবো তোমাদের। ভাসতে ভাসতে চলে যাবে সমুদ্রে। এই খেলাটা তোমরা জান ?

রণজয় বললো, না, জানি না। লক্ষ্মী দুই মেয়ে, তোমাদের কাছে আমি হেরে গেছি। হেরে গিয়েও আনন্দ হচ্ছে !





তিনু কাকার অন্তর্ধান রহস্য

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনুকাকুকে নিয়ে আমার বাবা কাকারা শেষ পর্যন্ত সত্যি ভারি মহাফাঁপরে পড়ে গেলেন। কী যে করা যায়। দুদুকাকুর ব্রহ্মতালু জ্বলছে রাগে। ঠাকুমার ভয়ে কিছু বলতেও পারছেন না। বললেই এক কথা, তুই আবার তিনুটার পেছনে লাগলি। দাঁড়া, উপেন বাড়ি আসুক, যদি না বলছি তবে আমার নামে কুকুর পুষিস। উপেন অর্থাৎ আমার সোনা জ্যাঠামশাই—তিনি এলে নালিশ দিয়ে দুদুকাকাকে ডেকে শাসন করবেন, তোরা কী হলি, মার কথা অবজ্ঞা করিস! আমাদের সামনে দুদুকাকা চান না, তাঁর দাদা এসে তাঁকে ধমকান। তবু মাথা যে ঠিক রাখতে পারছেন না বুঝতে পারছি। ঠাকুমা এ বাড়ি ও-বাড়ি গেলেই হুংকার, হারামজাদা তোকে ধরে খড়মপেটা না করলে তুই সজুত হবি না! ভেবেছিস কি! সাপের পাঁচ পা দেখেছিস! বাড়িতে কেউ তিষ্ঠোতে পারবে না দেখছি। ছেলেপিলেদের পড়াশোনা পর্যন্ত লাটে তুললি!



ঠাকুমার এখন এক কথা, দেখিস তিনুটা যেন আবার ভেগে না যায়। ভেগে গেলে যে দুদুকাকার রক্ষা থাকবে না, তিনুকাকার সর্বনাশের মূলে দুদুকাকা—এ সব সাত পাঁচ চিন্তায় কাকা আমার সত্যি অস্থির।

দুদুকাকা দেখলেন, তিনুকাকা গোপাটের দিকে যাচ্ছে। আমরা গুপ্তচর বৃত্তিতে আছি। দুদুকাকা খবর পেলেই দৌড়ে হাজির।—এই কোথায় যাচ্ছিস! এক পা বাড়ি থেকে নড়লে ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব। পাজি হতচ্ছাড়া, ভাগার তালে আছে। যা বাড়ি যা, ঘরে গিয়ে বসে থাক; বৌমা না আসা পর্যন্ত তোমার ছুটি নেই।

—বলছি তো তোমাদের বৌমাকে খবর দেবে না। দিলেই ভাগব।

এদিকে কাকীমাকে খবর না দিয়েও উপায় নেই। কাকা তখন নিরুদ্দেশ। ঠাকুমার সারাদিন বারান্দায় ঠ্যাং ছড়িয়ে বিলাপ—আমার দশটা না পাঁচটা না, একটা ভাইপো, বিবাগী হয়ে তুই কোথায় চলে গেলি রে তিনু! তোকে কে আছে রে দেখার! তুই কেন চলে গেলিরে! যাবি তো খবর দিয়ে কেন গেলি না রে! কাকে এখন খুঁজতে পাঠাই রে। বাড়িতে আমার এক পাল রাক্ষস কেবল গিলতে জানে রে। তোর খোঁজে আমি কাকে যে পাঠাই রে! আমার বৌমার কী হবে রে!

কাঁহাতক সহ্য করা যায়। বাবা কাকারা সব প্রবাসে। দুদুকাকা বাড়ি থাকেন। ঠাকুরপূজা, জমি, যজমান সব দেখেন। পঞ্চুকাকা গরু বাছুর গোয়াল। আসলে দুদুকাকা কেন খুঁজতে বের হচ্ছে না, পঞ্চাটা কী করে দিবানিদ্রা দিতে পারে এত বড় দুর্ঘটনার পর ঠাকুমার মাথায় সেটাই আসছে না। ফলে বসিরের কাছ থেকে খবর পেয়েই আমরা রওনা হয়েছিলাম নিখোঁজ বামালের খোঁজে। পেয়েও গেছিলাম।

বিয়ের আগে ঠাকুমার ভাই বেঁচে থাকতেও কাকা আমার মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। তখন কেশব দাদু চিঠি দিত দিদিকে, তিনুটা আবার উধাও। কী যে করি!

কাজেই তিনুকাকার উধাও হওয়া নিয়ে আমাদের কোনো দুশ্চিন্তা হত না। বেরিয়েছে, আবার ফিরে আসবে। কিন্তু মুশকিল হত ঠাকুমাকে নিয়ে।

ঠাকুমা ভারি উচাটনে পড়ে যেতেন তখন। পঞ্চুকাকাকে পাঠাতেন খবর দিয়ে—বিয়ে দিয়ে দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কেশব দাদু আসতেন। একদিনের পথ। তাও চলে আসতেন। এসে বলতেন, বিয়ের কথা তুললেই ভাগছে।

ঠাকুমার এক কথা, আমি পাত্রী ঠিক করে রেখেছি। এবার এলেই পিঁড়িতে বসিয়ে দিতে হবে।

—কিন্তু দিদি!

—আরে কিন্তুটা কী বলবি তো!

—ও যে বলছে অতি ঝক্কি পোহাতে পারবে না।

—ও বলল, আর তুই শুনলি। অমন বলে থাকে। এবার ফিরে এলেই খবর দিয়ে দিবি। উপেন, জলু, অভিমন্যু সবাই চলে যাবে। আমিও যাচ্ছি। বাড়ি উজাড় করে সব তোর ওখানে তুলে নিয়ে যাব। পায়ে পায়ে লোকজন থাকবে। ভাগেটা কী করে দেখব! বিয়ে দিলেই দেখবি দায়িত্বজ্ঞান বাড়বে। বাউণ্ডুলেপনা মাথায় উঠবে। বাড়ি থেকে নড়তেই চাইবে না। এমন মহৌষধ প্রয়োগে কাকা আরোগ্যলাভ করবেন জেনেই গত বৈশেখে বিবাহ।



মাসখানেক বাদে কেশব দাদুর চিঠি, এবার আর মরতে ভয় পাই না দিদি, শান্তিতে মরতে পারব। তিনুটার সংসারে মন বসেছে। দাদু সত্যি কিছুদিন যেতে না যেতে সজ্ঞানে মারা গেলেন। আর কাকাও তারপর একদিন সজ্ঞানে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়লেন।

আগে আসত দাদুর চিঠি, এবারে কাকীমার চিঠি। ঠাকুমাকে লিখেছে, পিসিমা আপনার ভাইপো, আজ ক'দিন হল বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে। এত জমাজমি গাছপালা বাগান দেখি কী করে! ও যে কোথায় গেল—দীর্ঘ চিঠি। কোথাও কোন রাগ অভিমানের প্রশ্ন নেই।

তিনুকাকার বের হয়ে পড়াটা আমাদের কত বড় যে সংকট তখন দুদুকাকার চোখ মুখ দেখলে টের পেতাম।

—আরে গেলি!

ঠাকুমার চিৎকার—যা, বসিরকে খবর দে। পঞ্চারে পাঠা গোপালদি। অচল ভোলা উমাকে পাঠা—এক একদিকে তোরা বের হয়ে পড়।

দুদুকাকা না পারলে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত !—কোথায় খুঁজব। উমা অচলের পড়াশোনা নেই ! ঠাকুমার এক কথা, পড়াশোনা করার সময় অনেক পাবে—ওটা ভেসে যাবে না। কিন্তু আমার ভাইপোটা ভেসে গেলে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তারপর খুঁজেও পাওয়া গেল। ধরে আনাও গেল। কড়া পাহারা। আমাদের ইস্কুল ফিস্কুল মাথায়। পড়াশোনা করলেও হয়, না করলেও হয়। দুদুকাকার মেজাজ সপ্তমে, তিনিই আমাদের অভিভাবক। পড়তে বসতে বলতে পারেন না, ইস্কুলে যেতে বলতে পারেন না। কারণ ঠাকুমার কথার উপর কারো কথা নেই। আমাদের জ্যাঠা কাকারা মিলে ছ'জন, চার পিসি—সবার বড় বেশি মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য—এ-হেন পরিস্থিতিতে দুদুকাকা বড় অসহায়। কিছু বললেই বাবা কাকারা প্রবাস থেকে এলে নালিস, আমাকে তোরা কাশী পাঠিয়ে দে। আমি এখন কে ! ডালু আমার কথার মর্যাদা দেয় না। তোমাদের এখন সবার পাখা গজিয়েছে, আমি নিমিত্ত মাত্র। কালই বারদী চলে যাব। অপমান আর সহ্য হয় না।

বারদী থেকে স্টিমারে নারানগঞ্জ, তারপর কলকাতা—ঠাকুমার বোন কাশীবাসী, সতীলক্ষ্মী পুণ্যবতী না হলে জীবনে এমন হয় না। মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট জায়গা। সংসারের টানে সেই মোক্ষলাভ পর্যন্ত হচ্ছে না। রেগে গেলেই মোক্ষলাভের জন্য অধীর হয়ে ওঠা তাঁর অভ্যাস। বার্ধক্যে বারাণসী মনে করিয়ে দিয়ে বলবে, সব থাকল, চললাম। এই একটা ভয়ে বাবা জ্যাঠা এবং কাকারা বড়ই জুজু ঠাকুমার কাছে। মার কোন অভিযোগ শুনতেই তাঁরা রাজি না। দুদুকাকা সবার ছোট। বাড়ি থাকেন, জমিজমা, গৃহদেবতা, যজমান সব সামলানোর দায় তাঁর। আর আছে পঞ্চুকাকা, গোয়াল-ঘর, গরু বাছুর, চাষ আবাদের মালিক। তিনি আমাদের সংসারে, দুদুকাকার পরই দ্বিতীয় মনিব। এই মনিবের ঠেলাতেই, তিনুকাকাকে এবারে পাকড়াও করা গেছে। আর আছে একজন, সবাই জানে তাকে চোরা বসির। সেও নানা অঞ্চলের খবর দিয়ে যায়—বাড়ি ঢুকতে অবশ্য ভয় পায়। ভয় দু-কারণে—এক আমার পাগল জ্যাঠামশাই আর এক পঞ্চুকাকা। সেই বলেছিল, আমাদের বাড়িতে এক জোড়া বাস্তু সাপ আছে। দুধগুখরো। ঠাকুরদার খাটের নিচে, মেঝের গর্তে তার নিবাস।

চোরা বসির না থাকলে এবারে আমরা খবর পেতাম না, তিনুকাকা কোথায় ঘাপটি মেরে আছেন। বসিরের মাথায় থাকে মেটে হাঁড়ি, আর এক জোড়া কেউটে। সে আমাদের কেউটে সাপের খেলা দেখিয়ে আকৃষ্ট করে। আমার ঘর থেকে চাল ডাল সুপারি পান, যা কিছু জ্যাব ভর্তি করে নিয়ে যাই গোপাটে। সে কখনও আমাদের কচ্ছপের ডিম দেয়। সেই খবর দিয়েছিল, অনুমান হয়।

—অনুমান।

অনুমান হয়, তিনু কর্তা দন্দির শ্মশানে আইসা মকুব দিছেন। এলাহী কাণ্ড।

কথাটা পাঁচকান না হয় সে জন্য চুপি চুপি বসির বলেছিল, আল্লার মর্জি না হলে হয় না। ফকির দরবেশ আউলিয়া সব তাঁর মর্জিতে। আপনার আমার সাধ্য কি ! আসলে বসিরের ধারণা, ঈশ্বরের অসীম কৃপা না থাকলে সংসার ছেড়ে বিবাগি হওয়া যায় না।



তখন আমার ঠাকুমার অনশন চলছে। কাকীর চিঠি পেয়েই ঠাকুমা নিরামিষ ঘরের বারান্দায় বিলাপ শুরু করে দিয়েছিলেন, ওরে তিনু রে, তুই কোথায় গেলি রে বাপ ! আমার দাদার কী হবে রে ! বৌমা জলে ভেসে গেল রে ! আমার বাড়িতে কে আছে রে খোঁজখবর নেয়। সব কটা বৌদির কথায় ওঠে বসে রে ! এ-হেন অবস্থা যখন চলছে, গাঁয়ের মানুষজন ঠাকুমার বিলাপে বাড়িতে অষ্ট প্রহর হাজির, বোঝ প্রবোধ দিচ্ছে, কে শোনে কার কথা—দুদুকাকা শিরে সংক্রান্তি ভেবে বের হয়ে পড়েছেন—একদিকে পঞ্চুকাকা গেছে, অন্যদিকে দুদুকাকা, কিন্তু দিনের শেষে ঘর্মাক্ত হয়ে ফিরছেন, খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, তখনই আমরা চার ভাই বাড়ি দৌড়ে গিয়ে পঞ্চুকাকার মারফত খবর দিলাম, তিনুকাকা দন্দির শ্মশানে ধুনি জ্বালিয়ে বসে গেছে। খবরটা বসিরই দিয়ে গেছে।

খবর পাওয়া মাত্র ধাওয়া-ঠিক মক্কেল সেখানে। চেনার উপায় নেই, গেরুয়া পরনে, জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। গালে লম্বা দাড়ি। বোঝার উপায় নেই তিনুকাকা। পঞ্চুকাকা ঠিক বুঝতে পেরে যেই না সাধুবাবার কুঁড়েঘরে হাজির, তখনই লম্বা দৌড়। এই দৌড় দেখেই বুঝেছিলাম, ঠিক আমার তিনুকাকা না হয়ে যায় না। আমাদের সার্কাস দেখাবার জন্য নিয়ে গিয়ে এ-ভাবে একবার দৌড়ে মেলা থেকে পালিয়েছিলেন। যত ডাকি, তিনুকাকা, কোনো ভয় নেই, টিকা দিতে এসেছে, পালাচ্ছ কেন ? তিনুকাকা কি একা, মেলাসুদ্ধু লোক দৌড়াচ্ছে। কলেরা বসন্তের প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে সরকারী দায়িত্ব নিয়ে এসেছে যারা, তারা তো হতভম্ব। সবাই দৌড়ায়।

মুরগির ঝাঁপি ফেলে দৌড়ায়। কাঁচের চুড়ি চিনেমাটির পুতুল ফেলে দৌড়ায়। জিলিপির কড়াই উল্টে দিয়ে দৌড়ায়। মেলা একেবারে ফাঁকা। আমরা দৌড়াই তিনুকাকাকে ধরার জন্য। পৃথিবীর হেন জায়গা নেই, তিনুকাকা না গেছে—ভ্রমণ তার একমাত্র বিলাস। সেই তিনুকাকা কাকীমার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্য বোধহয় আবার ভ্রমণে বের হয়ে পড়েছেন।

পঞ্চুকাকা আমাদের খুবই বলশালী মানুষ। তার সঙ্গে পারবে কেন। দু-লাফে কাকার জটা সাপটে ধরতেই ফসকে গেল। পঞ্চুকাকার হাতে নকল পরচুলা, তিনুকাকা তখনও ছুটছে। দুদুকাকার ধমকে পঞ্চুকাকার চৈতন্য উদয়।—আরে পালাচ্ছে, ধর ধর। পরচুলা ফেলে দৌড়া।

পঞ্চুকাকা এবার দাড়ি সাপটে ঝুলে পড়ল। তিনুকাকা আর যায় কোথায়! দাড়িটা নকল নয়, পঞ্চুকাকা ঝুলে পড়তেই টের পেয়েছিল।

দুদুকাকার হুমকি, আবার তিনু তুই নিরুদ্দেশ। তুই কি আমাদের শান্তিতে বসবাস করতে দিবিনে।

তিনুকাকা চুপ।

—হাঁট। তিনুকাকা হাঁটতে থাকল।

বাড়ি এসে তিনুকাকা আমাদের নিয়ে নাপিত বাড়ি গেল। দাড়ি কামিয়ে বলল, ওম শান্তি! আর দাড়ি রাখছি না। দাড়িটাই কাল হয়েছে!

আমরা বললাম, ওম শান্তি বলছ কেন তিনুকাকা।

—বুঝলি না, বাঁধন অলগা হল। দাড়িটাই যত নষ্টের গোড়া।

সেই থেকে আছেন তিনুকাকা। কাকীমা না আসা পর্যন্ত ছাড়া হবে না। কাকীকে আনতে লোক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা দশ বার ক্রোশ পথ। একদিনে যাওয়ার উপায় নেই। খাল বিল নদী টিলা ডিঙ্গিয়ে যেতে হয়। কোন সড়ক পথ নেই। কাকীমা ডুলিতে আসবেন। আর গেলেই তো কাকীমা আসতে পারবেন না। সংসারে একা মানুষ। এক বুড়ি মাসি থাকে সঙ্গে। বাড়িতে গৃহদেবতা আছে। চাকর বাকর আছে। সবাইকে সব বুঝিয়ে তবে না আসা! কাজেই কাকীমা না আসা পর্যন্ত আমাদের কাজ তিনুকাকাকে পাহারা দেওয়া।

তিনুকাকা মাঝে মাঝে খুবই চটে যেতেন—এই তোরা যা। আমি মাঠে যাব।

—আমরাও যাব।

—তোরা কি আমার হাগা মোতা বন্ধ করে দিবি!

দুদুকাকা বলেছে, ও যাই বলুক সঙ্গে থাকবি। রাতে পাহারার ভার পঞ্চুকাকার। দক্ষিণের ঘরে আমরা চার ভাই। বড়দা মেজদা একপাশে। তিনুকাকা মাঝখানে। আমি আর শান্তি একপাশে। নিচে দরজার পাশে পঞ্চুকাকার বিছানা। দরজায় তালা দেওয়া।

—অ পঞ্চু শুনছ! মধ্যরাতে তিনুকাকার গলা।

—আজ্ঞে।



—কৃপা হোক!

কৃপা হোক মানে দরজার তালা খুলে দাও।

পঞ্চুকাকা দরজার তালা খুলে হ্যারিকেন উসকে সঙ্গে সঙ্গে আছে।

সারা রাত এই চলে। পঞ্চুকাকা শোয়। ঘুম লেগে আসতে না আসতেই, আবার ডাক, পঞ্চু কৃপা হোক!

এ-ভাবে সারারাত চললে কাঁহাতক সয়। সহসা ক্ষেপে গিয়ে পঞ্চুকাকা বলে ফেলল, কৃপা করে হাগা মোতার কাজটা ঘরেই সারুন কর্তা। আর পারি না।

কাকা জামা তুলে পঞ্চুর হাতখানা পেটে চেপে ধরলেন। তারপর বললেন বুঝতে পারছ? কাকার বড় কাতর মুখ।

—কী।

—কান পেতে শোন! বলে কাকা দু-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন।

পঞ্চুকাকা কান পেতে শুনতে গিয়ে খটাস করে লাফিয়ে উঠল।—উরে ব্বাস! আল্লার গজব চলতাছে!

—হ্যাঁ গজব। সাধে কি বিবাগী হই পঞ্চু। বড় কষ্ট! পেটে ঐরাবত ডাকছে।

আমরাও ঘুমাতে পারছি না! পেটে আল্লার গজব—কী ব্যাপার, তাজ্জব বনে গেছে পঞ্চুকাকা। পেটে এমন দুরমুস চলছে—আর কর্তা এত নির্বিকার! আমরাও হতবাক, পেটে ঐরাবত ডাকে কেন?

বড়দা বলল, পঞ্চুকাকা, কি হয়েছে। ঐরাবত ডাকে কেন ?

পঞ্চুকাকা বলল, পেটখানা দেখ, ফেঁপে ঢোল। ভুটভাট—খৈ ফুটছে জালার ভিতর। তোদের তিনু কাকার পেট ফাঁসল বলে !

আমরা আর কান পাততে সাহস পেলাম না। পেট ফেঁসে গেলে উর্ধ্বগতি।

বড়দা বলল, দুদুকাকাকে ডাকি !

সহসা তিনুকাকা ধড়ফড় করে উঠে বসলেন, না না, দাদারে ডাকছি না ! ঘুমাচ্ছে। উঠলেই ক্ষেপে যাবে।

পঞ্চুকাকা বলল, হজমের বড়ি খান। দিচ্ছি।

—হজমের বড়ির কম্ম নয় ওটা পঞ্চু ! সাধে কি গৃহছাড়া হই। একখান পুঁটুলি আছে আমার জ্যাবে। সর্বক্ষণ পাহারাদেও ভাল। কিন্তু হাগা-মোতা নেশা-ভাঙ দুই মানুষের বড় প্রয়োজনীয় বস্তু। তোমাদের বৌমার সেটা আদপেই মালুম হয় না। আলসেতে টিকা গুঁজে দাও একখানা পঞ্চু ! আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোরা বসে থাকলি কেন ! ঘুমা। কলকে জ্বালাও, দেখবে ঐরাবতের ডাকাডাকি সব বন্ধ।

আমরা একসঙ্গে সটান শুয়ে পড়লাম। ঘুমের ভান করে পড়ে আছি।

পুঁটুলিটা খুলে কি বের করছেন তিনুকাকা। পঞ্চুকাকা খুবই জব্দ। সারারাত জাগিয়ে রাখলে কে না জব্দ হয়। কানে কানে পঞ্চুকাকার কী যেন বললেন আর তখনই পঞ্চুকাকা তাড়াতাড়ি একখানা ছোট কাঠ, এবং ছুরির বন্দোবস্ত করতেই কাকা ব্যোম শংকর বলে আসন পিঁড়ি করে বসে গেলেন। নিবিষ্ট মনে কাঠে কুচি কুচি করে কী কাটলেন। তারপর তালুতে রেখে ঘষলেন অনেকক্ষণ—তারপর ছোট একখান নাড়ুর মতো বস্তু কলকেয় বসিয়ে জ্বলন্ত টিকা গুঁজে ফুঁ দিতে থাকলেন। হ্যারিকেন জ্বলছে। পঞ্চুকাকা নিবিষ্ট মনে দেখছে। সত্যি আল্লার মেহেরবানি না থাকলে কর্তার চোখ মুখ এমন অপার্থিব হবার কথা নয়। আসন পিঁড়ি হয়ে ঘাড় নিচু করে ফুস ফুস ফুস—ফটাস। যেন মাথার খোপড়া উড়ে গেল। তারপর কতক্ষণ একভাবে বসেছিলেন আমরা জানি না। কখন এসে আমাদের মাঝখানে শুয়েছেন জানি না, কখন ঘুমিয়েছেন জানি না—আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেছি, কাকা নাক ডাকাচ্ছেন, কখন ঘুম থেকে উঠবেন তার কোন লক্ষণ নেই।

পঞ্চুকাকা আর দুদুকাকা বাইরের উঠোনে তিনুকাকাকে নিয়ে কী সব বলাবলি করছেন !

দুদুকাকা বললেন তুই গিয়ে মাকে বুঝিয়ে বল।

পঞ্চুকাকা বলল, না আপনে যান কর্তা।



দুদুকাকা বললেন, না, তুই যা। তুই গিয়ে বুঝিয়ে বললে মা বুঝবে।

তিনুকাকা বলল, আমার বুক কাঁপছে কর্তা।

—কাঁপুক। তবু যা। তুই তো আমার সব কথা রাখিস।

ঠাকুমা আমার খান্ডারনি বোঝা যায়। সবার অবস্থা ত্রাহি মধুসূদন করে ছাড়েন। ঠাকুমা মুড়ির ধান বের করে দিচ্ছিলেন তখন। পঞ্চুকে অসময়ে অন্দরে দেখেই বললেন, কি রে এখানে কেন!

—কর্তা মা একখান কথা ছিল! বৌদিমণি আসছেন। বড় সার কথা। বৌদিমণিরে ধরিয়ে দেবেন। না দিলে তিনু কর্তা আবার বিবাগী হবে।

—হতচ্ছাড়া আবার বিবাগী হবে বলছে! কিসের অভাব! দাদা কি কিছু কমতি রেখে গেছে! বৌমা আমার লক্ষ্মী প্রতিমার মতো দেখতে।

—তা কর্তা-মা তবু হয়।

—হয়। হতে দিচ্ছেটা কে! কোন কাম কাজ নেই তোর! নিজের কাজে মন দে।

পঞ্চুকাকা ফিরে যাচ্ছিল।

দুদুকাকা হাত টেনে ধরলেন।—বললি!

—শুনতে চাইল না। কাম কাজে ফাঁকি দিচ্ছি ভাবছে।

—সে ভাবুক। তুই আয়। সঙ্গে না হয় আমি থাকছি!

—চলেন তবে। গোমড়া মুখে পঞ্চুকাকা দুদুকাকার পাশে হাঁটছে।

—মা পঞ্চু বলছিল·····

—সে তো অনেকক্ষণ থেকেই বলছে।

হঠাৎ দুদুকাকা ক্ষেপে গেল। বলল, ঠিক আছে, আমাদের কী! এবার তোমার ভাইপো বিবাগী হলে, আমরা নেই। বাড়াবাড়ি করলে, বিলাপ জুড়লে, আমি পঞ্চু দু'জনেই বিবাগী হয়ে যাব। তখন বুঝবে ঠ্যালা।

আমরা ঠাকুমার চারপাশে ঘিরে আছি। আমরাই একমাত্র ঠাকুমাকে ভয় পাই না। বললাম, কাকারা বিবাগী হয়ে গেলে কী হবে ঠাকুমা! আমরা খুঁজতে যাব কী করে!

—যা হবার হবে। যার কেউ নেই তার কে দেখে!

দুদুকাকা পঞ্চুকাকার দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে তিনুর বৌকেই বলে দেব।

—কি বলবি।

—তিনুর নেশা ভাঙের অভ্যাস আছে। বৌমা নেশা করতে দেয় না। চোখে চোখে রাখে বলে বাড়ি থেকে পলাতক। বৌমাকে বলে দিও, যেন একটু আধটু নেশাভাঙ করতে দেয়। না দিলে পেট ফেঁপে বাড়িতেই একদিন টেঁসে যাবে।

—তিনু নেশা করে? কি নেশা!

তিনুকাকা মাথা চুলকে বলল, নেশা! মানে গাঁজা খায়!

—হতচ্ছাড়া গাঁজা খায়। ও আমার কি হবে! তারপরই বলল, পালায় নি তো?

—না। ঘুমাচ্ছে।

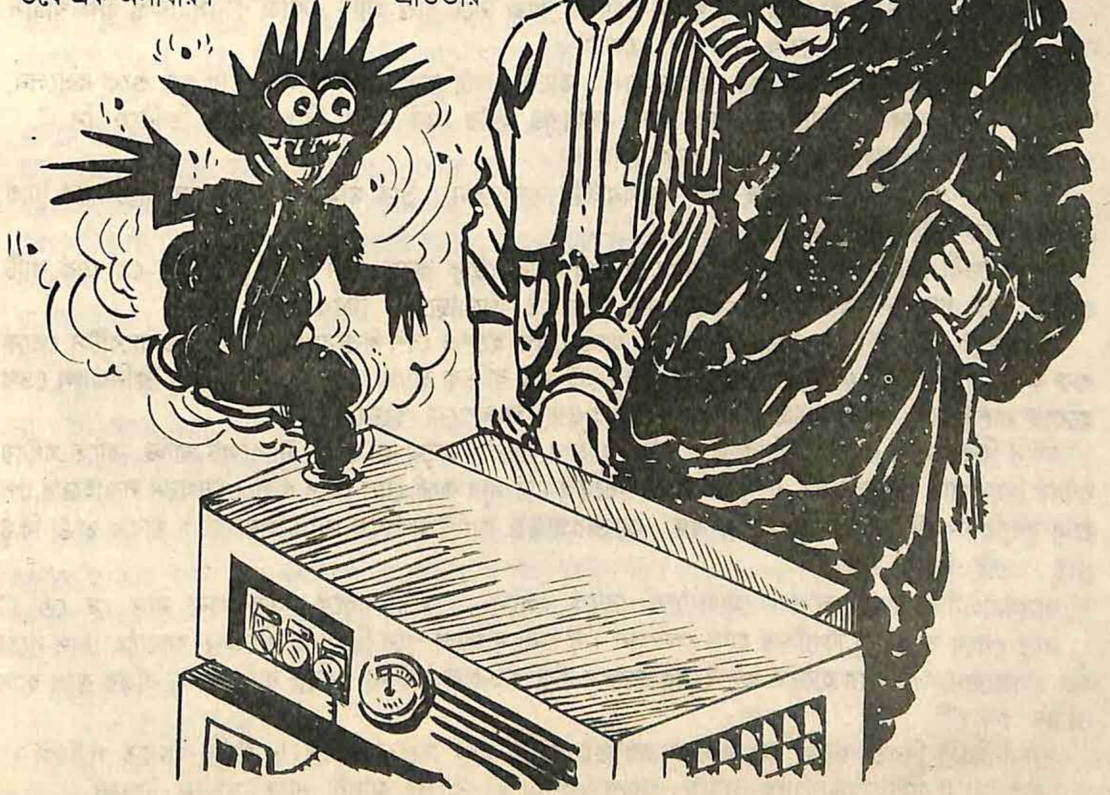
—ঘুমাচ্ছে! ঘুম আমি বের করছি। কখন রোদ উঠে গেছে এখনও ঘুমাচ্ছে! বলেই ঝাঁটা নিয়ে ভাইপোকে জাগাবার জন্য ছুটতে গেলে, পঞ্চুকাকা যে-ভাবে দুদুকাকার দাড়ি ধরে ঝুলে পড়েছিল তেমনি আমরা চারভাই সবাই মিলে ঠাকুমার কোমর ধরে ঝুলে পড়লাম। ঠাকুমা আর এতটুকু নড়তে পারল না। তিনুকাকার নাম করে হাওয়ায় ঝাঁটা ঘোরাতে থাকল। আর বিলাপ, হায় আমার বৌমার কপালে শেষে এই লেখা ছিল রে!

ভুতুড়ে কুকিং

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বাসবনলিনী দেবী অটো নাড়ু মেশিনের তিনটে ফুটোয় নারকেল-কোরা, গুড় আর ক্ষীর ঢেলে লাল বোতামটা টিপে দিয়ে অঙ্কের খাতাটা খুলে বসলেন। এলেবেলে অঙ্ক নয়। বাসবনলিনী যে-সব আঁক কষেন, তার ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান অনেক ভেলকি দেখিয়েছে। আলোর প্রতিসরণের ওপর তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব মহাকাশবিজ্ঞানে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এই দু' হাজার একান্ন সালে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জে মানুষ যে যাতায়াত করতে পারছে, তার পিছনে বাসবনলিনীর অবদান বড় কম নয়।

যদি বয়সের প্রশ্ন ওঠে তো বলতেই হয় যে, বাসবনলিনীর বয়স হয়েছে। এই একশো একাশি বছর বয়সের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে মোট চারবার। ডাক্তাররা যাকে বলেন ক্লিনিক্যাল ডেথ্। তবে এক অসাধারণ প্রতিভার



অধিকারিণী বলে আধুনিক চিকিৎসা ও শল্যবিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে। হৃদযন্ত্রটি অকেজো হয়ে যাওয়ায় সেটা বদল করে একেবারে পাকাপাকি যান্ত্রিক হৃদ্‌যন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটো চোখই নতুন। কিডনিও পাল্টাতে হয়েছে। তা ছাড়া মস্তিষ্কের বার্ধক্য ঠেকাতে নিতে হয়েছে নানারকম থেরাপি। তিনি তিনবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নামডাকও প্রচণ্ড। কিন্তু বাসবনলিনী একেবারে আটপৌরে মানুষ। আঁক কষেন, বিজ্ঞানচর্চা করেন, আবার নাতিপুতি নিয়ে দিব্যি ঘর-সংসারও করেন।

বলতে কী, তাঁর নাতিরাও রীতিমত বুড়ো। তবে নাতিদের নাতিরা আছে, তস্য পুত্র-কন্যারা আছে। বাসবনলিনীর কি ঝামেলার অভাব ? এই তো পাঁচুটা তিন দিন ধরে "নাড়ু খাব, নাড়ু খাব" বলে জ্বালিয়ে মারছে। আও অন্য কারও হাতের নাড়ু নয়, বাসবনলিনীর হাতের নাড়ু ছাড়া তার চলবে না। পাঁচুর বয়স এই সবে আট। বাসবনলিনীর মেজো ছেলের সেজো ছেলের বড় ছেলের ছোট ছেলের সেজো ছেলে। কে যে কোন্ ছেলের কোন্ ছেলের কোন্ ছেলে, বা কোন্ মেয়ের কোন্ মেয়ের কোন্ মেয়ের মেয়ে, বা কোন্ ছেলের কোন্ মেয়ের কোন্ ছেলের কোন্ মেয়ে, বা কোন্ ছেলের কোন্ ছেলের কোন্ মেয়ের কোন্ মেয়ে, সে-সব হিসেব রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। বাসবনলিনীর একটা গার্হস্থ্য কমপিউটার আছে, তাতে সব তথ্য ভরা আছে। কে পাঁচু, কে হরি, কে গোপাল, কে তাদের বাপ-মা ইত্যাদি সব খবরই বাসবনলিনী চোখের পলকে জেনে নিতে পারেন।

কাজেই অসুবিধে নেই। তা ছাড়া কে কোন্‌টা খেতে ভালবাসে, কোন্‌টা পরতে পছন্দ করে, কে একটু খুঁতখুঁতে, কে খোলামেলা, কে ভিতু, কে-ই বা দুর্বল, কে পেটুক, কে ঝগড়ুটে, সবই কমপিউটারের নখদর্পণে।

কে যেন বলে উঠল, "মা নাড়ু হয়ে গেছে। গরম খোপে ঢুকিয়ে দেব ?"

কণ্ঠস্বরটি, বলাই বাহুল্য, মানুষের নয়। অটো নাড়ু মেশিনের।

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে মেশিনের দিকে চেয়ে বললে, "তোর বুদ্ধির বলিহারি যাই মোক্ষদা, নাড়ু গরম রাখলে আঁট বাঁধবে কী করে শুনি !"

"ভুল হয়ে গেছে মা।"

"অত ভুল হলে চলে কী করে ? দেখছিস তো বড় কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। কাজ করিস, কিন্তু বুদ্ধি খাটাস না। কেমন করলি নাড়ু, দেখি, দে তো একটা"

মেশিন থেকে একটা যান্ত্রিক হাত বেরিয়ে এল। তাতে একটা নাড়ু। বাসবনলিনী তার গন্ধ শুঁকে বললেন, "খারাপ নয়, চলবে। স্টোরেজে রেখে দে। তারপর সুইচ অফ করে দিয়ে একটু জিরিয়ে নে।"

"আচ্ছা মা।" বলে মেশিন চুপ করে গেল।

খুক্ করে একটা কাসির শব্দ হওয়ায় বাসবনলিনী তাকালেন। তাঁর স্বামী আশুবাবু সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক কী যেন খুঁজছেন।

বাসবনলিনী চড়া সুরে বললেন, "আবার এ-ঘরে ছোঁক ছোঁক্ করছ কেন ? একটু আগেই তো এক বাটি রাবড়ি আর চারখানা মালপোয়া খেয়ে চাঁদে বেড়াতে গিয়েছিলে। ফিরে এলে কেন ?"

আশুবাবুর বয়স একশো একানব্বই বছর। একটু রোগা হলেও বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে অনেক রকম রোগ তাঁর শরীরে। একটু খাই-খাই বাতিক আছে। তাঁরও বার-পাঁচেক ক্লিনিক্যাল ডেথ হয়েছে। শরীরের অনেক যন্ত্রপাতি অকেজো হওয়ায় বদলানো হয়েছে।

তিনি বিরস মুখে বলেন, "ছোঁকছোঁক করি কি আর সাধে ? নতুন যে গ্লাটন ট্যাবলেট খাচ্ছি, তাতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়। চাঁদে গিয়ে একটু পায়চারি করতেই মার-মার করে ফের খিদে হ'ল। সেখানে লড়াইয়ের চপ আর ফুলুরির কাউন্টারটা আজ আবার বন্ধ। আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যান্টিনে গিয়ে দেখি সিনথেটিক খাবার ছাড়া কিছু নেই। তাই ফিরে এলুম।"

বাসবনলিনীর করুণা হ'ল। মোক্ষদাকে ডেকে বললেন, "ওরে বাবুকে কয়েকখানা নাড়ু দে তো।"

নাড়ু পেয়ে আশুবাবু বিগলিত হাসি হাসলেন। দু'খানা দু'গালে পুরে চিবোতে চিবোতে আরামে চোখ বুজে এল। বললেন, "তোমার হাতের কলাইয়ের ডালের বড়ি কতকাল খাই না। আজ রাতে একটু বড়ির ঝাল হলে কেমন হয় ?"

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে আঁক কষতে কষতেই একটা হাঁক দিলেন "ওরে ও খেঁদি, শুনতে পাচ্ছিস ?"

"যাই মা।"বলে সাঁড়া দেয় একটা কালো বেঁটেমতো কলের মানবী এসে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী বললেন, "বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে নাকি !"

"খুব বৃষ্টি হচ্ছে মা, সৃষ্টি ভাসিয়ে নিচ্ছে।"

"তা নিক। বুড়োকর্তা রাতে বড়ির ঝাল খাবেন। যা গিয়ে খানিকটা কলাইয়ের ডাল বেটে ভাল করে ফেটিয়ে রাখ। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

খেঁদি চলে গেল।

আশুবাবু নাড়ু খেয়ে এক গেলাস জল পান করলেন। তারপর পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "নাড়ুগুলো খাসা হয়েছে।"

বাসবনলিনী অঙ্কের খাতাটা বন্ধ করে উঠলেন। স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, "ঘরে বসে থাকলে কেবল খাই-খাই করবে। তার চেয়ে যাও না একটু দক্ষিণ মেরু থেকে বেরিয়ে এসো।"

আশুবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "দক্ষিণ মেরুতে ভদ্রলোক যায় কখনও ?"

"কেন কী হয়েছে ?"

"সেখানে সামিট মিটিং হবে বলে ঝাড়পোঁছ হচ্ছে। লোকেরা ভারী ব্যস্ত। খুব গাছটাছ লাগানো হচ্ছে, মস্ত-মস্ত হোটেল উঠছে। অত ভিড় আমার সয় না। তার চেয়ে বরং আলাস্কায় গিয়ে একটু মাছ ধরে আনি।"

"তাই যাও। কিন্তু সন্ধে সাতটার মধ্যে ফিরে এসো। এখন কিন্তু দুপুর দেড়টা বাজছে।"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, রাতে বড়ির ঝাল হবে, আমি কি আর দেরি করব ?"

আশুবাবু বেরিয়ে গেলেন। বাসবনলিনী গিয়ে খেঁদির কাজ দেখলেন। ডাল বেশ মিহি করে বেটে ফেনিয়ে রেখেছে খেঁদি। বাসবনলিনী দেখে খুশি হয়ে বললেন, "এবার অটোবড়ি মেশিন দিয়ে বড়িগুলো ভাল করে দে। যেন বেশ ডুমো ডুমো হয় !"

"দিচ্ছি মা।"

বড়ি দেওয়া হতে লাগল। বাসবনলিনী জানালা খুলে দেখলেন, বাইরে সাঙ্ঘাতিক ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। বাসবনলিনী ঘরের দেওয়ালের একটা স্লাইডিং ডোর খুলে কাঁচের ঢাকনাওলা বড়ি-বেলুনটা বের করলেন। এটা তাঁর নিজের আবিষ্কার। বড়ির ট্রেটা বেলুনের ঢাকনা খুলে তার মধ্যে বসিয়ে ফের ঢাকনা এঁটে দিলেন। তারপর দরজা খুলে চাকাওলা বড়ি-বেলুনটাকে বাইরে ঠেলে একটা হাতল টেনে দিলেন।

বড়ি-বেলুন দিব্যি গড় গড় করে গড়িয়ে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে ক্রমে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেল। মাইল-পাঁচেক ওপরে গিয়ে বড়ি-বেলুন স্থির হয়ে ভাসবে। ঢাকনা আপনা থেকে খুলে যাবে। চড়া রোদে বড়িগুলো দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে মুচমুচে হয়ে যাবে। না শুকোলে বড়ি-বেলুনের ম্যাগনিফায়ার রোদের তাপকে প্রয়োজনমত দশ বা বিশগুণ বাড়িয়ে দেবে। পাঁচ মাইল ওপরে কাকপক্ষীর উৎপাত নেই ঠিকই, তবে আন্তর্মহাদেশীয় নানা উড়ুক্কু যানের হামলা আছে। তাদের ধাক্কায় বড়ি-বেলুন বেশ কয়েকবার ঘায়েল হয়েছে। তাই এখন বড়ি-বেলুনে একটা পাহারাদার কমপিউটার বসিয়ে দিয়েছেন বাসবনলিনী। উড়ুক্কু যান দেখলেই বড়ি-বেলুন সাঁত করে প্রয়োজনমত ডাইনে-বাঁয়ে বা ওপরে-নীচে সরে যায়।



বৃষ্টিটা খুব তেজের সঙ্গেই হচ্ছে বটে। এরকম আবহাওয়ায় বাসবনলিনীর বাড়ি থেকে বেরোতে ইচ্ছে করে না। জানালার ধারে বসে কেবল অঙ্ক কষতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাজারে একটু না গেলেই নয়। অবশ্য ঘর থেকে অর্ডার দিলে বাড়িতেই সব পৌঁছে যাবে, কিন্তু বাসবনলিনী নিজের হাতে বেছেগুছে শাকপাতা কিনতে ভালবাসেন। নিজে না কিনলে পছন্দসই জিনিস পাওয়াও যায় না।

বেরোবার জন্য তৈরি হতে বাসবনলিনীর এক মিনিট লাগল। একটা বাবল শুধু পরে নিলেন। জিনিসটা কাঁচের মতোই স্বচ্ছ, তবে এত হালকা যে, গায়ে কিছু আছে বলে মনে হয় না। আসলে এই বাব্‌ল বা বুদ্বুদ গায়ের সঙ্গে সেঁটেও থাকে না। চারদিকে শুধু ডিমের খোলার মত ঘিরে থাকে। গায়ে এক ফোঁটা জল বা বাতাসের ঝাপটা লাগতে দেয় না।

বুদ্বুদবন্দী হয়ে বাসবনলিনী বেরিয়ে পড়লেন। ইচ্ছে করলে গাড়ি নিতে পারতেন, তাঁর গ্যারাজে রকমারি গাড়ি আর উড়ুক্কু যান আছে।

রাস্তায় অবশ্য যানবাহনের অভাব নেই। পেট্রল বা কয়লা বহুকাল আগেই ফুরিয়ে গেছে। তাই আজকাল গাড়ি চলে নানারকম শুকনো জ্বালানিতে। এসব জ্বালানি ছোট ছোট ট্যাবলেটে বা বড়ির আকারে কিনতে

পাওয়া যায়। কোনও ধোঁয়া বা গন্ধ নেই। শব্দও হয় না। যাতায়াতের জন্য আর আছে চলন্ত ফুটপাত। আজকাল এক রকম জুতো বেরিয়েছে যেগুলো পায়ে দিলেই জুতো নিজেই হাঁটতে থাকে, যে পরেছে তাকে আর কষ্ট করে হাঁটতে হয় না।

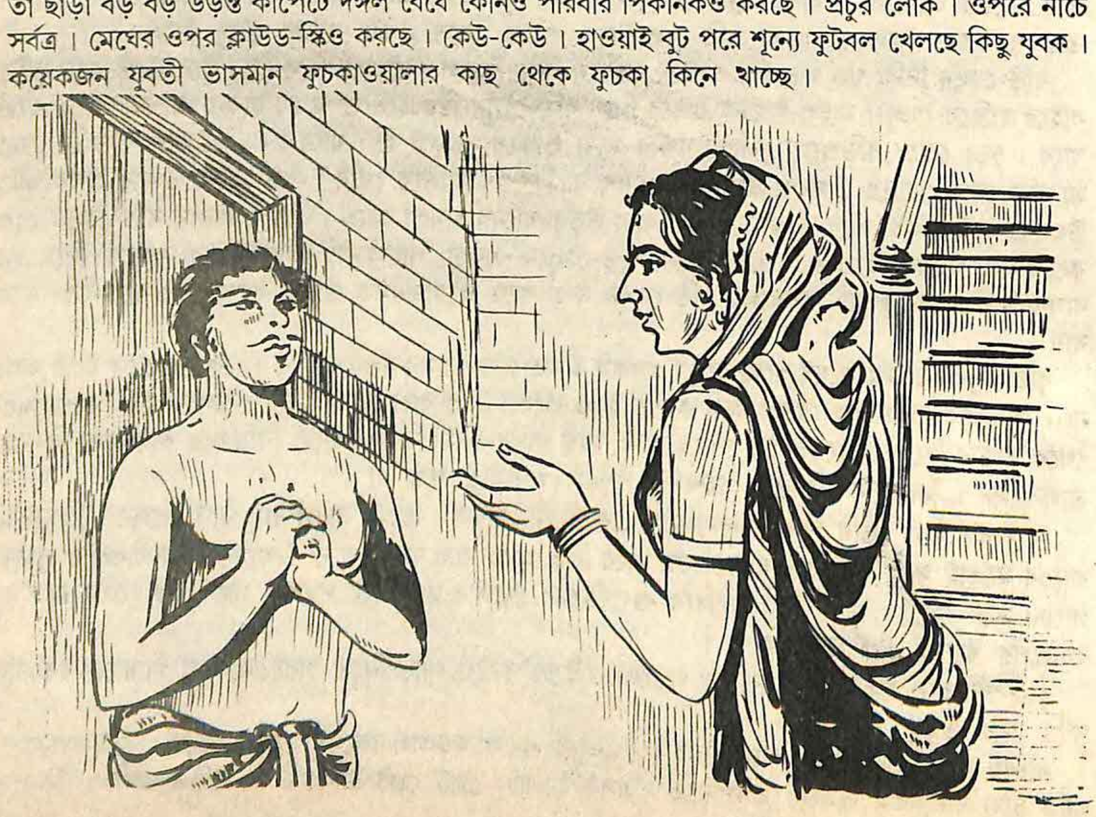
তবে বাসবনলিনী এসব আধুনিক জিনিস পছন্দ করেন না। তিনি পায়ে-হাঁটা পথে ধরে বাজারে এসে পৌঁছলেন।

বাজার বলতে বাগান। একটা বিশাল তাপনিয়ন্ত্রিত হলঘরে মাটিতে এবং শূন্যে হাজারো রকমের সবজির চাষ। ক্রেতারা গাছ থেকেই যে যার পছন্দমত আলু-কুমড়ো-পটল তুলে নিচ্ছে। শূন্যে ঝুলন্ত র‍্যাকে আলুর গাছ। এসব আলুর জন্য মাটির দরকার হয় না। শূন্যে নানা প্রক্রিয়ায় গাছকে ফলন্ত করা হয়। গাছের নীচে চমৎকার আলু থোকা-থোকা ফলে আছে। বাসবনলিনী কিছু আলু নিলেন। বেগুন-পটল-ফুলকপিও নিলেন। আজকাল সব ঋতুতেই সবরকম সবজি হয়, কোনও বাধা নেই।

বাজারের ফটকেই ছোট-ছোট ট্রলি সাজানো আছে। তাতে বোঝা তুলে দিয়ে কনসোলের মধ্যে নাম আর ঠিকানাটা একবার বলে দিলেই ট্রলি আপনা থেকেই গিয়ে বাড়িতে জিনিস পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বাসবনলিনীও বোঝাটা একটা ট্রলি মারফত বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর মেঘের ওপর হেঁটে বেড়ানোর একটু ইচ্ছে হ'ল তাঁর। কোনও অসুবিধে নেই। উড়ন্ত পিরিচ সব জায়গায় মজুত। তিনি সবজি-বাজারের বাইরে উড়ন্ত পিরিচের গ্যারেজে ঢুকে একটা পিরিচ ভাড়া নিলেন। পাঁচ ফুট ব্যাসার্ধের পিরিচটা খুবই মজবুত জিনিসে তৈরি। তাতে একখানা আরামদায়ক চেয়ার আছে, কিছু খাদ্য-পানীয়ের একখানা ছোট আলমারি আছে, আর আছে একজোড়া হাওয়াই-চপ্পল। এই চপ্পল পরে আকশে দিব্যি হেঁটে বেড়ানো যায়।

বুদ্বুদসমেত বাসবনলিনী পিরিচে চেপে বসলেন। পিরিচ একটা দ্রুতগামী লিফটের মতোই ওপরে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন মেঘের স্তর ভেদ করে বাসবনলিনী রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে উঠে এলেন। চারদিকে কোপানো মাটির মত মেঘ। আশেপাশে অনেক পিরিচ ভেসে বেড়াচ্ছে। তাতে নানা ধরনের মানুষ। তা ছাড়া বড় বড় উড়ন্ত কার্পেটে দঙ্গল বেঁধে কোনও পরিবার পিকনিকও করছে। প্রচুর লোক। ওপরে নীচে সর্বত্র। মেঘের ওপর ক্লাউড-স্কিও করছে। কেউ-কেউ। হাওয়াই বুট পরে শূন্যে ফুটবল খেলছে কিছু যুবক। কয়েকজন যুবতী ভাসমান ফুচকাওয়ালার কাছ থেকে ফুচকা কিনে খাচ্ছে।



পিরিচটা নিয়ে একটু ওদিক-ওদিক ঘুরে বাসবনলিনী তাঁর বড়ি-বেলুনের কাছে এলেন। বড়িগুলো প্রায় শুকিয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।

হাওয়াই চপ্পল পরে নামতে যাবেন, এমন সময় ঠিক একটা কুমড়োর আকৃতির উড়ুক্কুগাড়ি তাঁর সামনে থেমে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে একটা ছোকরা হাসিমুখে বলে উঠল, "কী গো ঠাকুমা, এখানে কী হচ্ছে ? বড়ি রোদে দিয়েছ নাকি ?"

ছোকরা আর কেউ নয়, গদাধর ভট্‌চাযের ডানপিটে ছেলে রেমো। রেমোর জ্বালায় বাসবনলিনীর এক সময়ে ঘুম ছিল না চোখে। গাছের আম জাম কাঁঠাল কিচ্ছু রাখা যেত না রেমোর জন্য। বিচ্ছুটা চুরিও করত নানা কায়দায়। একখানা লেজার গান দিয়ে টপাটপ পেড়ে ফেলত ফলপাকুড়, তারপর একটা খুদে পুতুলের মতো রোবটকে বাগানের দেওয়াল টপকে ঢুকিয়ে দিত। ফল কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসতে রোবটের, কোনও অসুবিধেই হত না। এই বড়ি-বেলুনে রোদে-দেওয়া আচার আমসত্ত্বও বড় কম চুরি করেনি রেমো। তাই তাকে দেখে বাসবনলিনী একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, "আজ রাতে বড়ির ঝাল রাঁধব, তোকে একটু পাঠিয়ে দেব'খন।"

রেমো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "রাতের খাওয়া আজ যে কোথায় জুটবে কে জানে।"

"কেন রে কী হলো ?"

"আর বলো কেন। গত একমাস ধরে বেস্পতির চারদিকে ঘুরপাক খেতে হয়েছে। আজ সবে ফিরছি। ফিরতে ফিরতেই রেডিওতে বদলির অর্ডার এল। আজই ইউরেনাসে রওনা হতে হবে। সেখানে রোবটরা নেমে মানুষের থাকার মতো ঘরবাড়ি তৈরী করেছিল। শুনছি সেইসব রোবটদের কয়েকজন নাকি এখন ভারী বেয়াড়াপানা শুরু করেছে। মানুষের কথা শুনছে না। কয়েকটা রোবট পালিয়ে গিয়ে বিপ্লবীর দল গড়েছে।"

বাসবনলিনী চোখ কপালে তুলে বললেন, "বলিস কী ! এতো সব্বোনেশে কাণ্ড।"

রেমো একটু হেসে বলল, "তোমরা পুরনো আমলের লোক ঠাকুমা, এ-যুগের কোনও খবরই রাখো না। তবে ভালর জন্যই বলে রাখি, রোবটদের ঘরের কাজে বেশি লাগিও না। খাবার-দাবারে বিষটিস্ মিশিয়ে দিতে পারে। একদম বিশ্বাস নেই ওদের।"

শুনে বাসবনলিনীর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। হৃৎপিণ্ডটা কলের না হলে বুঝি বা হার্টফেলই করতেন। কোন্‌ওরকমে সামলে নিয়ে বললেন, "তা এইসব কাণ্ড হচ্ছে, কিন্তু কই মুখপোড়া খবরের কাগজে তো কিছু লেখে না।"

রেমো হেসে কুটিপাটি হয়ে বলল, "তুমি সত্যিই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি হয়ে গেছ ঠাকুমা। বলি, খবরের কাগজে খবর লেখে আর ছাপে কারা তা জানো ? অটোমেশিনের পাল্লায় পড়ে সবই তো যন্ত্রমগজের কব্জায় চলে গেছে। তা তারা কি রোবটদের দুষ্টুমির কথা ছাপবে ? সবই তো জ্ঞাতি ভাই, তলায় তলায় সকলে সাঁট। এমনকী রোবটরা তো রোবটল্যান্ডও দাবি করে বসেছে। ধর্মঘট, আইন অমান্যের হুমকিও দিচ্ছে। এসব শোননি ?"

"না বাছা, শুনিনি। আপন মনে বসে আঁক কষি, অতশত খবর তো কেউ বলেওনি।"

"যাই ঠাকুমা, মা-বাবার সঙ্গে একটু দেখা করে ইউরেনাসে রওনা দেব। সময় বেশি নেই।"



রেমো চলে যাওয়ার পর বাসবনলিনী হাওয়াই চপ্পল পরে একটু শূন্যে পায়চারি করলেন। বাতাস এখন বড্ড পাতলা। শ্বাসের কষ্ট হয়। তাই বাসবনলিনী তাঁর অকসিজেন-রুমাল মাঝে মাঝে নাকে চেপে ধরছিলেন। কোন দুষ্টু ছেলে যেন একটা কুকুরকে হাওয়াই-জুতো পরিয়ে আকাশে ছেড়ে দিয়েছে। সেটা ঘেউ ঘেউ করে পরিত্রাহি চেঁচাতে চেঁচাতে কাছ দিয়েই ছুটে গেল। আজকাল আকাশেও খুব একটা শান্তি নেই।

কিন্তু রোবটদের কথায় বাসবনলিনীর দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে। মনে স্বস্তি পাচ্ছেন না। মোক্ষদা, খেঁদি, পেঁচি, রোহিণী, মদনা, যামিনী এরকম অনেকগুলো রোবট-কাজের-লোক আছে বাসবনলিনীর। তার ওপর রোবট-গয়লা, রোবট-ধোপা, রোবট-নাপিত, রোবট-ফেরিওয়ালারও অভাব নেই। এদের যদি বিশ্বাস না করা চলে, তবে তো ভীষণ বিপদ। এর ওপর আছে রোবট-ডাক্তার, রোবট-নার্স। বাসবনলিনী খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে পিরিচে উঠে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন।

এসে দেখেন আশুবাবু গঙ্গারামকে হিন্দিতে খুব বকাঝকা করছেন। গঙ্গারাম নাকি বাগান কোপানোর কাজে ফাঁকি দিয়ে বসে বসে বিড়ি টানছিল। আশুবাবু খুব তেজী গলায় বলেছিলেন, "ফের কভি বিড়ি ফুঁকেগা তো

কান পাকাড়কে এয়সা মোচড় দেগা যে, আক্কেল গুড়ুম হো যায়েগা। বুঝেছিস ?"

গঙ্গারাম একটু বোকা গোছের রোবট। তার কাজ বাগানের মাটি কুপিয়ে চৌকস করা। রোবটরা কখনও বিড়িটিড়ি খায় না। ওদের এতকাল কোনও নেশাটেশা ছিল না।

বাসবনলিনী আশুবাবুকে ইশারায় আড়ালে ডেকে বললেন, "শোনো, এখন চাকর-বাকরদের ওপর হম্বিতম্বি কোরো না। দিনকাল পাল্টে গেছে।"

আশুবাবু রেগে গিয়ে বললেন, "কিন্তু আস্পদ্দা দ্যাখো, কাজে ফাঁকি দিয়ে বিড়ি খাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি কি সহ্য করা যায় ?"

বাসবনলিনী চাপা গলায় বললেন, "আঃ, আস্তে বলো, শুনতে পাবে। বলি, রোবটরা যে সব দল বেঁধে বিপ্লবটিপ্লব কী সব শুরু করেছে, তা শুনেছ ?"

আশুবাবু একটুও বিস্মিত না হয়ে বললেন, "শুনব না কেন ? খুব শুনেছি। চতুর্দিকে স্যাবোটাজ শুরু করেছে ব্যাটারা। আশকারা পেয়ে পেয়ে এমন মাথায় উঠেছে যে, এখন রোবটল্যান্ড চাইছে। এর পর হয়তো আমাদের দিয়েই কাজের লোকেদের কাজ করাতে চাইবে।"

বাসবনলিনী ভিতু গলায় বললেন, "সব জেনেও গঙ্গারামের ওপর চোটপাট করছিলে ? ও যদি ওর জাতভাইদের বলে দেয়, তা হলে কি তারা তোমাকে আস্ত রাখবে ?"

আশুবাবু একগাল হাসলেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন, "অত সোজা নয়। আমার কাছে ওষুধ আছে।"

বাসবনলিনী অবাক হয়ে বললেন, "কী ওষুধ ?"

আশুবাবু খুব হেঁহেঁ করে হেসে বললেন, "আছে। আমার ডার্করুমে লুকিয়ে রেখেছি। রোবটরা যে দুষ্টুমি শুরু করবে একদিন, তা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। সেই জন্যে গোপনে গোপনে বহুকাল ধরে ওষুধ বের করার চেষ্টা করেছি। এতদিনে ফল ফলেছে।"

"বলো কী ? চলো তো তোমার ওষুধটা দেখব।"

"দেখাব, কিন্তু পাঁচ-কান করতে পারবে না। তোমরা তো পেটে কথা রাখতে পারো না।"

"না গো না, বিশ্বাস করেই দ্যাখো।"

আশুবাবু বাসবনলিনীকে নিয়ে মাটির তলায় একটা গুপ্তকক্ষে এসে ঢুকলেন। ঘরে যন্ত্রপাতি কিছুই প্রায় নেই। শুধু একটা কালো বাক্স। একটা লাল আলোর ডুম জ্বলছে।

একটা টুল দেখিয়ে আশুবাবু বাসবনলিনীকে বললেন, "বোসো। যা দেখাব তা তোমার বিশ্বাস হবে না। তার চেয়েও বড় কথা, ভয়-টয় পেতে পারো।"

"জিনিসটা কী ?"

"দেখলেই বুঝবে।"

এই বলে আশুবাবু কালো বাক্সটার গায়ে একটা হাতল ঘোরাতে লাগলেন। আর মুখে নানা কিম্ভূত শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন, "ওঁ ফট, ওঁ ফট, প্রেত প্রসীদ, প্রেতেণ পরিপূরিত জগৎ। জগৎসার প্রেতায়া..." ইত্যাদি।

বাসবনলিনী দেখলেন, কালো বাক্সটার গায়ে একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে কালো ধোঁয়ার মতো কী একটু বেরিয়ে এসে বাতাসে জমাট বাঁধতে লাগল। তারপর চোখের পলকে সেটা একটা ঝুলকালো, রোগা শুঁটকো মানুষের চেহারা ধরে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী আঁতকে উঠে বললেন, 'উঃ মা গো, এ আবার কে ?"

আশুবাবু হেঁ হেঁ করে হেসে বললেন, "এদের কথা আমরা এতকাল ভুলেই মেরে দিয়েছিলুম গো। বহুকাল আগে এদের নিয়ে চর্চা হ'ত। আজকাল বিজ্ঞানের ঠেলায় সব আউট হয়ে গিয়েছিল।

"কিন্তু লোকটা আসলে কে ?"

এ-কথার জবাব কালো লোকটাই দিল। কান এঁটো-করা হাসি হেসে খোনা স্বরে বলল, "এজ্ঞে, আমি হলুম গে ভূত। এক্কেবারে নির্জলা খাঁটি ভূত। বহুকাল ধরে দেখা-সাক্ষাতের চেষ্টা করেছিলুম, হচ্ছিল না, তা এজ্ঞে, এবার এ-বাবুর দয়ায় হয়ে গেল।"

শুনে বাসবনলিনী গোঁগোঁ করে অজ্ঞান হলেন। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইলেন। ভূতটা তখনও দাঁড়িয়ে।

আশুবাবু তালপাতার পাখায় বাসবনলিনীকে বাতাস দিতে দিতে বললেন, "আর ভয় নেই গিন্নি ভূতেরা কথা দিয়েছে বিজ্ঞানের কুফল দূর করার জন্য জান লড়িয়ে দেবে। রোবটদের টিট করবে ওরাই।"

কেলে ভূতটা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, "এজ্ঞে, এক্কেবারে বাছাধনদের পেটের কথা টেনে বের করে আনব, কোনও চিন্তা করবেন না।"

বাসবনলিনী এবার আর ভয় পেলেন না। খুব নিশ্চিন্ত হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বেঁচে থাকো বাবারা।"

শেষ খাওয়া

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়



'বাচ্চা তিনটে আর একটু বড় হোক না বউমা তারপর না হয় মাটাকে ছেড়ে আসবে।' তাকিয়ায় হেলান দিতে দিতে, ডিশ থেকে পান তুলে মুখে পুরতে পুরতে দাদু বললেন।

দাদুর ঘরে জোর মিটিং বসেছে। সভাপতি আমার দাদু। প্রধান অতিথি আমার বাবা উদ্যোক্তা আমার মা। সভ্য হিসেবে উপস্থিত আছেন আমাদের বামুনদি, সুখেনদা, কমলাদি, আর আমার দিদি।

বাবা একপাশে বসে আছেন। হঠাৎ যেন জড়িয়ে পড়েছেন। ইচ্ছে নেই তবু বসে থাকতে হয়েছে। রবিবার দুপুরে আমার যেমন হয় আর কি! 'বোস অঙ্ক কষতে।' বাবার আদেশ। আর বাইরে তখন নীল আকাশ। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। মনা ঘুড়ি বেড়েছে। বসে বসেই দেখতে পাচ্ছি। লাট খাচ্ছে। পাক খাচ্ছে। বুড়ো সাইকেল শিখছে। দেখছি শুনছি আর বসে বসে অঙ্ক কষছি। বাবার ঠিক সেই অবস্থা। দাদু জোর করে বসিয়ে রেখেছেন, 'না, না, যাবে কোথায়। এ ব্যাপারে তোমার মতামতের যথেষ্ট দাম আছে। থাকবে কি যাবে? আমি ভোটে দোব।'

'এর আবার ভোটাভুটি কি ? এ সব মেয়েদের ব্যাপার তারাই ঠিক করুক ।'

উঁহু উঁহু, গণতন্ত্রের যুগ । সাধারণতন্ত্রী ভারত । কারুর একার কথায় সিদ্ধান্ত হবে না । হতে পারে না ।'

'ওই তো পুঁচকে পুঁচকে তিনটে প্রাণী, আর আমরা এতগুলো ধেড়ে । আমাদের কি এমন করতে পারে ! আমার বাবা মাথায় আসে না ।'

'আমারও আসে না ।'

মা বললেন, 'কি করে আসবে ! আপনারা অন্দরের খবর কতটুকু রাখেন । দেখতো না দেখ । দুধ খোলা রাখার উপায় নেই । ঠিক তিন দিক থেকে তিনজন এসে চকাচক ।'

বাবা বললেন, 'চাপা দিয়ে রাখলেই হয় ।'

'ঠেলে খুলে ফেলে ।'

'থালার ওপর থান ইট চাপা দাও ।'

'গরম দুধ একটু খোলা রাখতে হয় । সঙ্গে সঙ্গে চাপা দেওয়া যায় না । ওরা সেই গরমও মানছে না ।'

'তার মানে, আমরা রোজই বেড়ালের এঁটো খাচ্ছি ।'

'খাচ্ছি তো ।'

'ছি ছি । খুব খারাপ কথা ।'

দাদু বললেন, 'না জেনে খেলে কিচ্ছু হয় না । তুমি বলেই ভুল করলে ।'

'বাঃ, আমি জেনে শুনে না বলে থাকি কি করে ! আমার পাপ হবে না !'

'তাও তো বটে তুমি বউমা ওসব দেখ কেন ? অত খুঁটিনাটি ব্যাপারে নজর দাও বলেই অশান্তি বেড়ে যায় ।'

কমলাদি একপাশে ঘুম ঘুম চোখে বেশ বসেছিলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আজ তো গেছে । ওদের মাটা, এই এতবড় একটা রুই মাছ টেনে নিয়ে কুয়োতলায় পালিয়েছে ।'

'তারপর ?' দাদুর খুব উৎসাহ ।

'তারপর সুখেন হেই হেই করে দৌড়ল । বেড়াল মাছ মুখে ছুটছে । সুখেন ছুটছে ।'

'তারপর, তারপর !' দাদুর ভীষণ উৎসাহ ।

'বেড়াল লাফিয়ে উঠতে গেল পাঁচিলে ।'

'তারপর ?'

'পারে না কি ? মাছটার কত ওজন !'

'তারপর !'

'মুখ থেকে মাছটা পড়ে গেল ওপাশের নর্দমায় ।'

'যাঃ'

বাবা বললেন, 'আজ কি সেই মাছ আমাদের পথ্য !'

মা বললেন, 'রাম রাম ! আজ পেঁপের তরকারি আর রুটি ।'

'ছোলা দিয়েছ ? ছোলা !'

'দিয়েছি । বাদামও দিয়েছি ।'

'ওঃ মারভেলাস । তবে আর কি !'

দাদু বললেন 'সে কি ? আজ পেঁপে ! আমি যে আবার শাক্ত । আজ তাহলে আমার উপবাস !'



সুখেন বললে, 'মা আপানাদের ভয় দেখাচ্ছেন । ভালো ব্যবস্থাই আছে । মাছের কচুরি । কিমা কারি ।'

'আহা । আহা । সোনায় সোহাগা ।'

দাদুর আনন্দ শেষ হয়েছে কি হয় নি রান্নাঘরে ঝনঝন শব্দ ।

'যাঃ সর্বনাশ হয়ে গেল ।'

মা ছুটলেন, পেছন পেছন কমলাদি । তার পেছনে সুখেনদা । সভা ভেঙে গেল । ওধারে মারমার, ধরধর শব্দ । কিছু পরেই আমাদের পুসি ভয়ে ছুটতে ছুটতে এসে সোজা দাদুর কোলে । চোখমুখ লাল করে মা দরজার সামনে,

'আজ মেরেই ফেলব ।'

বাবা শান্ত গলায় বললেন, 'উত্তেজিত হয়ো না। মাথা ঠাণ্ডা। মাথা ঠাণ্ডা। খ্রাইস্ট বলেছেন, হেট দি সিন্, নট দি সিনার।'

'এক ডেকচি দুধ উল্টে দিয়েছে। আগে বেধড়ক পেটাই তারপর খ্রাইস্ট কি বলেছেন শোনা যাবে।'

দাদু বললেন, 'বউমা, অপরাধী নিজে ছুটে এসে আদালতে আত্মসমর্পণ করেছে। আর তো মারা যাবে না। দেশে আইন আছে তো! তাছাড়া আমি আবার আইনের ব্যবসা করি।'

'দেশে আইন আদালত, গণআদালত দুটোই চলছে। গণআদালতের হাতে ওকে ছেড়ে দিন।'

'মারলে তোমার দুধ কি ফিরে আসবে মা ? ভেবে দ্যাখো। ভেবে দ্যাখো, মানুষ কেন চুরি করে! অভাবে। চুরি করে, ক্ষিধের জ্বালায়। খেতে দাও, চুরি ছেনতাই সব বন্ধ হয়ে যাবে।'

'স্বভাবেও চুরি করে বাবা। চব্বিশ ঘণ্টা খেয়ে খেয়ে, সব কটা ভুঁয়ো পেটা। তবু ছোঁক ছোঁক। এই মাটা হল সব চেয়ে বড় চোট্টা। ওই মায়ের শিক্ষায় ছেলেমেয়ে তিনটেও এই বয়সে পাকা চোর হয়ে উঠছে।'

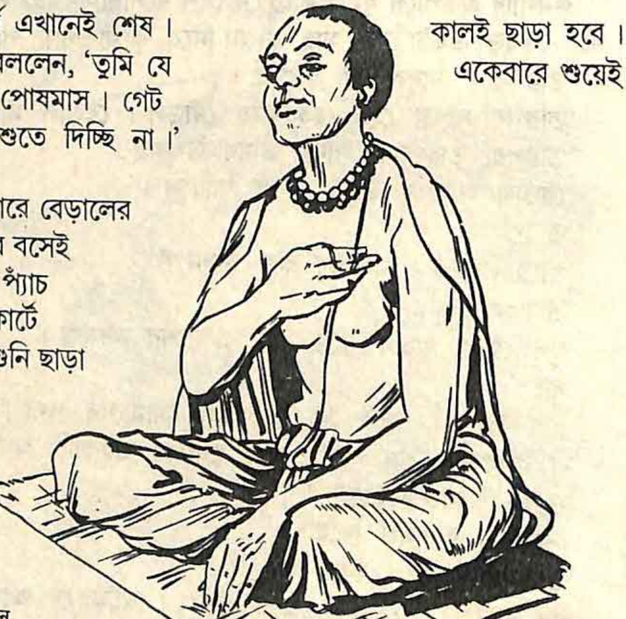
'তাহলে ?' দাদু চোখে প্রশ্ন নিয়ে সকলের দিকে তাকালেন।

মা বললেন, 'আপনার কথামতো বাচ্চা তিনটে আর একটু বড় হোক। মাটাকে আজই রাতে বিদায় করা হোক।'

'আজই রাতে !'

সুখেনদা বললে, 'লোহা গরম থাকতে থাকতেই হাতুড়ি মারা উচিত। এখন আমরা তেতে আছি, বস্তাফস্তা সব রেডি ডোমবাগানের মাঠে ছেড়ে দিয়ে আসি। রাতেই সুবিধে।'

'আজ থাক। আহা আজ থাক।' দাদু করুণ মুখে তাকালেন। 'দ্যাখো না আমার কোলে শুয়েই কেমন ঘড়ঘড় করছে। মাঠে ছাড়লে মরে যাবে। কামার পাড়ায় ছেড়ে দিও। যে কোনও একটা বাড়িতে ঢুকে যাবে।'



বাবা বললেন, 'আর না, বেড়ালপর্ব এখানেই শেষ। কালই ছাড়া হবে। আজ সভা ভঙ্গ।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি যে একেবারে শুয়েই পড়লে! একেই বলে, কারুর সর্বনাশ কারুর পোষমাস। গেট আপ। আজ রাত একটার আগে শুতে দিচ্ছি না।'



যাঃ, উল্টো পোষমাস হয়ে গেল। এবারে বেড়ালের পোষমাস আর আমার সর্বনাশ। দাদু গুম মেরে বসেই রইলেন বেড়াল কোলে। ভাবছেন। আইনের প্যাঁচ কষছেন। আমি যাবার আগে বললুম, 'দাদু, কোর্টে আপনি যে মক্কেলের হয়ে দাঁড়ান, সেই তো শুনি ছাড়া পেয়ে যায়। একে দিয়ে মায়ের বিরুদ্ধে কোর্টে একটা কেস ঠুকে দিন না।

হাইকোর্টের ইনজাংসানে কত কি তো বন্ধ হয়ে যায়। বেড়াল ছাড়া বন্ধ হবে না ?'

দাদু নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'এটা মানুষ হলে একবার চেষ্টা করে দেখতুম। এটা যে মানুষ হল না।'

পরের দিন সকালে সব নর্মাল। বাবা ঘরে ডনবৈঠক করছেন। দাদু খোলা গায়ে পুজোর আসনে ধ্যানস্থ। গলায় গোটা গোটা লাল রুদ্রাক্ষের মালা। সুখেনদা বাজারে। কমলাদি ইয়া এক শিল পেড়ে দুলে বাটনা বাটছে। দিদি ফিস ফিস করে ইতিহাস মুখস্থ করছে। পরীক্ষা সামনে। পড়ার ধুম পড়ে গেছে। আর পুসি আছে হাত পা ছড়িয়ে, নিশ্চিন্ত আরামে দাদুর বিছানায়। পুসিটা এমনি খুব ভাল মানুষ। কেবল একটু বোকা

চোর । আমার মতো চালাক চোর হলে মাকি ধরতে পারতেন ! চুরি করতে গিয়ে সব ফেলেমেলে একসা করে । আরে চোরের কি শব্দ করা উচিত, না করা চলে । এই যে আমি আচার খাই, গুঁড়ো দুধ খাই, শব্দ করে খাই ? এমন কি গোঁফে একটুও গুঁড়ো লেগে থাকে না । আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মায়েরই শাড়ি দিয়ে সব ঝেড়ে ফেলি । হি হি । কোনও দিন দিদি ধরে ফেললে ভাগ দি । দিদির আবার আচার ফেবারিট । ঝাঁটার মতো গোঁফ করেছে পুষি । দুধ খেলেই সর ঝোলে । মেয়েছেলের আবার গোঁফ কি ! যেমন কাণ্ড !

বাবা অ্যার দাদু নটার সময় বেরিয়ে গেলেন । একটু পরে আমিও স্কুলে চলে গেলুম । পুসি তখনও ভোঁস ভোঁস ঘুমোচ্ছে । আর কি, সন্ধের পর থেকে তো আর বিছানা জুটবে না । কেউ খেতেও দেবে না । আমি দেখেছি, বেড়ালকে কেউ ভালবাসে না, সবাই দূর দূর করে । আমার দিদিটার কোনও দুঃখ নেই । বলতে গেলুম, 'পুসিটাকে আজ একটু ভাল করে খাওয়াস ।'

বললে, 'ভ্যাট ভ্যাট, আমার বলে সামনে পরীক্ষা ! এখন বেড়াল মেড়াল আমার মাথায় আসছে না । বিরক্ত করিস নি তো, মাকে বলে দোব ।''

আমি বিনুনিটা ধরে একটু টানব বলে যেই হাত বাড়িয়েছি, অমনি চেঁচাতে লাগল, 'ও মা, মা মাগো, দ্যাখো না বুড়ো কি করছে !'

মা তেড়ে আসার আগে পুটুর কাছ থেকে নতুন কায়দায় যে মুখ ভেঙানো শিখেছি, সেইটা প্রয়োগ করে সোজা দে ছুট । কাপুরুষ । নিজে পারে না । সব ব্যাপারে মার সাহায্য !

রাস্তায় বেরিয়ে শুনলুম, 'তুই ফিরে আয়, তারপর দ্যাখনা, তোকে আমি কেমন পেটাই ।'

আমাকে পেটাবে ! অ্যায়সা হাত মচকে দোব ।

দিদিটা আমার পাগলী । আবার দুর্গা দুর্গা বলছে ।

আজ আসার সময় রাক্ষসটার জন্যে হজমী আনব । টকাস টকাস করে খাবে ।

সন্ধে তো প্রায় হয়ে এল । গাড়ি থামল বাড়ির সামনে । দাদু নামলেন । চক চকে কালো কোট । ধবধবে সাদা প্যান্ট । হাতে অ্যাটাচি । মুখটা টকটকে ফর্সা । এই সময়ে দাদুকে এমন সুন্দর দেখায় । সুখেনদা ছুটে এল । দাদু বললেন, 'গাড়িতে খাবারের বাক্স আছে । সাবধানে নামাও ।'

এই সময়টায় আমিও কাছে থাকি । দিদি বলে, হ্যাংলা ।

জানে না, বড় হলে আমি কি আর হ্যাংলা থাকবো !

সুখেনদা পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় গন্ধ পেলুম । অসাধারণ । মনে হয় ফিশফ্রাই ।

দাদু যেতে যেতে বললেন, 'মাকে বলো ফিশফ্রাই আছে ।' তারপর আর একটু এগিয়ে বললেন, 'আছে না গেছে ?'

মা এসে গেছেন, 'কার কথা বলছেন বাবা ?'

'পুসি । আছে না ছেড়ে দিয়েছ !'



মার কত উৎসাহ ! লাফাতে লাফাতে বললেন, 'এই তো, আর একটু অন্ধকার হলেই । জানেন আজ কি করেছে ! এই অ্যাতো বড় একটা পায়রা মেরেছে ।'

গম্ভীর মুখে একবার 'হুম্' বললেন দাদু । তারপর বললেন, 'বিদায় করার আগে আমি ওকে প্রাণ ভরে খাওয়াতে চাই । গোটা একটা ফিশফ্রাই ওকে খাওয়াব । নিজে খাওয়াব ।'

দালানে পুসি বসে আছে পা মুড়ে । ধবধবে সাদা তুলোর তালের মতো । আধ বোজা চোখে বাচ্চা তিনটের খেলা দেখছে আয়েস করে । খুব খেলছে । মাঝে মাঝে মায়ের ঘাড়ে এসে পড়ছে । পুসির কোনও ধারণাই নেই একটু পরে কি হবে ।

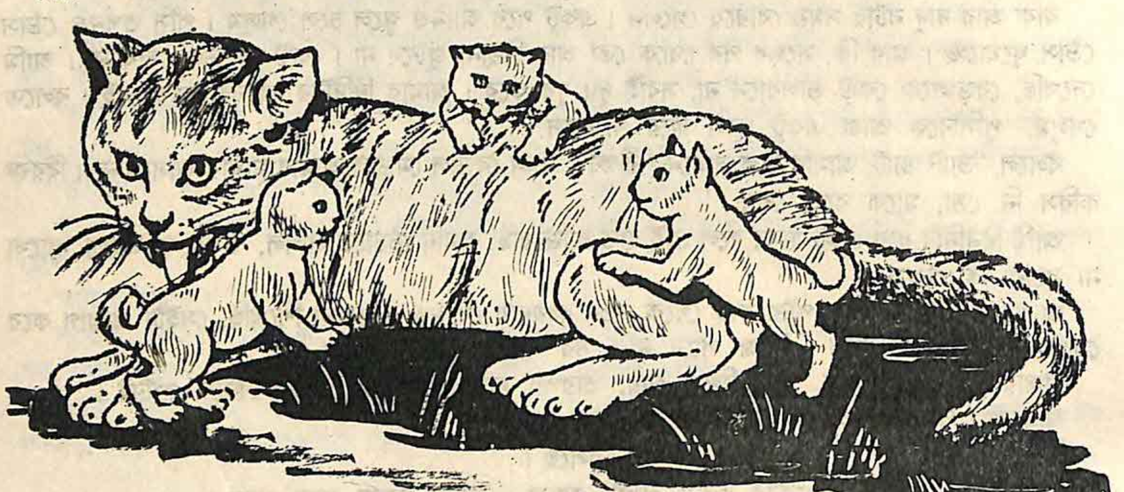
কোর্টের কাপড়জামা ছেড়ে দাদু এলেন । ডাকতেই পুসি এল । মাছ ভাজার গন্ধ, আর থাকতে পারে ! ন্যাজ তুলে আদুরে গলায় 'মিউ' করল । দাদুর পিঠে গা ঘষল । ঘড়ঘড় শব্দ করছে । দাদু একটু একটু করে ভেঙে ভেঙে দিচ্ছেন ফিশফ্রাই ।

খেয়ে দেয়ে পুসি গা চাটছে । বাচ্চা তিনটে মায়ের প্রসাদ খাচ্ছে । দাদু উঠে যেতে যেতে বললেন, 'না আর মায়া বাড়াবো না । তোর বরাতের ওপর ছেড়ে দিলুম, যা ।'

সুখেনদা যখন চটের বস্তার মধ্যে পুসিকে ভরছে তখন আমি আর দিদি ছাতের চিলে কোঠায় । দিদি আমাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কাঁদছে । আমি তো ছেলে, তাই প্রথমে ভেবেছিলুম কাঁদব না কিছুতেই ।

অনেকক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে রইলুম। পুসির কথা ভোলার জন্যে কত কি ভাবার চেষ্টা করলুম ; তবু জল এসে গেল চোখে। দু'জনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলুম। চোখের সামনে পুসিকে দেখতে পাচ্ছি। থুপ্‌পি হয়ে বসে আছে বাগানের পাঁচিলে। আরামসে শুয়ে আছে দাদুর বিছানায়। দুধ খাচ্ছে চক্‌চক্ করে। বাচ্চাদের গা চেটে দিচ্ছে। যত মনে পড়ছে, তত কান্না বাড়ছে।

দিদি একসময় বললে, 'চল বুড়ো, আমরা দুজনে আত্মহত্যা করি।'



আমি ছেলে তো, তাই দিদির চেয়ে আমার বুদ্ধি একটু বেশি। আমি পড়েছি, বেড়ালকে যত দূরেই ছেড়ে দাও, ঠিক ফিরে আসবে। কান্নায় গলা বুজে আছে, তাও বললুম অনেক কষ্টে, 'দেখিস দিদি, ও ঠিক আবার ফিরে আসবে।'

দিদি কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'ঠিক বলছিস।'

'হ্যাঁ ঠিক। পলাশদের বেড়ালটাকে ডোমবাগানে ছেড়ে এসেছিল। তিন দিন পরে, কাল আবার ফিরে এসেছে।'

দিদি আমাকে খুব জোরে জড়িয়ে ধরল।

একটু পরেই ছাদের ওপাশে কি একটা শব্দ হল, আর অমনি আমার মনে হল ভূত। দিদিরও সেই রকম মনে হল। আমরা তখন গুটি গুটি নেমে এলুম নিচে। দাদু আসনে বসেছেন। ধ্যানে। মা রান্না ঘরে মনের আনন্দে রাঁধছেন। ছ্যাঁক ছোঁক শব্দ হচ্ছে। আমার মা কি খুব নিষ্ঠুর ? মনে হয় তা নয়। আসলে মা তো আমাদের চেয়ে অনেক বড়। অনেক অনেক বেড়াল দেখেছেন, তাই আর ভালো লাগে না আর কি।

এক সময় কমলাদি হাই তুলতে তুলতে বললে, 'বাবা, সুখেন তো অনেকক্ষণ গেছে। এখনও আসছে কেন ? পুলিসে ধরলে নাকি ! অত বড় একটা বস্তা ঝুলিয়ে গেছে। অন্ধকারে ছেলেধরা বলে পেটাতেও পারে।'

দিদি ফিসফিস করে আমাকে বলল, 'পেটায় তো বেশ হয় !'

সবাই খুব ভেবে পড়ল। দাদু পড়ার ঘরে আইনের বই নিয়ে বসেছেন। চা জলখাবার সব ফিরে এসেছে, গম্ভীর মুখ। আবার বলেছেন রাতে, নো মিল।

এমন সময় বাইরে গলা পাওয়া গেল। আজ বলেই গিয়েছিলেন, ফিরতে রাত হবে। বাবা যেন জোরে জোরে কাকে বলছেন, 'কি রে তুই এখানে অন্ধকারে একা বসে আছিস কেন ?'

সুখেনদার গলা পেলুম কাঁদো, কাঁদো, 'এমনি বসে আছি !'

'কাঁদছিস কেন ? আর কি তোর কাঁদার বয়েস আছে ?'

বাবা আগে আগে, পেছনে সুখেনদা বাড়ি ঢুকলেন। ভেতরে এসে সুখেনদার কান্না আরও বেড়ে গেল। সামনে মা।

'সর্বনাশ সয়ে গেছে মা।'

'কি হল ?' মা বেশ ভয় পেয়েছেন।

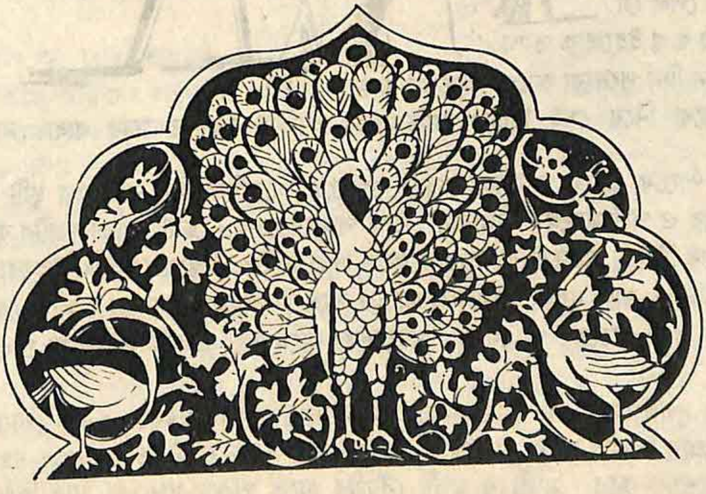
'নন্দকুমার স্ট্রিটের কাছে গেছি, বেড়ালটা হাঁচড়পাঁচড় করে বস্তা ফেঁড়ে বেরিয়ে এল।'

'তা আসুক না। তাতে কাঁদার কি হয়েছে ?'

সুখেনদা এবার হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'ছুটে রাস্তা পেরচ্ছে এমন সময় একটা টেম্পো··· ।'

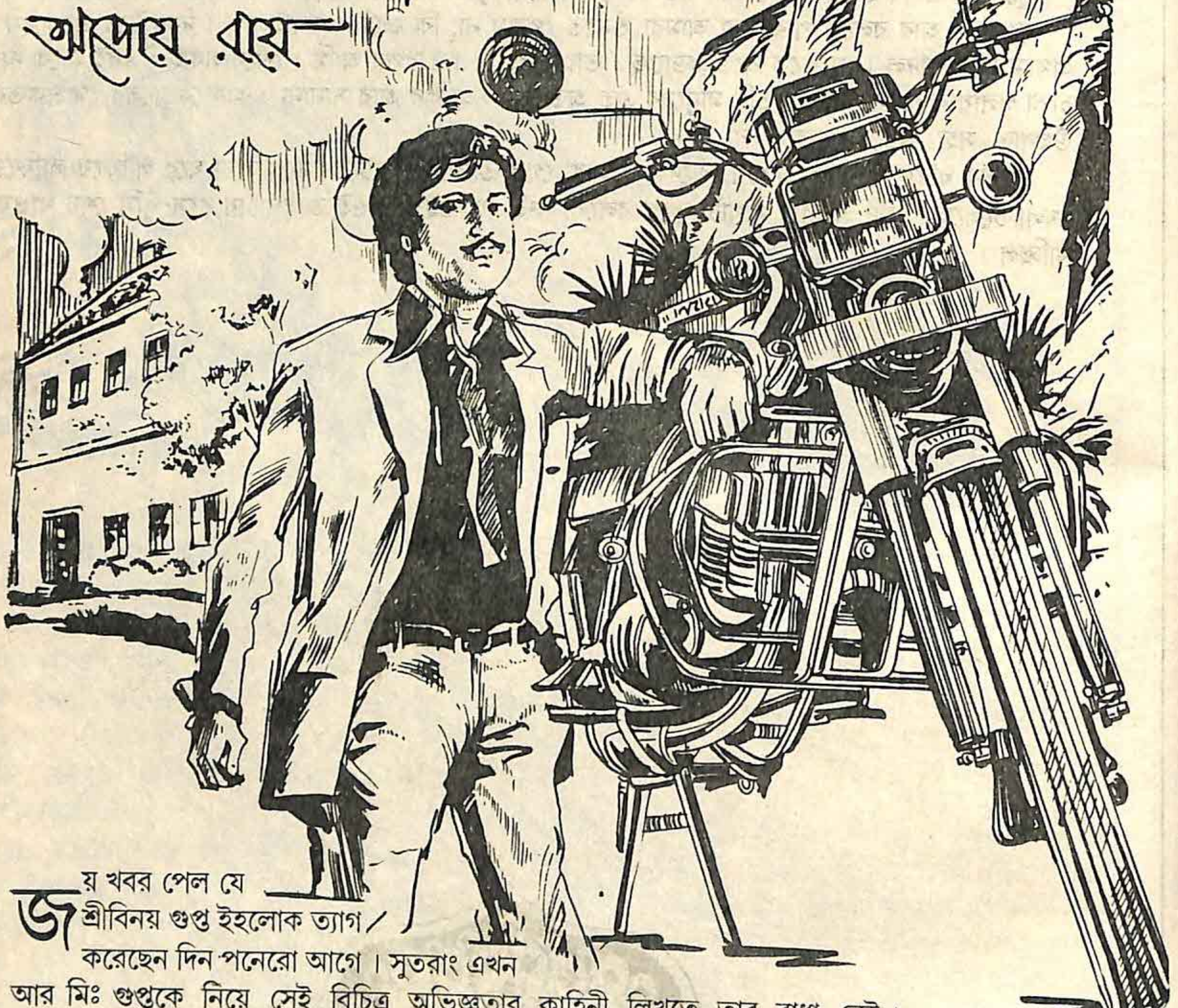
সুখেনদা আর বলতে পারল না আমরা শুনতে পেলুম না, কি জানি। সবাই চুপ। দাদু উঠে এসেছেন। প্রথমে দিদি কাঁদল। মেঝেতে পড়ে গড়াচ্ছে। তারপরেই মা। তারপর আমি। শেষে সবাই। এরই মাঝে দাদু চাপা গলায় বললেন, 'বউমা, তুমি মানুষের এত অত্যাচার সহ্য কর আর সামান্য একটা বেড়ালের গোটাকতক উৎপাত সহ্য করতে পারলে না।'

এতসব ঘটছে আর কি আশ্চর্য, যাদের মা মারা গেল তাদের তিনটেতে মিলে সারা ঘরে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা চলেছে। দিদি একবার মাথাটা তুলে বললে, 'ওই যে, ওই যে, ওই জায়গাটায় বসে পুসি শেষ খাওয়া খাচ্ছিল।'



মোটর সাইক্লিস্ট

অজেয় রায়



জয় খবর পেল যে শ্রীবিনয় গুপ্ত ইহলোক ত্যাগ করেছেন দিন পনেরো আগে। সুতরাং এখন আর মিঃ গুপ্তকে নিয়ে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী লিখতে তার বাধা নেই।

জয় বছর পাঁচেক আগে ঘাটশিলা শহরে বেড়াতে গিয়েছিল দিন দশেকের ছুটি নিয়ে। ঘাটশিলা বিহার প্রদেশে। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানায়। রুক্ষ পাথুরে দেশ। ছোট লোকালয়টির কাছে কাছে কয়েকটা নিচু নিচু পাহাড় আর টিলা। সমতল বা বন্ধুর কাঁকুড়ে লাল মাটির প্রান্তরে কোথাও টুকরো টুকরো শাল বন। ছোট ছোট পাহাড়গুলিতে শাল মহুয়া আমলকি গাছের সঙ্গে মিশে আছে নানান হালকা ঝোপঝাড় ও বুনো লতা। সুবর্ণরেখা নদী গেছে শহরের গা ঘেঁসে। খরস্রোতা নামে আর একটি ক্ষীণকায়া পাহাড়ী নদী বইছে অল্প দূর দিয়ে।

শরৎকাল। দুর্গাপুজোর পর। এখানকার আবহাওয়া তখন চমৎকার। বন্ধু পিনাকীদের বাড়িতে উঠেছে জয়। বাড়িটা প্রায় ফাঁকাই থাকে বারোমাস। কালে ভদ্রে কেউ কেউ চেঞ্জে আসে এখানে। একজন বৃদ্ধ মালী বাড়িটার দেখাশোনা করে। মালী ও মালী বৌয়ের হাতে খাওয়া-দাওয়ার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে জয়। সকাল সন্ধ্যা সে ঘুরে ঘুরে দেখে আশপাশ। লম্বা লম্বা হাঁটা দেয় লোকালয় ছাড়িয়ে ফাঁকা প্রান্তরে।

দেখতে দেখতে ছয়টা দিন ছুটি কেটে গেল।

খরস্রোতা নদীর দিকে প্রায় প্রতিদিনই একবার বেড়াতে যেত জয়। এদিকটা বেশি ফাঁকা। তফাতে তফাতে এক একটা বাড়ি। বেশির ভাগ বাড়িই বন্ধ থাকে বছর-ভোর। মালিকরা মাঝে মধ্যে আসে। এই পথেই লাল কুঠি বাড়িটা জয়ের নজর টানত।

মেটে লালরঙা একতলা বাড়িটাকে স্থানীয় লোকে ডাকে লাল কুঠি। ওই বাড়ির কাছাকাছি প্রায় আধমাইলের ভিতর আর কোনও বসতি নেই। মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল ঘেরা, মস্ত কম্পাউণ্ডওলা বাড়িখানায় পাঁচ-ছয়খানা ঘর, একটা ছোট আউট-হাউসও আছে। বাউণ্ডারির ভিতরে অনেক গাছ। বড় বড় আম লিচু আতা ইত্যাদি ফলের গাছের সঙ্গে রয়েছে নানান পাতা-বাহার গাছ। ফুলগাছও নানারকম চোখে পড়ে।

লাল কুঠি কিন্তু খালি বাড়ি নয়। গাছপালার আড়াল থাকায় বাইরে থেকে বাড়িটা ভাল মতো দেখা যায় না, তবে ফটকের পাশ দিয়ে যাবার সময় জয় লক্ষ্য করেছে, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক কখনো খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছেন, কখনো বাগানে পায়চারি করছেন কখনো বা ফুল গাছের তদারকি করছেন।

ভদ্রলোক মাঝারি লম্বা। শক্ত সমর্থ গড়ন জয় দূর থেকে দেখছে তাঁর মুখ। চৌকো চোয়াল। নাক কিঞ্চিৎ চাপা। রং পরিষ্কার মাথায় পাতলা চুল ধবধবে সাদা। বাড়িতে তাঁর পরনে থাকে ড্রেসিং-গাউন ও পাজামা।

ভদ্রলোকের বোধহয় খুব ভোরে বেড়ানো অভ্যেস। জয় বেরোয় একটু বেলায়। একদিন সকালে সাতটা নাগাদ ওই পথে বেড়াতে গিয়ে জয় দেখেছিল যে স্পোর্টস গেঞ্জি ও ট্রাউজার্স পরা সেই বৃদ্ধ বেশ দ্রুত পায়ে হেঁটে লাল কুঠিতে ঢুকলেন। বিকেলের দিকে ভদ্রলোক বেরোয় কিনা জয় জানতে পারেনি। লোকটিকে সে এই শহরের বাজারে বা দোকান পাটে দেখেছে। তবে ওনাকে অন্য কারও সঙ্গে গল্পগুজব করতে দেখেনি। একজন মাঝবয়সী লোকও লালকুঠির বাসিন্দা। মনে হয় সে বৃদ্ধের কাজের লোক।

কৌতূহলী হয়ে জয় লালকুঠির ওই বৃদ্ধ সম্বন্ধে খোঁজ খবর করেছিল। তাতে তার কৌতূহলটা বাড়ে। ভদ্রলোকের নাম বিনয় গুপ্ত। এখানকার লোকে বলে গুপ্তাসাহেব বা মিস্টার গুপ্ত। গুপ্তা সাহেব ওই লালকুঠি কিনে এখানে বাস করছেন বছর সাতেক। এসেছিলেন স্বামী স্ত্রী। বছর তিনেক হল স্ত্রী মারা গেছেন। এখন একাই থাকেন, একজন কাজের লোক নিয়ে। কারও সঙ্গে মেশেন না পারতপক্ষে।

একটি খবর জেনে মিঃ গুপ্তর সঙ্গে জয়ের খুব আলাপের আগ্রহ জাগে! ভদ্রলোক নাকি এক কালে নামকরা স্পোর্টসম্যান ছিলেন। বিখ্যাত মোটর সাইক্লিস্ট।

মিঃ গুপ্তর পরিচয়ের ব্যাপারে জয়কে কিন্তু নিরুৎসাহ করলেন ঘোষবাবু। বাজারে ঘোষবাবুর স্টেশনারি দোকান আছে। মানুষটি আলাপী। অনেক বছর এখানে আছেন। এখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের সবারই খবর রাখেন মোটামুটি।

জয়ের ইচ্ছা শুনে ঘাড় নাড়লেন ঘোষবাবু, 'উঁহু, সুবিধে হবে না।'

'কেন?'

ঘোষবাবু যা বললেন তার সারমর্ম এই—

গুপ্তা সাহেব নিতান্ত অমিশুক প্রকৃতির। যেচে আলাপ করতে গেলেও কাউকে বিশেষ পাত্তা দিতে চান না। শুকনো ভদ্রতা রক্ষা ছাড়া দুটো কথা বলতে বা ঘরোয়া আলাপে একান্ত নারাজ। এই জন্যে গোড়ায় যারা ওনার বাড়িতে মাঝে মধ্যে যেতেন আজকাল আর তাঁর লালকুঠিতে যাবার উৎসাহ পান না। মিঃ গুপ্ত কারও বাড়িতে পা দেন না। লোকটি দাম্ভিক তো বটেই, বোধহয় কিঞ্চিৎ ছিটগ্রস্ত।



'এ কথা কেন বলছেন?'

মিঃ গুপ্ত এখনো ওঁর বাসায় একটা মোটর বাইক পুষে রেখেছেন। তবে কোনওদিন সেটা চেপে রাস্তায় বেরোন না। অথচ মাঝে মাঝে সেটার ইঞ্জিন চালু করেন, মাসে দু-এক বার। বাইরে থেকে লোকে শুনেছে ওই বাইকের ইঞ্জিন গর্জে ওঠার আওয়াজ। তা সে না হয় হল। উনি চ্যাম্পিয়ন মোটর সাইক্লিস্ট ছিলেন তাই অমন শখ। হয়তো ডক্তারের বারণ আছে বাইক চালাতে, তাই কেবল ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে খানিক শখ মেটান। কিন্তু তাই বলে মাথায় হেলমেট, গায়ে পাক্কা রেসিং ড্রেস চাপিয়ে ওই বাইকে চড়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দেবেন কেন? বুড়ো বয়সে একি উদ্ভট খেয়াল মশাই! ব্যাপারটা অবশ্য লুকোতে চান। তবে দুধওলা সুখদেও একদিন দেখে ফেলেছে, ওঁকে এমনি ড্রেসে মোটর বাইকটা স্টার্ট দিতে। গ্যারাজে থাকে গাড়িটা। সুখদেও উঁকি মেরে দেখছিল। হঠাৎ গুপ্তা সাহেব সুখদেওকে নজর করে প্রচণ্ড রেগে মারতে গিয়েছিলেন প্রায়। শাসিয়েছিলেন

ফের এমনি অনাবশ্যক কৌতূহল দেখালে স্রেফ গুলি করব। সত্যি সত্যি ভদ্রলোকের একটা বন্দুকও আছে। সুখদেও যা ভয় পেয়েছিল সেদিন! আর কোনও দিন ওঁর গ্যারাজে উঁকি দেওয়ার সাহস পায়নি।'

ঘোষবাবু বলে চলেন, 'বলুন তো মশাই, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত চটার কি আছে? ভদ্রলোকের মাথায় ছিট আছে সন্দেহ হয় না কি? এই আমার দোকানেই একদিন প্রসাদজী এই নিয়ে একটু মজা করতে গিয়ে কি কাণ্ড!'

'প্রসাদজী কোনও ঘা দিয়ে কথা বলেন নি, স্রেফ একটু রগড়। প্রসাদজী রিটায়ার্ড অফিসার। মিঃ গুপ্তরই বয়সী। অতি সজ্জন ব্যক্তি। প্রসাদজী হেসে বলেছিলেন গুপ্তাজী এক আধদিন পুরা রেসিং-ড্রেস পরে আপনার বাইক চেপে রাস্তায় নামেন। চালান খানিক। আমরা দেখি। মাঝে মাঝে শুধু ড্রেস পরে স্টার্ট মারলে কি আপনার গাড়ির মনমেজাজ ঠিক থাকবে? গোসা করবে যে? জং ধরে যাবে বডিতে।'

'ব্যস্ মিঃ গুপ্তর মুখ টকটকে হয়ে গেল রাগে। কড়া ভাষায় উত্তর অবশ্য দেননি কিন্তু রাগ বিরক্তিটা হাবেভাবে স্পষ্ট প্রকাশ পেল। গম্ভীর গলায় শুধু জবাব দিলেন, 'দ্যাট ইজ মাই বিজনেস।'

'প্রসাদজী তো অপ্রস্তুত। এই কথায় কি এমন ওর গায়ে লাগল আমরাও কেউ বুঝলাম না। তাই বলছি মিঃ গুপ্তর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা কি সম্ভব হবে আপনার? তবে হ্যাঁ যদিও আলাপ করতে চান, খবরদার ওনার মোটর বাইকের প্রসঙ্গটি তুলবেন না। বিলকুল খেপে যাবে।'

জয়ের মনে হল মিঃ গুপ্ত মানুষটি খুব ইনটারেস্টিং। এর সঙ্গে আলাপ করতেই হবে। নানা ধরনের খিটকেল বেয়াড়া চরিত্রের লোকের সাথে আলাপ জমিয়ে কথা বের করার অভ্যেস তার আছে। তাই মিঃ গুপ্তকে ম্যানেজ করা নিয়ে সে খুব চিন্তিত হল না। ওনার এই মাঝে মাঝে অতি সংগোপনে রেসের পোশাক পরে মোটর বাইক স্টার্ট দেওয়ার পেছনে হয়তো কোনও বিচিত্র কারণ থাকতে পারে। ব্যাপারটা কি বের করা যায় না? আর সে প্রসঙ্গ তোলার সুবিধে না হলেও অন্তত ভদ্রলোকের মুখে মোটর-সাইকেল রেস নিয়ে কিছু উত্তেজনাকর অভিজ্ঞতা শোনা গেলেও মন্দ হয় না।

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ জয় সটান লাল কুঠিতে ঢুকে পড়ল।

মিঃ গুপ্ত তখন সামনের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন। জয় নমস্কার করে তাঁর সামনে দাঁড়াতে ভদ্রলোক প্রতিনমস্কার



করে বইখানা মুড়ে পাশে টি-পয়ে রেখে এবং রিডিং গ্লাসটা খুলে পকেটে পুরে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইলেন।

জয় স্মিত মুখে বলল, 'আজ্ঞে আমি এখানে বেড়াতে এসেছি। আপনাকে দেখি রোজ। আলাপ করতে ইচ্ছে হল, তাই চলে এলাম।'

'ও!' নিরুত্তাপ স্বরে একটি মাত্র শব্দ করে কাছে একটি বেতের চেয়ার দেখিয়ে গুপ্ত জয়কে বসতে ইঙ্গিত করেন।

জয় বসল। তারপরে গলায় সম্ভ্রম ফুটিয়ে বলল, 'শুনেছি আপনি একজন বিখ্যাত মোটর-সাইক্লিস্ট ছিলেন। এককালের ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ান।'

'কোথায় শুনলেন ?' বাঁকা চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন গুপ্ত।

'এই এখানে এসে। তবে শুনে মনে পড়ল, আমি আপনার কথা পড়েছি পুরনো স্পোর্টস ম্যাগাজিনে।'

মিঃ গুপ্তর মুখ কিছুটা প্রসন্ন হল। হালকা সুরে বললেন—'আপনার নাম ?'

'জয় দত্ত।'

'আপনার কি মোটর-সাইক্লিং এর হবি আছে ?'

'আজ্ঞে না। আমি একজন রিপোর্টার। কলকাতার একটা বাংলা ডেইলি পেপারের।'

'আপনি কি আমার সম্বন্ধে রিপোর্ট করতে এসেছেন ?'

মিঃ গুপ্ত ভুরু কুঁচকোন।

জয় বলল, 'আজ্ঞে না। আমি এসেছি এখানে ছুটি কাটাতে। আপনার কথা শুনে স্রেফ ব্যক্তিগত কৌতূহলে দেখা করতে এসেছি। আপনার কিছু অভিজ্ঞতা শোনা যায় মানে আপনার রেসিং জীবনের।'

খানিক নীরব থেকে নিজের মনের গভীরে যেন ডুব দিলেন বিনয় গুপ্ত। তারপর ধীর কণ্ঠে বললেন, 'হুঁ কিছু এক্সপিরিয়েন্স মনে দাগ কাটে বৈকি। সে সব ভোলার নয়। কিছু রেস জেতার অভিজ্ঞতা। কিছু পরাজয়ের এবং বিশেষত কিছু অ্যাক্সিডেন্টের এক্সপিরিয়েন্স। দু দু-বার আমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। এছাড়া মাইনর অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছি বার তিন-চার।

কত বয়স অবধি আপনি কম্পিটিশানে জয়েন করেছেন ?' জয় জিজ্ঞেস করে।

'আটত্রিশ বছর অবধি। নাউ আই অ্যাম সিক্সটি-সিক্স। বোম্বেতে একটা রেসে গাড়ি পিছলে যেতে পড়ে গিয়ে মারাত্মক চোট পাই কাঁধে। মাসখানেক হসপিটালে থাকতে হয়। এরপর থেকে আর কম্পিটিশনে নামিনি। খানিকটা ডাক্তারের নির্দেশে আর খানিকটা বলতে পারেন আমার স্ত্রীর একান্ত অনুরোধে।'

'আপনার পুরনো ফোটো কিছু আছে বাইরে, মানে রেসিং-এর মোটর সাইকেল চড়া অবস্থায় ? যদি দেখতে পেতাম।' জয়ের কণ্ঠে অনুনয়।

'আছে। আসুন ড্রইং-রুমে।' মিঃ গুপ্ত উঠলেন। হেঁটে গিয়ে ঢুকলেন সামনে বৈঠকখানায়। পদক্ষেপ দৃঢ়। তবে জয়ের মনে হল ওঁর বাঁ হাতখানি যেন একটু আড়ষ্ট। জয় মিঃ গুপ্তর পিছু পিছু গেল।

প্রশস্ত ঘরে অল্প কয়েকটি আসবাব। একখানা গদি আঁটা লম্বা কৌচ। মাঝখানে গোল নিচু বড় টেবিল। টেবিল ঘিরে কয়েকখানা কাঠের চেয়ার। ঘরের দেয়ালে ঝুলছে দুটি বড় ফ্রেমে বাঁধানো ফোটোগ্রাফ। দুটোই মোটরসাইকেলে আরোহিত মিঃ গুপ্তর ফোটো। দুটোয় দু'রকম ভঙ্গি। একটায় স্তব্ধ রেসিং বাইকের ওপর মাটিতে পা ছুঁয়ে বসে মিঃ গুপ্ত। গায়ে রেসের উপযোগী পোশাক, তবে মাথায় হেলমেট নেই, খোলা মুখ। মাথা ভরা কালো চুল, খুশিতে উদ্ভাসিত মুখ যুবক বিনয় গুপ্তের বাঁ হাতে ধরা বাইকের হ্যান্ডল এবং ডান হাত উপরে তোলা উল্লসিত ভঙ্গিতে। তাঁর পাশে দু-জন কোট-প্যান্ট পরা বয়স্ক ভদ্রলোক। বোধহয় কোনও রেস জেতার পর তোলা ছবি।

দ্বিতীয় ফোটোতে বিনয় গুপ্ত ধাবমান মোটর সাইকেলে উবু হয়ে বসে। পুরোদস্তুর রেসের সাজে। ছবিতে পথের ধারে কয়েকজন রেসের লোক এবং পেছনে একটা বাড়ির চেহারা দেখে জয়ের কেমন খটকা লাগল। সে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি এদেশে তোলা ?

'না। ফ্রান্সে।' জবাব দিলেন মিঃ গুপ্ত।

'আপনি বিদেশে কম্পিটিশনে জয়েন করেছেন!' জয়ের কণ্ঠে বিস্ময়।

'করেছি কয়েকবার', বললেন গুপ্ত, 'লাকিলি পারিবারিক ব্যবসার আয়ে কোনওরকমে বিদেশে যাবার খরচ মেটাতে পেরেছি। তবে অসুবিধে ছিল অনেক। বিদেশীদের স্ট্যান্ডার্ডে গাড়ি বা প্র্যাকটিসের সুযোগ পাইনি। তত খরচ করার সামর্থ ছিল না। তাই তেমন ভাল কিছু রেজাল্ট করতে পারিনি ফরেনে। জার্মানিতে একটা রেসে সেকেন্ড হয়েছিলাম। বলা যায় বিদেশে ওটাই আমার সব থেকে বড় সাকসেস্। তবে এক্সপিরিয়েন্সের দিক দিয়ে মস্ত লাভ হয়েছিল। যাক, বলুন কি খাবেন ? চা না কফি ?'

'যা ইচ্ছে।' বলল জয়। বিনয় গুপ্ত সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধা বাড়ছে। মানুষটির কথাবার্তায় কোনও অসঙ্গতির লক্ষণ তো বুঝছে না।

'বাহাদুর।' ডাক দিলেন মিঃ গুপ্ত।

বেঁটেখাটো জোয়ান মাঝবয়সী একটি লোক এসে দাঁড়াল।

'কফি আন।' হুকুম দিলেন গুপ্ত।

কফি পান করতে মিনিট পনেরো বিনয় বাবুর রেসিং জীবনের কয়েকটি রোমহর্ষক ঘটনা শুনতে শুনতে জয় হঠাৎ বলল, 'এখানে আপনার একটা পুরনো মোটর-বাইক এনে রেখেছেন, তাই না। রেসিং বাইক বোধহয় ?'

বিনয়বাবুর কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ে। গম্ভীর গলায় বললেন 'হুঁ। আপনি জানলেন কি ভাবে ?'

জয় বলল, 'এখানকার লোকেরা বলছিল। খুব স্বাভাবিক। পুরনো দিনের স্মৃতি। আমার এক কাকা একজন নামকরা সাইক্লিস্ট ছিলেন। মানে বাইসাইক্লিস্ট। কম্পিটিশন থেকে রিটায়ার করার পর তাঁর একখানা প্রিয় রেসিং সাইকেল সাজিয়ে রেখেছিলেন বাড়িতে। কাকা গত বছর হঠাৎ মারা গেছেন সাতান্ন বছর বয়সে।

'সেই সাইকেলটার কি হল ?' জিজ্ঞেস করলেন মিঃ গুপ্ত।

'কাকা বলে রেখেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর ওই সাইকেলখানা কোনও ইয়াং সাইক্লিস্টকে দান করতে। সম্ভাবনাময় প্রতিভাবান অল্পবয়সী কোনও সাইক্লিস্ট। অথচ অভাবী। ভাল রেসিং সাইকেল কিনতে পারছে না। এমনি কাউকে। আমরা তেমনই একজনকে দিয়ে দিয়েছি সাইকেলটা।'

'ওয়াইজ', মাথা ঝাঁকালেন গুপ্ত সাহেব, 'কিন্তু আমার বেলা কি আর তা সম্ভব হবে ? জানি না কি আছে ওর ভাগ্যে ?' শেষ কথাগুলি নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে চিন্তিত ভাবে কয়েকবার মাথা নাড়লেন তিনি।

'আপনার গাড়িখানা একবার দেখতে পারি ?' বলল জয়, 'মানে যদি আপত্তি না থাকে।'

এক পলক জয়ের মুখ পানে তীক্ষ্ণ নজর হেনে মিঃ গুপ্ত বললেন—'নাঃ, আপত্তির কি ?' আসুন।'

বাড়ির লাগোয়া গ্যারাজ। তালা খুলে টিনের দরজা ঠেলে হাট করে খুলে দিলেন মিঃ গুপ্ত। জয় দেখল, গ্যারেজের মাঝখানে স্ট্যাণ্ডে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে আছে গাঢ় সবুজ রঙা একটি ঝকঝকে মোটর সাইকেল। তার আকারটা সাধারণ মোটর সাইকেল থেকে কিছুটা ভিন্ন। একটু পেট মোটা গড়ন। প্রথম দর্শনে নতুন মনে হলেও খুঁটিয়ে দেখে বোঝা যায় গাড়িটি বেশ প্রাচীন। তার গায়ে অনেক ক্ষত চিহ্ন ও মেরামতির ছাপ। তবে যত্নে রাখায় গাড়ির গায়ে ময়লা বা মরচে নেই। মাজাঘষায় চকচক করছে।

'বাঃ !' জয়ের গলা দিয়ে অস্ফুট প্রশংসার ধ্বনি বেরোয়।

বিনয়বাবু এগিয়ে গাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে পরম স্নেহে মোটর বাইকটির গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন।

জয় বলল, 'গাড়িটা মনে হয় পুরনো কিন্তু নতুন দেখাচ্ছে।'

'হুঁ, মাথা ঝাঁকালেন মিঃ গুপ্ত, 'এর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। শেষ কটা রেসে আমি এটাই চালিয়েছি। ওর নাম দিয়েছিলাম ঈগল। আমার এক ইংরেজ বন্ধুর সাহায্যে বি·এস·এ· কোম্পানিকে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে তৈরি করাই।'

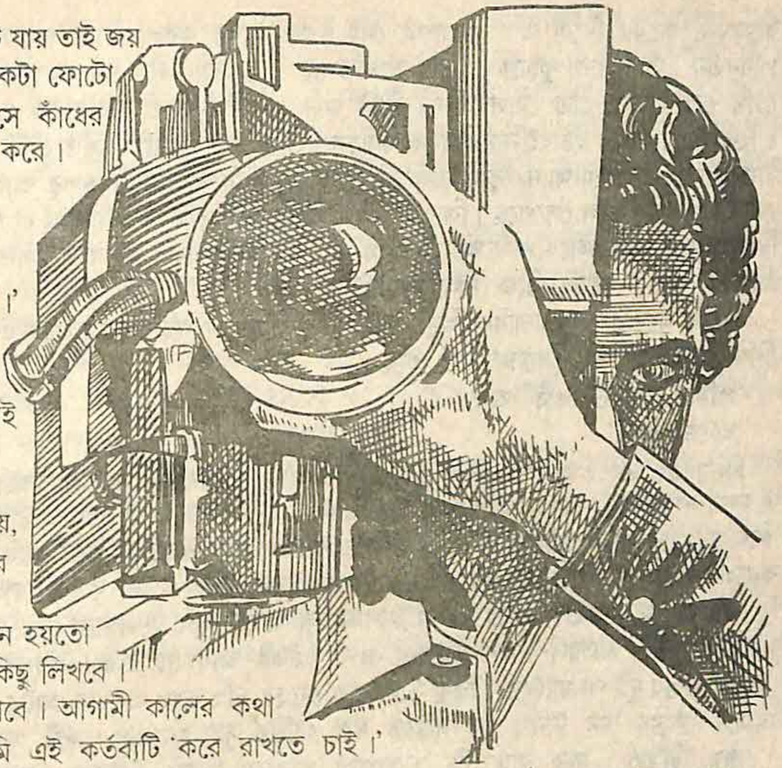
বিনয় গুপ্তর হাবভাব দেখতে দেখতে জয় হেসে বলল, 'জানেন, আমার কাকাও তাঁর সাইকেলটা এমনি ঝকঝকে রাখতেন। প্রত্যেক দিন পুঁছতেন। তেল দিতেন প্রায়ই। আর এমনি ভাবে সেটার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতেন। নিজের মনে কথাও বলতেন সাইকেলটার সঙ্গে। 'আমরা হাসাহাসি করলে চটে যেতেন।'

মিঃ গুপ্ত কঠিন স্বরে বললেন, 'আপনারা হাসতেন কেন ?'

জয় একটু অপ্রতিভ হয়ে বলে, 'না মানে বলতাম, ও কি শুনতে পায় ? জবাব দেয় ? মজা করে বলতাম আর কি। কাকা কিন্তু ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিতেন। রেগে গিয়ে বলতেন, হ্যাঁ ও শোনে। জবাব দেয়। সে আমি ঠিক বুঝি। তোরা বুঝবিনে। আমার ছোট ভাই পেছনে লাগত বেশি। কাকার হাইব্লাডপ্রেসার ছিল। মেজাজ গরম করলে পাছে শরীরের ক্ষতি হয় তাই পরে আর আমরা এই নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতাম না। কাকা মারা যাবার বছর তিনেক আগে পর্যন্ত প্রত্যেক দিন একবার সাইকেলটা চেপে ঘুরে আসতেন। কিন্তু একবার হার্টঅ্যাটাক হবার পর ডাক্তার সাইকেল চাপতে বারণ করলেন। তারপর থেকেই অমনি ঘরে বসে সাইকেলটার সঙ্গে কথা বলতেন।'

মিঃ গুপ্ত মোটর-বাইকটার গায়ে হাত রেখে আনমনা ভাবে বললেন—'আপনার কাকা ঠিকই বলতেন। বোঝা যায়।' অতঃপর তিনি একই বাঁকা সুরে বললেন, 'সরি, বাইরের লোকে ব্যাপারটা ঠিক বুঝবে না।'

মিঃ গুপ্তর শেষ কথাগুলির খোঁচায় জয় মনে মনে তেতে উঠেছিল। তার ঠোঁটে এসে গেছিল—আপনার জকি আর বাহনগুলি ঘোড়া হলে না হয় বুঝতাম। যাক এই নিয়ে তর্ক না তুলে সে চুপ করে থাকে। তবে জয়ের মুখ দেখে তার মনের ভাব আঁচ করেন মিঃ গুপ্ত। তিনি কিছু বললেন না বটে তবে একটু ব্যঙ্গ মেশানো মুচকি হাসলেন।



পাছে আলাপের সুর কেটে যায় তাই জয় অন্য প্রসঙ্গে ফিরল। বলল, 'একটা ফোটো তুলতে চাই।' বলতে বলতে সে কাঁধের ঝোলা থেকে ক্যামেরা বের করে।

বিনয় গুপ্ত ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কার ?'

'দু'জনেরই। আপনার এবং আপনার গাড়ির।'

'এখন আর এসব কেন ? যখন তোলার দিন ছিল, তুলেছি। এখন আমরা দু'জনেই তো ওল্ড ফসিল।'

'প্লিজ', অনুরোধ জানায় জয়, 'ভারতের মোটর সাইক্লিস্টদের নিয়ে একসময় নিশ্চয় ডিটেলস্‌-এ লেখা হবে। তখন হয়তো শ্রীবিনয় গুপ্ত সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখবে। তখন এই ছবি খুব কাজে লাগবে। আগামী কালের কথা ভেবেই আমি এই কর্তব্যটি করে রাখতে চাই।'

এক ঝলক বিষণ্ণ হাসি দেখা গেল বিনয় গুপ্তর মুখে। কয়েক পলক ভেবে নিয়ে বললেন, 'অলরাইট।' তিনি মোটর-বাইকটার পাশে জয়ের মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

জয় এবার আসল কথাটি পাড়ল। তাক করছিল সে। বিগলিত স্বরে বলল, 'স্যার একটি বিনীত অনুরোধ আছে।'

'কি ?'

'এই ড্রেসে নয়। অতীতের বিখ্যাত মোটর-সাইক্লিস্ট বিনয় গুপ্তকে ড্রেসিং গাউন পরে তাঁর প্রিয় রেসিং-কারের সঙ্গে মানায় না। তা যে বয়সেই হোক। ছোট ভাই হিসেবে আবদার করছি আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। আগেকার রেসে নামার ড্রেস পরে ঈগলের পিঠে চড়া অবস্থায় আপনার ফোটো তুলতে চাই।'

'নো নো ইম্‌পসিবল।' ঘাড় নাড়েন মিঃ গুপ্ত।

জয় মিনতি জানায়, 'প্লিজ। আমার কাকারও এমনি পোজে একটা ফোটো তুলে রেখেছিলাম ওঁর তিপ্পান্ন বছর বয়সে। কাকাও প্রথমে খুব আপত্তি করেছিলেন তখন ছবি তুলতে। জানেন মাস দুই আগে একটা নামকরা ইংরেজি ম্যাগাজিন থেকে এসেছিল ওঁর কিছু ফোটোর খোঁজে। ওরা অতীতের বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান সাইক্লিস্টদের নিয়ে একটা আর্টিকল ছাপছে। কাকার ওই শেষ বয়সের ছবিটা পেয়ে মহা খুশি হল। তাই বলছি। সেই ড্রেস আপনার আছে নিশ্চয়ই। আমি জানি অনেক ফেমাস স্পোর্টসম্যান তাঁর স্পোর্টিং ড্রেস, সরঞ্জাম যত্ন করে রেখে দেন স্মৃতি চিহ্ন রূপে।'

ঈগলের গায়ে হাত রেখে মিঃ গুপ্ত চিন্তামগ্ন নীরব। একটুক্ষণ এইভাবে থেকে তিনি মুখ তুলে জয়ের দিকে তীব্র স্থির দৃষ্টি রেখে গভীর স্বরে বললেন, 'অলরাইট।'

বিনয় গুপ্ত ধীর পদক্ষেপে চলে গেলেন বাড়ির ভিতরে। জয় ক্যামেরা ঠিকঠাক করতে লাগল।

মিনিট পনেরো বাদে ফিরে এলেন বিনয়বাবু। তাঁর গায়ে পুরু প্যাড দেওয়া নীলরঙা জার্কিন। কোমর থেকে হাঁটুর নিচ অবধি মোটা কালো কাপড়ের ব্রীচেস্‌। পায়ে খাঁজ কাটা রবার সোলের ক্যাম্বিসের জুতো। হাতে গ্লাভস্‌। বাঁ হাতে ঝুলছে মাথায় পরার হালকা নীল হেলমেটটা।

গটগট করে গ্যারাজে ঢুকে তিনি মোটর-বাইকটার গায়ে হাত রেখে দাঁড়ালেন। যেন একটা ঘরের মধ্যে



রয়েছেন, জয়ের দিকে তাঁর খেয়ালই নেই। জয় লক্ষ্য করল, বিনয় গুপ্তর মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত পরিবর্তন। তাঁর চোখ কুঁচকে গেছে। আপাতশান্ত কিন্তু উত্তেজনায় ঘন ঘন শ্বাস ফেলছেন। গাড়িটার সর্বাঙ্গে চোখ বোলাচ্ছেন, হাত বোলাচ্ছেন। তিনি ডান হাতের মুঠিতে বারকয়েক চেপে ধরলেন মোটর-বাইকের হ্যাণ্ডল। তাঁর যেন হঠাৎই নজর পড়ল জয়কে। তীক্ষ্ণ চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে দৃঢ় চাপা কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন, 'ইয়াংম্যান, তুমি একজন রিপোর্টার। রিপোর্টারদের ওপর আমার খুব বিশ্বাস নেই। তবে তোমায় আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু হ্যাঁ, কথা দিতে হবে, তুমি আজ এখানে যা দেখবে বা শুনবে তার কোনও কিছু প্রকাশ করা চলবে না। অন্তত আমি যতদিন বেঁচে থাকব। একটি কথাও যেন বাইরে না ফাঁস হয়। প্রতিজ্ঞা কর। নইলে প্লিজ ক্লিয়ার-আউট।'

জয়ের মনে হল অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে। সে তৎক্ষণাৎ আন্তরিক সুরে জানাল, 'কথা দিচ্ছি। আপনি যা বললেন তাই হবে।'

'প্রমিস। ওয়ার্ড অব্ অনার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বিনয় গুপ্ত এবার মাথায় গলিয়ে নিলেন হেলমেটটা। তারপর মোটর বাইকটা ধরে তার স্টার্টারে পা রেখে একবার দাবালেন। আশ্চর্য ব্যাপার। মাত্র একবার স্টার্টারে ধাক্কা দিতেই অত পুরনো গাড়ির ইঞ্জিন ভট্ ভট্ করে সজোরে গর্জে উঠলো। মিঃ গুপ্ত অতঃপর পা তুলে চড়ে বসলেন গাড়ির সীটে। তিনি গীয়ার চেঞ্জ করলেন। মুহূর্তে গাড়ির ইঞ্জিন গোঁ গোঁ করে উঠল, ঠিক মোটর বাইক ছোটার সময় যেমন শব্দ হয়।

জয় চমকে সরে গেল ধারে। তার আশঙ্কা হল গাড়িটা বুঝি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে যাবে গ্যারাজ থেকে।

গাড়ি কিন্তু এগোল না। স্ট্যাণ্ডের ওপর একই জায়গায় স্থির। থরথর করে কাঁপছে গাড়িটা।

মিঃ গুপ্তর দুই পা মাটিতে। কিন্তু তাঁর বাকি দেহের ভঙ্গি হুবহু ধাবমান মোটর বাইক চালকের মতন। শরীর সামনে ঝোঁকা টান টান। দৃঢ় মুষ্টিতে ধরা গাড়ির দুই হ্যাণ্ডেল। দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ।

জয় স্তম্ভিত। তার বুদ্ধিশুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে যাবার উপক্রম। অনেকগুলো প্রশ্নের ঢেউ মনে তোলপাড়। যার কোনও ব্যাখ্যা সে খুঁজে পায় না।

গাড়িটা অত জোরে স্টার্ট নিল কিন্তু এগজস্ট পাইপ থেকে ধোঁয়া বেরুল না কেন? গাড়ির ইঞ্জিনে যেন অবিকল প্রচণ্ড দ্রুত গতিতে ছোটার শব্দ। শব্দ মাঝে মাঝে বাড়ছে কমছে গীয়ার চেঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এই স্তব্ধ গাড়িতে তা কিভাবে সম্ভব? গাড়ি কাঁপছে যেন গতির উত্তেজনায় অথচ এগুচ্ছে না। এছাড়া মিঃ গুপ্তর হাবভাব! সমস্ত ব্যাপারটা জয়ের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকে। অথচ ঘটনাটা ঘটছে তার চোখের সামনেই। সে এত অবাক হয়েছিল যে ফোটো তুলতেও ভুলে গেল।

এইভাবে মিনিট খানেক কাটল। মিঃ গুপ্ত গীয়ার চেঞ্জ করতে করতে স্টার্ট বন্ধ করলেন। মোটর বাইকের ইঞ্জিনের গর্জনও অমনি থেমে গেল। একটা মৃদু শোঁ শোঁ আওয়াজ হতে হতে ক্রমে একেবারে নীরব হয়ে গেল।



বিনয় গুপ্ত নামলেন গাড়ি থেকে। মাথার হেলমেট খুলে ফেললেন। তাঁর চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। আবার উত্তেজনা-মুক্তির ফলে একটা হালকা ভাবও মুখে। তিনি প্রসন্ন কণ্ঠে জয়কে বললেন, 'কি? দেখলে?'

'কি-ন-তু?' জয়ের গলা দিয়ে এর বেশি কিছু উচ্চারিত হয় না।

মিঃ গুপ্তর ঠোঁটে মৃদু হাসি। তিনি স্মিত মুখে চেয়ে থাকেন!

জয় উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠে, 'মনে হচ্ছিল যেন গাড়িটা দারুণ স্পিডে ছুটছে কিন্তু তা কি করে হয়? এগজস্ট পাইপ থেকে গ্যাসও কৈ বেরুল না। আশ্চর্য!'

'সম্ভব। অনেক কিছুই সম্ভব,' বললেন মিঃ গুপ্ত, 'দেখ একটা জিনিস।'

তিনি গাড়ির তেলের ট্যাংকের ঢাকনিটা খুলে ফেলে, মেঝে থেকে একটা লম্বা কাঠি তুলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন ট্যাংকে। তারপর কাঠিটা বের করে নিয়ে জয়ের মুখের সামনে ধরে বললেন, 'তেলের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ কি?'

'কৈ না!' থ হয়ে মাথা নাড়ে জয়।

'অর্থাৎ ট্যাংকে তেল নেই তবু গাড়ি স্টার্ট নিল। এবং যেন ছুটল। ছোটে, আমার ঈগল ছোটে। রেসিং-কার। দুরন্ত গতিতে ছোটার জন্য মাঝে মাঝে ও ছটফট করে আমারই মতন। হারানো দিনের স্মৃতি

ওকে টানে। অস্থির করে তোলে। তবে আগের মতন সেই দুরন্ত গতিতে ছোটা আর সম্ভব নয় ও বোঝে। তাই আমারই মতো ও ছোটে মনে মনে। ওর মনের ভাব আর উত্তেজনা প্রকাশ পায় ওর ইঞ্জিনের শব্দে। তার জন্যে পেট্রল মবিল লাগে না। কখনো কখনো ওর গায়ে হাত রেখেই আমি টের পাই ওর ছটফটানি। তখন ওকে একটু না ছোটালে ব্যথা পায়। তবে হ্যাঁ, আমি পুরোদস্তুর রেসের পোশাকে না এলে ঈগলের ইঞ্জিন স্টার্ট নেয় না, মানে এমনি ফুয়েল ছাড়াই। এটা ওর রীতি। তোমাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তি এ ব্যাপারটা মানতে চাইবে না জানি। কিন্তু উপায় কি? নিজের চোখেই তো দেখলে।

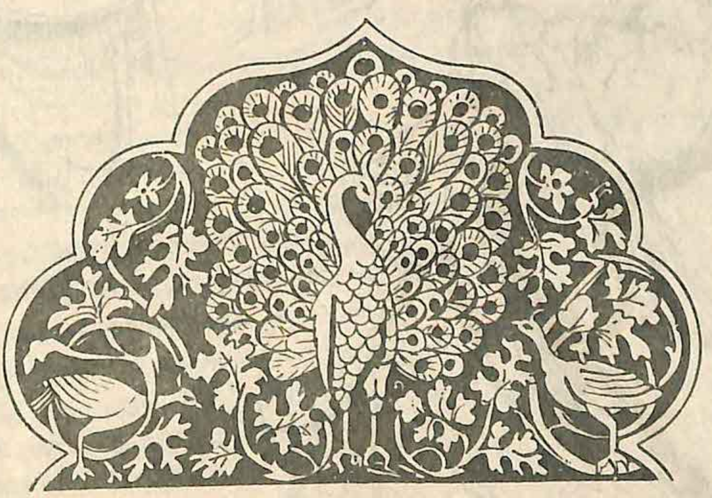
অনেকগুলো কথা এক নাগাড়ে বলে সহসা থেমে গেলেন বিনয় গুপ্ত। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জয়কে বললেন—'প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখ কিন্তু। বাইরে কাউকে এখন কিছু বলা চলবে না। কৌতূহলী বাজে লোকেরা তাহলে আমায় অতিষ্ঠ করে তুলবে।'

'মনে থাকবে। অবশ্যই মনে থাকেব,' আশ্বাস দেয় জয়, 'কিন্তু বাহাদুর?'

'বাহাদুর সব জানে, বললেন মিঃ গুপ্ত, 'ও আমার অনেক কালের পুরনো লোক। ঈগলকে ও বোঝে। আচ্ছা গুড বাই। আই অ্যাম টায়ার্ড। এখন একটু রেস্ট চাই।'

বিনয় গুপ্তর সঙ্গে জয় আর দেখা করেনি। ইচ্ছে করেই দেখা করতে যায়নি। সেদিন আবেগের বশে এক অপরিচিত যুবকের কাছে নিজেকে মেলে ধরার জন্য, তাঁর জীবনের এক অতি প্রিয় গোপন রহস্যকে ফাঁস করে ফেলার কারণে যদি ওঁর মনে পরে আফসোস হয়, ক্ষোভ জাগে? তাহলে হয়তো জয়ের সঙ্গে আবার সাক্ষাতে মিঃ গুপ্তর ব্যবহার রূঢ় হয়ে উঠতে পারে, সেই আশঙ্কায়।

ঘাটশিলার ঘোষবাবুর সঙ্গে জয়ের মাঝে মধ্যে চিঠিপত্র চলে। ঘোষবাবু কলকাতায় মাল কিনতে এলে দেখাও হয়েছে কয়েকবার। গতকাল ঘোষবাবুর চিঠিতেই জয় জেনেছে বিনয় গুপ্ত মহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদ।



নেই-বুড়োর দেশ

নবনীতা দেব সেন



এক যে ছিল যুবক রাজার দেশ। যুবক রাজা নিয়ম করে দিলেন, যেই কেউ বুড়ো হবে, তাকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ধারে অতল নিতল খাদে বিসর্জন দিয়ে আসতে হবে। তাহলে দেখো খাদ্য কম খরচ হবে, জায়গা বেশি বাড়বে আর চাকরি বাকরির অভাব হবে না। বুড়ো মানুষগুলো না পারে ভাল করে কাজকর্ম করতে, না পারে রাজ্যের উন্নতি করতে, কেবল অন্ন ধ্বংস করে আর অন্যের সময় ধ্বংস করে সেবা শুশ্রষা এইসব নিয়ে। যুবক রাজা প্রথমেই তো নিজের বুড়ো ঠাকুর্দাকে ফেলে দিয়ে এলেন। সেই দেখে ভয়েই তাঁর বাবা বুড়ো রাজা হার্ট ফেল করলেন। হার্ট ফেল করলে কি হবে, যুবক রাজা নিয়মটিয়ম পালটালেন না। যেই যে কোনো বাড়িতে বুড়ো বা বুড়ির সত্তর বছর হবে অমনি তাকে

চ্যাং দোলা করে নিয়ে বিসর্জনের ঢাক বাজাতে বাজাতে
মিছিল করে নিয়ে গিয়ে খাদে বিসর্জন দিয়ে আসা হবে। তা, অনেকেরই এতে মন খারাপ হতো, তারা ড্যাডাং, ড্যাডাং বাদ্যি বাজাতো না চুপচাপ চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বুড়ো মা বাবাকে খাদে ফেলে দিয়ে আসতো।

একটা বাচ্চা ছেলে দেবদত্ত, তার বাবা মা কেউ নেই, সে বেচারা দাদুর কাছেই মানুষ। তার দাদুর সত্তর বছর হয়ে গেল। নাতি কী করে ? রাজ্যের আইন তো ভাঙতে পারে না ? চোখের জলে ভাসতে ভাসতে দাদুকে পিঠে করে খাদের দিকে চলল। খাদটা এদিকে অনেক দূরে ওদের গ্রাম থেকে। নাতি হঠাৎ দ্যাখে দাদু গাছগুলোর ডাল ভাঙতে ভাঙতে চলেছেন। 'দাদুভাই তুমি গাছের ডাল ভেঙে কিসের চিহ্ন দিচ্ছ ? বাড়ি ফিরে আসতে পারো যাতে ?'

'পাগল ? খাদ থেকে উঠে কেউ কি বাড়িতে ফিরতে পারে রে ? খাদ যে দু'হাজার ফিট গভীর। পড়লেই ধুলো-ধুলো হয়ে যাব।'

'তবে ? কার জন্যে চিহ্ন দিচ্ছ ?'

'তোর জন্যে। তুই তো বাচ্চা ছেলে, জীবনে কোনোদিন এ পথে আসিস্‌নি। যদি ফিরতে গিয়ে হারিয়ে যাস্ ? তখন তো আমি আর সঙ্গে থাকবো না ?'

কথাটা শুনেই দেবদত্ত বুঝতে পারলে সে কত বড় ভুল করতে যাচ্ছে।—যে দাদু আমাকে এত ভালবাসেন, আইনের ভয়ে তাঁকেই কিনা আমি খাদের মধ্যে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছি ? ছি ছি ছি—নাতি আর গেল না। সে সোজা পেছু ফিরে, ভাঙা ডালপালার চিহ্ন দেখে দেখে নিজের বাড়ি ফিরে এল। দাদুকে সে চুপিচুপি চিলেকোঠার কামরাতে লুকিয়ে রেখে দিলে। রোজ রাত্তিতে গিয়ে দাদুর সঙ্গে গল্প করে। দিনের বেলা লুকিয়ে ভাত খাইয়ে আসে। দাদু সারাদিন বই-পত্তর পড়েন। ভগবানের নাম করেন। একা একা থাকেন।

এমন সময়ে সে দেশের রাজকন্যের, যুবক রাজার একমাত্র আদুরে বোনের খুব জ্বর হোলো। কত ডাক্তারবদ্যি, কত হাকিম, কত বিলেত-ফেরৎ বদ্যি, সবাই দেখে যাচ্ছে, কেউ ধরতে পারছে না কী অসুখ। একদিন দুপুরে রাজার সিং দরজায় এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এসে হাজির। এসে বললে 'জয় হোক মহারাজের !' মহারাজ তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করে বসিয়ে বললেন, 'সন্ন্যাসী ঠাকুর আমার বড্ড দুঃসময় চলছে। একমাত্র বোনটি জ্বরে মরো মরো।'

সন্ন্যাসী বললেন 'তাতে কি হয়েছে, সেরে যাবে'খন। জামাইও জুটে যাবে। যে ওর অসুখ সারাবে, তারই সঙ্গে বিয়ে দেবে, তাকে আদ্দেক রাজত্বও দিতে হবে।' যুবক রাজামশাই মহা আনন্দে বললেন 'নিশ্চয় দেবো।' সন্ন্যাসী তখন বললেন—'শোন তাহলে, যে লোক ছাই দিয়ে একটা দড়ি তৈরি করতে পারবে আর এই শাঁখের মুখে লাল সুতো পরিয়ে তোমার বোনের কোমরে বেঁধে দিতে পারবে, সেই অসুখ সারিয়ে দেবে।' এই বলে একটি গোলাপী রঙের শাঁখ রাজাকে দিয়ে, হর হর বোম্ বোম্ বলতে বলতে, দুটি চাল ভিক্ষে নিয়ে সন্ন্যাসী হিমালয়ের পথে রওনা দিলেন।

যুবক রাজার রাজ্যে তো সবাই যুবো। রাজা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দিলেন, যে ছাই দিয়ে দড়ি তৈরি করে আনতে পারবে, আর সন্ন্যাসীর দেওয়া শাঁখের মুখে লাল সুতো পরিয়ে রাজকন্যের কোমরে বাঁধবার মতন তৈরি করে দিতে পারবে, তার সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ে দেওয়া হবে আর আধখানা রাজত্ব, যা কিনা রাজকন্যের হকের পাওনা, সেটাও দেওয়া হবে।



ঢ্যাঁড়া শুনে সব মানুষের লোভ হয়ে গেল। সবাই খুব চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু এক নম্বরটাই কেউ পারলে না। ছাই দিয়ে দড়ি তৈরি হবে কেমন করে ? এক নম্বর আগে হবে তবে তো দু'নম্বর ? শাঁখে সুতো পরানো ? রাজ্যি জুড়ে হৈ চৈ, কিন্তু কেউই কিছু পারছে না। দেখে শুনে যুবক রাজার খুব মন খারাপ। তার বোনের জ্বর আর সারছেই না। অত মিষ্টি দোপাটি ফুলের মতন মেয়েটা শুকিয়ে যেন কেমনটি হয়ে গেল। তাদের মা তো কবেই ছোটবেলাতে মারা গেছেন। দাদু নেই, বাবা নেই, ঠাকুমাকেও তার দাদা বিরাট ব্যাণ্ড পার্টি বাজিয়ে মশাল নিয়ে শোভাযাত্রা করে খাদে ফেলে দিয়ে এসেছেন। রাজকন্যেকে আদর করবার ভালোবাসবার কেউ নেই। জ্বরও ছাড়ছে না। কন্যে চুপটি করে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন। আকাশে মেঘের খেলা দেখেন গাছের পাতায় আলোর খেলা দেখেন, পাখির গান শোনেন, সামনেই রাজবাড়ির হ্রদের জলে সারাদিন আলোর রং বদল হয় সেই রং-এর খেলা দেখেন। আর ভাবেন, সত্তর বছর হলে তো দাদাকেও

ফেলে দিতে হবে ! ও বাবা সে আমি পারবো না ! ওই ভয়েই তার জ্বর আর ছাড়ে না । মুখে হাসিও ফোটে না । একটাও কথা বলেন না রাজকন্যা মণিদীপা ।

এদিকে হয়েছে কি আমাদের সেই বাচ্চা ছেলে দেবদত্ত এতদিনে একুশ বছরেরটি হয়েছে । নিশুত রাতে যেমন তারা গল্প করে দাদুতে-নাতিতে, সে একদিন দাদুকে বললে 'দ্যাখো তো দাদু ভাই, এমন সুন্দর রাজকন্যেটি আমাদের জ্বরে জ্বরে শুকিয়ে গেল, কেউ সারাতে পারছে না । সন্ন্যাসী ঠাকুর ওষুধ দিয়ে গেছেন, কিন্তু কেউ সেটা তৈরি করতে পারছে না । কী করা যায় বলো তো দাদুভাই ?' দাদু ফোক্‌লা মুখে একগাল হেসে বললেন—'ওরে, ওরা যে উলটোদিক থেকে চেষ্টা করছে । ছাই দিয়ে কি দড়ি বোনা যায় ? যায় না । তুই বরং এক কাজ কর । খুব শক্ত করে, টাইট করে একটা মোটা দড়ি বোন্ । তারপর খুব সাবধানে সেটা পোড়াতে হবে যাতে দড়ির আকৃতি বজায় থাকে, অথচ সেটা ছাই হয়ে যায় । সে আমিই পুড়িয়ে দোবো, তুই দড়িটা তো বুনে ফ্যাল্ ।'

দেবদত্ত খুব যত্ন করে একটা শক্ত-পোক্ত দড়ি বুনে দাদুর কাছে নিয়ে এলো । একটি থালার ওপর সেটা গোল করে গুটিয়ে রেখে দাদু এমন কায়দা করে সেটা পোড়ালেন যাতে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সেটা একটা গোটানো দড়ি । কিন্তু ছাইয়ের তৈরি । দাদু বললেন—'যাও দাদাভাই এইবার তুমি থালাটা নিয়ে রাজবাড়িতে যাও ।'

দেবদত্ত তো ছাইয়ের দড়ি নিয়ে রাজসভাতে হাজির । সভা সুদ্ধু তালি বাজিয়ে দেবদত্তকে সভাসদরা সবাই ধন্য ধন্য করে উঠলেন । যুবক রাজা তো ছাইয়ের তৈরি দড়ি দেখে অবাক । আর তেমনি খুশি । তিনি এবারে ওকে সন্ন্যাসীর দেওয়া গোলাপী শাঁখটি দিয়ে বললেন 'এই নাও, এতে লাল সুতো পরিয়ে নিয়ে এসো ।' দেবদত্ত বাড়ি এসে যত চেষ্টা করে, সরু ছুঁচ, মোটা ছুঁচ, মুক্তো গাঁথবার বাঁকা ছুঁচ, হাত পা কেটে গেলে বদ্যি যে ছুঁচে মানুষের চামড়া সেলাই করে সেই কাস্তের মতন ছুঁচ—উঁহু ! শাঁখের মুখে কোনো ছুঁচই গলবে না । তখন সুতোয় মোম লাগিয়ে শক্ত করে ঢোকাতে চেষ্টা করলে, উঁহু ! সেও গলে না । দেবদত্ত আবার গেল চিলেকোঠায় দাদুর কাছে । দাদু তখন একটা বই পড়ছিলেন ।

'দাদুভাই, এই শাঁখের ভেতরে এই লাল সুতোটা কেমন করে পরাই বলো তো ? কত চেষ্টা করলুম কিছুতে পারছি না ।'

দাদু কিছুক্ষণ টাক চুলকে ভাবলেন । তাই তো ? এটা তো বেশ ঘোরালো সমস্যা ! তারপর দাদু দেখলেন দেয়াল দিয়ে এক সারি পিঁপড়ে যাচ্ছে । অমনি তাঁর পাকা মাথায় একটা দারুণ বুদ্ধি এসে গেল । তিনি বললেন—'এক কাজ কর । এই শাঁখের ভেতরে কিছু চিনি ভরে দে । আর একটা সরু চালের ভাত রসে ডুবিয়ে তাতে লাল সুতোটা আটকে দে ! সেই ভাতটা এই পিঁপড়েটাকে দে । আর তারপর পিঁপড়েটাকে শাঁখের মধ্যে ঢুকিয়ে দে । ও চিনির লোভে ভাত মুখে নিয়েই ঢুকে যাবে, সুতোটাও ঢুকে যাবে । চেষ্টা করে দেখতে তো ক্ষতি নেই ?' দেবদত্ত খুব খুশি হয়ে ঠিক দাদু যেমন যেমন বলেছিলেন তেমন তেমন কাজ করলে । আর ওমা ? কী কাণ্ড ! ওরে আয় রে আয়, রাজ্যের লোক দেখবি আয়, কী কাণ্ড ! শাঁখের ভেতর লাল সুতো গলে গেছে । পিঁপড়ে ঠিক ওমুখটি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে !

দেবদত্ত দৌড়ে গিয়ে দাদুভাইকে জড়িয়ে ধরে দুগালে দুখানা চুমু খেলে । 'ভাগ্যিস তুমি আছো দাদুভাই, তাই তো সন্ন্যাসীর ওষুধ ফলল ? এবার রাজকন্যে আমাদের ঠিক সেরে যাবেন ।'

গোলাপী শাঁখে লাল সুতো পরিয়ে দেবদত্ত আরেকবার রাজসভায় হাজির হতেই যুবক রাজা দৌড়ে রাজসিংহাসন থেকে নেমে এসে দেবদত্তকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে । আর বললেন, 'তুমিই আমার বোনের প্রাণ বাঁচিয়েছো । তুমিই ভাই ওকে বিয়ে করবে, আর আদ্দেক রাজত্ব পাবে ।' সভা সুদ্দু হাততালি দিয়ে জয়ধ্বনি করে উঠল । সখিরা গিয়ে রাজকন্যের কোমরে শাঁখটি পরিয়ে দিল । মাথার কাছে ছাইয়ের দড়ি আগেই রেখেছিল । রাজকন্যে উঠে বসলেন । জানলার বাইরে কদম গাছে দুটো শালিক পাখি ঝগড়া করছিল, তাদের বললেন ওরে তোরা থাম । সকাল বেলায় ঝগড়া করতে আছে ?' রাজকন্যে কথা বলেছেন শুনে সখিরা খুব খুশি । দেশ জুড়ে আনন্দের ঢেউ বইল ।

রাজামশাই এবারে দেবদত্তকে জিজ্ঞেস করলেন 'বিয়ে করবে তো ? রাজপুরোহিত তো বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলেছেন বিয়ের মানে কন্যা আর রাজ্য সম্প্রদান হবে কিন্তু ।' দেবদত্ত বললে—'একবার দাদুভাইকে জিজ্ঞেস করে আসি ।' রাজা বললেন—'সে কি ? তোমার দাদুভাই আছে ?' দেবদত্ত বললে, 'হ্যাঁ, মহারাজ ।

আমি আমার দাদুকে খাদে ফেলতে পারিনি। নিয়ে গিয়েও ফেরৎ এনেছি। আর চিলে কোঠাতে লুকিয়ে রেখেছি। আমার দাদু ভাইই তো ছাইয়ের দড়ি তৈরি করবার বুদ্ধি দিয়েছেন, আমার দাদু ভাইই তো শাঁখে সুতো পরানোর বুদ্ধি দিয়েছেন। পাকা মাথা ছাড়া ও সব কখনো পাওয়া যায় ?'

রাজামশাই তখন বললেনন 'তাই তো ? তবে তো তোমার দাদুই আমার বোনের প্রাণ বাঁচিয়েছেন বলতে হবে। তাহলে তো বুড়োরা আবর্জনা নয় ? নাঃ দেশের আইন বদলে দিলুম। আর বুড়োবুড়িদের খাদে ফেলে দেওয়া হবে না। তাদের সবাইকে যত্ন করে চিলেকোঠাতে তুলে রাখা হোক!' দেবদত্ত হেসে ফেললে! বললে—'মহারাজ, চিলেকোঠায় জীবন কষ্টকর। বুড়ো বুড়িদের আর সকলের সঙ্গেই সংসারে বাঁচতে দিন। আজ আপনার বাবা-ঠাকুরদা থাকলে, আর রাজকন্যা মণিদীপাকে এতদিন ভুগতেই হোতো না।' রাজামশাই বললেন 'ঠিক কথা!'

রাজ্যে আবার ট্যাড়া পড়লো 'সব দাদু দিদারা যিনি যেমন সংসার করেছেন, তেমনই করবেন। খাদে বিসর্জন দেওয়া বেআইনি হয়ে গেল।'

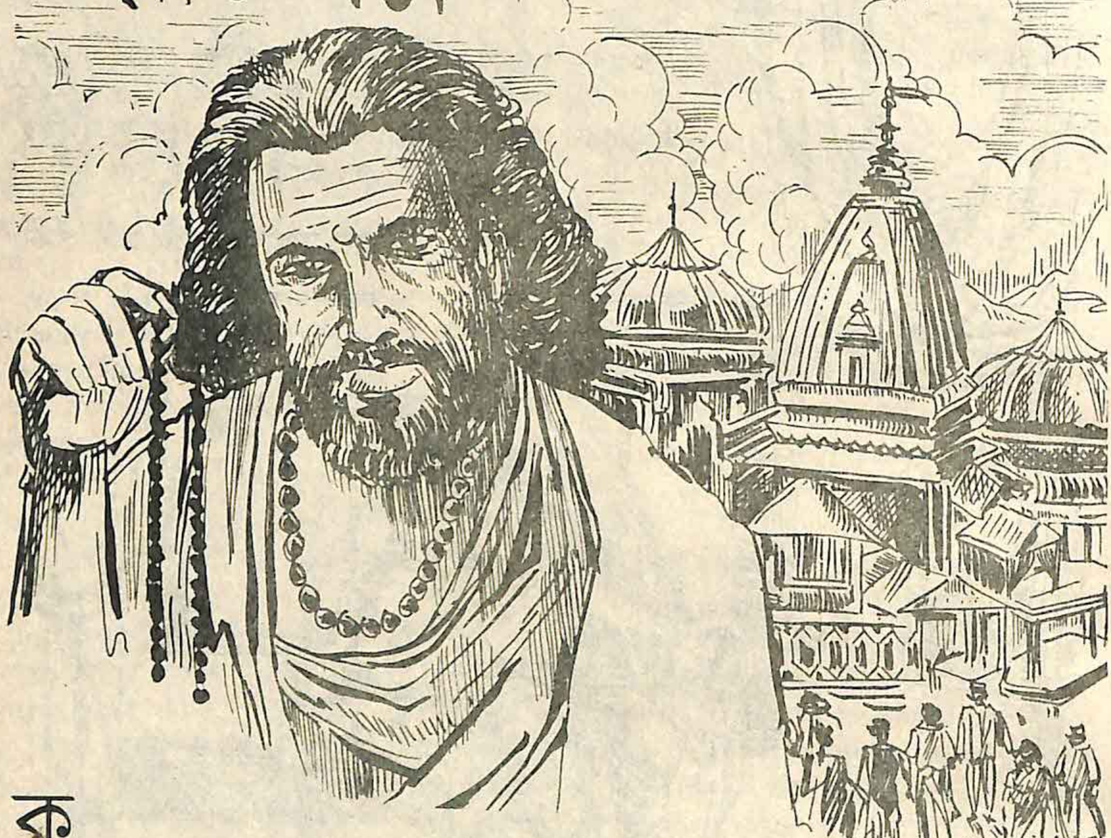


আর অন্তঃপুরে বসে সেই খবর শুনে রাজকন্যে মণিদীপা আহ্লাদে হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন। ঘরে ঘরে আনন্দের ঢেউ বইল।

তারপর এক শুভলগ্নে দেবদত্ত আর মণিদীপার বিয়ে হয়ে গেল। দাদুভাইয়ের আনন্দ দ্যাখে কে ? তিনি এখন রাজার দাদু!

জাতিস্মর

পার্থ চট্টোপাধ্যায়



কুম্ভমেলার ওপর একটি বই লেখার জন্য প্রকাশক আমাকে এবার হরিদ্বার কুম্ভমেলায় পাঠিয়েছিলেন সমস্ত খরচ-খরচা দিয়ে। ভ্রমণকাহিনীর লেখক হিসেবে আমার যথেষ্ট নাম আছে। আমার আসল নাম সমীরণ রায়। 'মুসাফির' ছদ্মনামে লিখে থাকি। আমার সাম্প্রতিক বই 'স্বর্গের দরজায়', অল্পদিনের মধ্যে এ-বইয়ের চারটি সংস্করণ হয়ে গেছে। বইটি মানস সরোবর ভ্রমণের ওপর লেখা। আগে পোস্টাল বিভাগে কেরানির চাকরি করতাম। বই লিখে দু'পয়সা ঘরে আসায় এখন চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। পাঠকেরা এখন বেশ চালাক হয়ে উঠেছেন। তাঁরাও বহু দেশ-বিদেশ ঘোরেন। ভ্রমণকাহিনীতে কোথাও ভুল থাকলে তাঁরা এসে ঘ্যাক করে চেপে ধরবেন। কাজেই সবসময় ঘোরাঘুরির মধ্যেই থাকতে হয়। কুম্ভমেলা নিয়ে কী লিখব মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছি। 'অমৃতকুম্ভে সাধুসঙ্গ'। সাধুদের ব্যাপারটা নিয়েই বেশি করে লিখব। আমাদের লেখকদের বাজারের কথাও ভাবতে হয়। কুম্ভমেলার ওপর হয়তো আরও বই বেরোবে। কাজেই আমাকে একটা নতুন দিক বেছে নিতে হবে।

যাবার সব উদ্যোগ-আয়োজন করছি। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে থাকব ঠিক হয়েছে। তীর্থে গিয়ে বরাবর ওঁদের ওখানে উঠি। দুটি বাংলা কথা বলে বিদেশ-বিভুঁইতে ভীষণ তৃপ্তি লাগে। তা ছাড়া ওঁরা লেখক বলে আমাকে বেশ খাতির-যত্ন করেন। একটা পুরো ঘরই ছেড়ে দেন।

আমি কুম্ভে যাচ্ছি, কোথা থেকে এই খবর পেয়ে অধীরদা এসে আমায় ধরলেন। "সমীর, তোমার বউদি

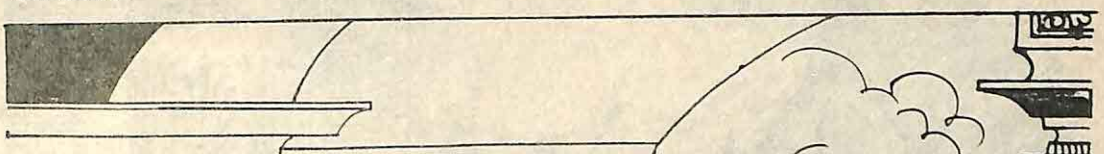
শেষ মুহূর্তে বায়না ধরেছে কুম্ভে যাবে। আমি তো কোথাও কোনও থাকার জায়গার ব্যবস্থা করতে পারছি না। তুমি লেখক মানুষ। তোমার আলাদা খাতির। যদি দাদা-বউদিকে একটু সাহায্য করো।"

আমি বললাম, "দেখুন, আমি আপনাদের কথা দিতে পারছি না। তবে মহারাজাদের অনুরোধ করব। আর আমি যদি একটা ঘর পাই, না হয় ভাগাভাগি করে থাকব। আপনাদের যদি অসুবিধে না হয়।"

অধীরদা বললেন, "না, না, অসুবিধে যা হবার তোমারই হবে। তবু তুমি যে ভরসা দিচ্ছ, এটুকুই যথেষ্ট। ভগবান তোমার ভাল করবেন। তুমি অমিতের বন্ধু ছিলে, তোমাকে ছোটবেলা থেকে নিজের ভাইয়ের মতোই দেখি।"

এইখানে অধীরদার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বলে রাখি। অধীরদা আমার গ্রামের ছেলে। আমাদের পাড়াতেই বাড়ি। আমার কলেজ-জীবন পর্যন্ত দেশের বাড়িতেই কেটেছে। অধীরদার ভাই অমিত আমার স্কুলে সহপাঠী ছিল। শুধু সহপাঠী বললে ভুল হবে। অমিত ছিল আমার প্রাণের বন্ধু। পড়াশোনাতে খুব ভাল ছিল, বরাবর স্কুলের পরীক্ষায় সে ফার্স্ট হত। ওর সঙ্গে আমার সবচেয়ে বড় মিল ছিল এইখানে যে, দু'জনেই সাহিত্যচর্চা করতাম। 'লিপিকা' বলে একটি হাতে-লেখা ম্যাগাজিন বার করেছিলাম। দু'জনে। অধীরদা অমিতের আপন দাদা নয়, বৈমাত্রেয় দাদা। অমিতের বাবা অমিতের ছেলেবেলাতে মারা যান। অধীরদা কলকাতায় চাকরি করতেন। মাঝে-মাঝে দেশে আসতেন। তবে, অমিতের বাবা বেশ মোটা সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। পুকুর, বাগান, তা ছাড়া বাড়ির একটা অংশ ভাড়া দেওয়া ছিল। এ থেকে চলে যেত ওদের। কিন্তু অমিত যখন স্কুল ফাইনাল দেবে, সে-সময় এক অসুখে ধরল তাকে। দুরারোগ্য নাকি সেই অসুখ। কিছুদিন পরে ওর দাদা মানে এই অধীরদা ওকে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। সেখানেই অমিত মারা যায়। কিছুদিন পরে অমিতের মায়েরও মৃত্যু হয়।

অমিতের কথা আমি জীবনে কোনদিনও ভুলতে পারিনি। এই যে আমি আজ এত নামজাদা লেখক হয়েছি, এর পিছনে আমার ছেলেবেলায় ছিল অমিতের প্রেরণা। আমরা দু'জনে দু'জনকে নানাভাবে প্রেরণা জোগাতাম।



গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে আমি কলকাতায় চলে আসি। তারপর জীবন-সংগ্রাম। সব-শেষে এই পুরোপুরি লেখক জীবন। কিন্তু কলকাতায় পাকাপাকি ভাবে চলে এলেও আমার গ্রামের লোকেরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। আমি এখন নামী লেখক, এতে গ্রামের লোকেদেরই গর্ব। অধীরদার সঙ্গেও মাঝে-মাঝে দেখা হয়। অধীরদা আমার এলাকাতেই থাকেন। কখনও বাসস্ট্যান্ডে, কখনও বাজারে দেখা হয়। মাঝে-মাঝে

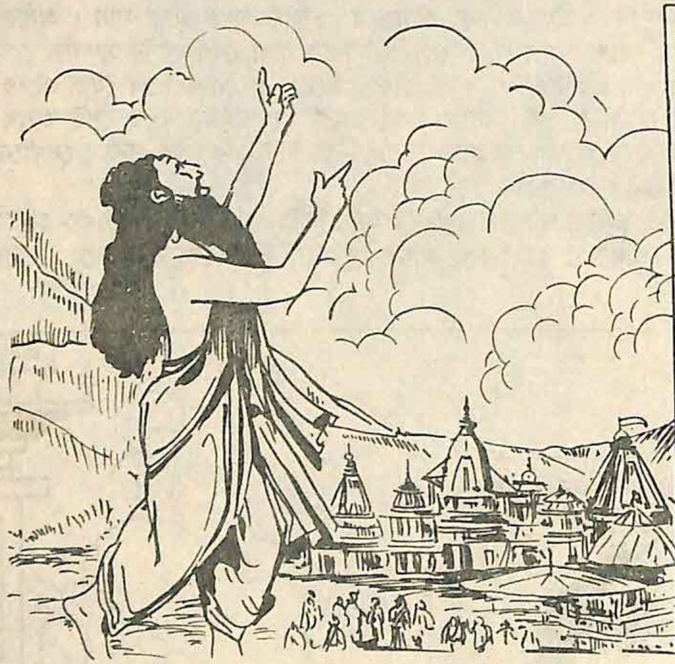
আমার বাড়ি আসেন। নতুন বই বেরোলে এক কপি চেয়ে নিয়ে যান। অধীরদার মধ্য দিয়ে আমি ছেলেবেলার মৃত বন্ধুর স্মৃতি বাঁচিয়ে রেখেছি।

কুম্ভে গিয়ে ঈশ্বরের কৃপায় খুব একটা অসুবিধে হল না। ট্রেনেই একদল বাঙালির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। এদের মধ্যে একজন 'মুসাফির' বলে আমায় চিনে ফেললেন। তারপর যা হয় আর কি! নানা প্রশ্ন। 'আচ্ছা, কেদার-বদরীতে সেই যে আশ্চর্য সাধু, যিনি নাকি খালি গায়ে সারা বছর ওই ঠাণ্ডার মধ্যে তপস্যা করছেন, তাঁর ব্যাপারটা কি সত্যি ?···· 'আচ্ছা, মানস সরোবরে খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আপনি যেভাবে গুরুতর আহত হয়েছিলেন, তাতে বেঁচে উঠলেন কী করে ?'··· 'কুম্ভের ওপর বইতে আমাদের কথা লিখবেন তো ?'

সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে হইহই করতে-করতে সারা পথ যাওয়া গেল। অধীরদা আর বউদিকে ওঁরাই নিয়ে গেলেন। এক ধর্মশালায় ওঁরা থাকবেন। যতজনের জন্য বলা ছিল, ততজন আসেননি। অঢেল জায়গা। আমায় বললেন, "আপনিও চলুন দাদা।"

আমি বললাম, "আমাকে বাদ দিন। সেবাশ্রমের সাধুরা দুঃখ পাবেন শেষ মুহূর্তে না গেলে।"

হরিদ্বারে নেমে অধীরদাকে বিদায় দিলাম। ওঁদের ঠিকানা নিয়ে নিলাম।



কুম্ভের প্রধান স্নানের তখনও তিনদিন বাকি। সারা শহর জনারণ্যে পরিণত হয়েছে। সারি-সারি তাঁবু পড়েছে। এক-একটি আখড়ার সাধুরা এক-একটা শিবির তৈরি করেছেন। তাঁদের পতাকা উড়ছে। প্রায়ই নানান ধরনের ধর্মীয় শোভাযাত্রা বেরোচ্ছে। আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি সাধু, বিচিত্র সাধু। সংগ্রহ করছি তাঁদের জীবন-কথা। কত হঠযোগী সাধুকে দেখলাম। মাটির নীচে ধ্যানস্থ হয়ে ছিলেন বেশ কিছুদিন। কেউ ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তপস্যা করছেন। একজনকে দেখলাম এক-পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনমাস।



সেদিন ভোরে হর-কি-পিয়ারি ঘাটের কাছে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি কয়েকজন গাঁট্টাগোট্টা সাধু ছড়ি ঘোরাতে-ঘোরাতে আসছেন আর বলছেন, "দূর হঠো, দূর হঠো!" সামনে যারা পড়ছে, তারা বেধড়ক ছড়ির বাড়ি খাচ্ছে। আমাকে ছড়ি দিয়ে মারতেই আমি ছড়ি আঁকড়ে ধরলাম। বললাম, "খবরদার।"

সঙ্গে-সঙ্গে গোটা-চারেক সাধু ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমার কাঁধের ঝোলা মাটিতে পড়ে গেল। এক ধাক্কায় আমি মাটিতে পড়ে গেলাম।

ছড়িদার-সাধুদের পিছন-পিছন ঘোড়ায় চেপে একজন সৌম্যদর্শন তরুণ সাধু আসছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে আমায় তুললেন। আমার ডায়রিটা পড়ে গিয়েছিল। তিনি সেটি তুলে দু-একটি পাতা উলটে আমার হাতে তুলে দিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "আপনি বাঙালি ?"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "আপনি কে ?"

সাধু বললেন, “আমার পরিচয় পরে দেব । আমি দুঃখিত, আমার লোকেরা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে । আপনি যদি কিছু মনে না করে আমার আখড়ায় আসেন, আমি বাধিত হব ।”

আমি বললাম, “কোথায় আপনার আখড়া ?”

সাধু বললেন, “কনখলে । ‘ছোটে-মহারাজের শিবির’ বললেই সবাই দেখিয়ে দেবে । আজ বিকেলে আপনার জন্য অপেক্ষা করব ।”

আমার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল । ওই সাধুকে কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে । অথচ মনে করতে পারছি না । কণ্ঠস্বরটা একদম চেনা । কিন্তু দাড়ি-গোঁফ ও জটার আড়ালে কে এই ছোটে-মহারাজ ? পরিষ্কার বাংলায় কথা বললেন ।

আমি তো সাধুদের নিয়েই লিখতে এসেছি । আমার তহবিলে একটি বিচিত্র সাধুর অভিজ্ঞতা জমা পড়ল । মনে-মনে খুশিই হলাম এজন্য ।

কনখলে ছোটে-মহারাজের আখড়া বলতে সবাই দেখিয়ে দিল । সারি-সারি তাঁবু । সামনে তলোয়ার নিয়ে পাহারা দিচ্ছে দুই ভীমদর্শন সাধু । পরিচয় দিতেই আমাকে ওঁরা ছোটে-মহারাজের কাছে নিয়ে গেলেন ।

মহারাজ খালি-গায়ে একটা খাটিয়ার ওপর বসেছিলেন । পরনে গেরুয়া কৌপীন, একমুখ দাঁড়ি । বয়স বড়জোর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে । কিন্তু কণ্ঠস্বরটা পরিচিত ।



আমায় সাধুজি বাংলায় বললেন, “আপনার নাম কী ?”

“সমীরণ রায় ।”

“কী করেন ?”

“লেখক । **মুসাফির** আমার ছদ্মনাম ।”

“বাড়ি কোথায় ?”

“গাইঘাটা । এখন কলকাতায় সি·আই·টি· বিল্ডিংসে থাকি ।”

“তোমাকে এক-নজরেই চিনেছিলাম, সমীরণ । তবু সন্দেহ ছিল । সেজন্য ডেকে পাঠিয়েছিলাম । তোমার দু-একটি বইও আমি পড়েছি। কেমন আছ সমীরণ ?”

আমি অবাক হয়ে বললাম, “আপনাকে তো ঠিক.....”

সাধু হেসে বললেন, “তোমার ছোটবেলার বন্ধু অমিতকে মনে পড়ে সমীরণ ? সেই গাইঘাটা স্কুলে আমাদের দিনগুলো । স্কুল পালিয়ে বনগাঁর মোতিমহল সিনেমায় ‘পথের পাঁচালি’ দেখতে যাওয়া । মাটিকোমড়ার জঙ্গলে পাখি শিকার । সেই লিপিকা পত্রিকা ?”



একটা বজ্রপাত হলেও আমি এততা চমকাতাম না। "এ কী বলছেন আপনি ? অমিত তো মারা গিয়েছে আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে।" সাধু হাসলেন। আশ্চর্য, এ তো অমিতেরই হাসি। এই কণ্ঠস্বর তো অমিতেরই। তা হলে কি এই সাধু অমিতের প্রেতাত্মা ?"

সাধু বললেন, "হ্যাঁ, আমি মারা গিয়েছিলাম এ কথা সত্য। কিন্তু আমার আবার পুনর্জন্ম হয়। আমি জন্মাই সাহারানপুরের এক চাষি-পরিবারে। কিন্তু জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব জীবনের সমস্ত কথা আমার মনে পড়তে থাকে। এমনকী, একদিন আমি নিজের মনে কথা বলতে গিয়ে দেখি আমি বাংলা কথাও বলতে পারছি।… ফোটো প্রিন্টিংয়ের সময় তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ যে, একসঙ্গে পুরো প্রিন্টটা হয় না। একটু-একটু করতে করতে কাগজের ওপর ইমেজটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যত বড় হতে থাকি, পূর্বজন্মের কথাগুলি একটু-একটু করে আমার ব্রেনের মধ্যে স্পষ্ট হতে থাকে। অবশেষে পনেরো বছর বয়স যখন, তখন একদিন আমার সব মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় আমার বৈমাত্রেয় দাদা অধীর কীভাবে নিরাময়ের নামে আমাকে খুন করেছে।"

"আপনাকে··· মানে অমিত খুন হয়েছিল ? বলছেন কী ?"

"তা নয় তো কী ? হাসপাতালে নিয়ে যাবার নাম করে আনলেও অধীরদা আমাকে হাসপাতালে ভরতি করেনি। বাড়িতেই রেখে দেয়। মা'কে বোঝায়, হাসপাতালে সিট পাওয়া যাচ্ছে না। পাড়ার এক হাতুড়ে ডাক্তারকে নিয়ে লোক-দেখানো চিকিৎসা করে। আমি খিদের জ্বালায় চেঁচাতাম। আমার পথ্য জুটত না। মা মাঝে মাঝে আসত আমায় দেখতে। কান্নাকাটি করে ফিরে যেত। মা তার গহনা বিক্রি করে অধীরদার কাছে টাকা তুলে দিয়েছিল চিকিৎসার জন্য। কিন্তু দাদা সব টাকা খেয়ে ফ্যালে।

এইভাবে আমার মৃত্যু হয়। দাদা চেয়েছিল, আমি মারা গেলেই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে সে। আমার মৃত্যুর পর আমার অসুখের বাবদ মোটা টাকা খরচা হয়েছে এই কথা বলে দাদা মা'র কাছ থেকে সম্পত্তির একটা অংশ নামমাত্র টাকায় লিখিয়ে নেয়। এরপর মা'কে বাকি অংশ লিখে দেবার জন্য ক্রমাগত প্রলোভন দেখাতে থাকে। অবশেষে রোগে-শোকে মায়েরও মৃত্যু হয়।

মায়ের মৃত্যুর পর আমি আবার জন্ম নিই সাহারানপুরে। যোলো বছর বয়সে আমি যখন প্রথম আমার পূর্বজন্মের ছবিটা চোখের সামনে দেখতে পেলাম, তখন প্রতিশোধ নেবার স্পৃহায় আমি কলকাতার ট্রেনে চেপে বসলাম। কিন্তু সেই ট্রেনে গঙ্গাসাগর যাচ্ছিলেন বড়ে-মহারাজ। ইনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। বছরের বেশির ভাগ সময় উত্তরকাশী থাকেন। আমার সঙ্গে পরিচয় হতে আমাকে তাঁর ভাল লেগে যায়। আমি সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে গঙ্গাসাগর যাই। সেখানেই আমার দীক্ষা হয়। তারপর থেকে প্রায় কুড়ি বছর ধরে আমি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করছি।

সম্প্রতি বড়ে-মহারাজ দেহ রেখেছেন। আমিই মঠের অধিপতি। কিন্তু এত বছর পরেও আমার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে। বিশেষ করে তোমার কথা, দুর্গার কথা, বিমানের কথা। দুর্গা কী করছে এখন ?"

আমি বললাম, "রেলে চাকরি করে।"

"আর অধীরদার সঙ্গে দেখা হয় ?"

আমি বলে বসলাম, "হয়। এই তো, অধীরদার সঙ্গে একসঙ্গেই তো কুম্ভে এসেছি।"

"অধীরদা এসেছে ?"

"হ্যাঁ। অধীরদা ও বউদি দু'জনেই।"

"আমি যখন মারা যাই, তখন অধীরদা বিয়ে করেনি। বউদিকে দেখিনি আমি। সমীরণ, অধীরদাকে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারো ?"

আমি বললাম, "নিয়ে আসব।"

কেন বলেছিলাম ? এখন আমার খুব অনুতাপ হয় সেজন্য।

পরদিনই অধীরদা ও বউদিকে বলেছিলাম, "এক বিচিত্র সাধুর সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিতে চাই।"

"বাঙালি ?"

"না, তবে ভাল বাংলা বলেন।"

"তুমি কী করে চিনলে ?"

"আমার কাজ তো সাধুদের সঙ্গে মেলামেশা।"

আমি সেদিনই অধীরদাকে নিয়ে ছোটে-মহারাজের আখড়ায় দিয়ে এলাম। আমার সেই সময় একটা জরুরি কাজ পড়ে গিয়েছিল। তাই থাকতে পারিনি। হয়তো কিছুক্ষণ থাকতাম। কিন্তু শুনলাম মহারাজ ধ্যানে বসেছেন। এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। অধীরদা ও বউদিকে বসিয়ে আমি চলে এসেছিলাম। খুব ভয়ে-ভয়ে কেটেছিল রাতটা। কাজটা কি ঠিক করেছি ? একেবারে বাঘের মুখে ছেড়ে দিয়েছি তাঁদের।



পরদিন ভোরবেলা অধীরদার কাছে যেতেই অধীরদা বললেন, "খুব ভাল লোক সাধুমহারাজ। মনে হল, কতদিনের চেনা। হাসিটা দেখে কী বলব ভাই সমীরণ, মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন অমিত।

বউদি বললেন, "আমি তো অমিত ঠাকুরপোকে দেখিনি, কিন্তু মনে হচ্ছিল খুব আপনার লোক। আমি তো দীক্ষা নেবার জন্য তৈরি। সাধু-মহারাজ বলেছেন চোদ্দ তারিখ ভোরে পূর্ণকুম্ভে স্নান করিয়ে দীক্ষা দেবেন। তুমিও চলো না ভাই। সাধু-মহারাজের সঙ্গে গেলে স্নানের কোনও অসুবিধে হবে না।"

আমার কোথায় যেন খটকা লাগছিল। মনে হচ্ছিল, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। ভয়ানক একটা কিছু। আমি বলেছিলাম, "অধীরদা, কাল রাতে আমি চলে আসব আপনাদের ওখানে। আর আমিও থাকব আপনাদের সঙ্গে। আর একটা কথা বলি অধীরদা, অনেক সাধুর সঙ্গে মিশে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, সব সাধুই কিন্তু সাধু নয়। তাদের মধ্যে অনেক ভণ্ড সাধুও আছে। তারা নানা ম্যাজিকের সাহায্যে, নানা মিথ্যে কথা বলে, ধাপ্পা দিয়ে আমাদের প্রতারিত করে। আপনি সত্যি করে বলুন তো অধীরদা, ছোটে-মহারাজের মধ্যে তেমন কি কিছু দেখেছেন, যাতে তাঁকে প্রতারক বলে মনে হতে পারে ?"

অধীরদা বললেন, "না তো। আমার তো খুব ভাল লাগল ওঁকে। ঠিক ছোট ভাইয়ের মতো।"

"এমন কি হতে পারে যে, ছোটে-মহারাজ আমাদেরই পরিচিতিদের মধ্যে কেউ, সাধু হয়ে বেরিয়ে গিয়েছে ?"

"না, সমীরণ। আমার জানাশোনার মধ্যে কেউ সাধু হয়নি। তুমি এ-কথা বলছ কেন ?"

"না, এমনি।" আমি বললাম।

পূর্ণকুম্ভের স্নানের দিন শেষরাতে আমরা বেরিয়েছি। আমাকে দেখে ছোটে-মহারাজ অবাক। বললেন, "তুমিও যাবে নাকি ?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

"তোমাকে বলে রাখি সমীরণ, তুমি এসো না।"

"কেন ?"

"বিপদ হতে পারে।"

"কিসের বিপদ ?"

"এত মানুষ। এত ভিড়। কুম্ভে দুর্ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।"
"না, আমি যাব। অধীরদা আমার সঙ্গে এসেছেন। তাঁদের নিরাপত্তাও আমার দেখা দরকার।"
ছোটে-মহারাজ হেসে উঠলেন।
আমি বললাম, "সত্যি কথা বলুন। কে আপনি ?"
ছোটে-মহারাজ আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন। সে-দৃষ্টি দেখে আমি শিউরে উঠলাম।
প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে পায়ে-পায়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। সরু ব্রিজের মুখে এসে শুনলাম রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। দাঁড়িয়ে আছি। সামনে ছোটে-মহারাজ। সঙ্গে প্রচুর শিষ্য। তার মধ্যে অধীরদা, বউদি ও আমি। পিছনে অসংখ্য মানুষ।
হঠাৎ শুনলাম রাস্তা খুলে দিয়েছে। এগোতে যাব, হঠাৎ দেখি ছোটে-মহারাজের তিন-চারজন শিষ্য অধীরদা আর বউদিকে দিল এক প্রচণ্ড ধাক্কা। সেই ধাক্কায় তারা পড়ে গেল মাটিতে। তারপর পিছন থেকে হুড়মুড় করে বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো একটা চাপ এল। সামনের আরও কিছু লোক মাটিতে পড়ে গেল। এক প্রচণ্ড ধাক্কায় আমিও ছিটকে পড়ছিলাম, কিন্তু কে একজন যেন বলিষ্ঠ হাতে আমায় ধরে ফেলল। ছোটে-মহারাজের গলার স্বর, "বলেছিলাম না, আর বেরিও না। আজ বড় ভয়ানক দিন।"
উন্মুক্ত জনতা প্রাণভয়ে পালাতে যাচ্ছে। ধাক্কা এড়াতে যাচ্ছে। কিন্তু আবার প্রচণ্ড ধাক্কায় মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। তাদের দেহের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে হাজার-হাজার মানুষ।
'গঙ্গা মাইকি জয়।'
সেই প্রবল বাহু আমাকে ডানা দিয়ে আড়াল করা পাখির শাবকের মতো নিরাপদ জায়গায় নিয়ে এল।
আমি বললাম, "অধীরদা কোথায় ? বউদি কোথায় ?"
ছোটে-মহারাজ বললেন, "কুম্ভে স্নান করতে এসে মৃত্যু হলে তাঁদের অক্ষয় স্বর্গবাস হয়।"
"তা হলে আমায় বাঁচালেন কেন ?"
উত্তর হল, "তুমি যে আমার বন্ধু সমীরণ। যাও, কাছেই ব্রহ্মকুণ্ড, তুমি স্নান করে এসো।"
ছোটে-মহারাজ ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।
সেদিন দুশো মানুষের মৃতদেহের ভিড়ে অধীরদা ও বউদির মৃতদেহ আমি সনাক্ত করেছিলাম। এক নিমেষের মধ্যে সমস্ত কিছু ঘটে গেল। এর জন্য তো আমি প্রস্তুত ছিলাম না।
পরদিন আমি ছুটে গিয়েছিলাম ছোটে-মহারাজের আখড়ায়। গিয়ে দেখি, শিবির নেই। শুনলাম, পুণ্যস্নান শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ছোটে-মহারাজ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে হিমালয়ের দিকে চলে গিয়েছেন।



কান-নাচিয়ে

দিব্যেন্দু পালিত

ছোটবেলায় যাদের সঙ্গে আমাদের ভাব-ভালোবাসা হয়েছিল, তাদের একজনের নাম ফেলু। আমাদের সহপাঠী। স্কুলের খাতায় একটা ভাল নাম থাকলেও সবাই ডাকত ফেলু বা ফ্যালারাম বলে। আরও কিছুদিন পরে সে হয়ে গেল কান-নাচিয়ে ফ্যালারাম।

ফেলুকে চেনা যেত তার মুখের বসন্তর দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে। যখনকার কথা বলছি, তখন কলেরা বসন্ত এই রোগগুলো হত খুব। এখনকার মত ইঞ্জেকশন টিকে এত সব বেরয়নি, কিংবা বেরলেও পাওয়া যেত না তত। শীতের শেষে হাওয়ায় ফুরফুরে ভাব জাগলেই আমরা ধরে নিতুম এখন বসন্ত হবার পালা। ভাবনাটা ফলে যেত। স্কুলে প্রায়ই অ্যাবসেন্ট হত কেউ-কেউ। তবে, ফিরে আসত প্রায় সকলেই।



ফেলুর কবে বসন্ত হয়েছিল তা অবশ্য আমরা জানি না। নিশ্চয়ই খুব ছোটবেলায়। স্কুলে যেদিন ও প্রথম এল সেদিনই চোখে পড়ল মুখের দাগগুলো। কোমর থেকে গলা পর্যন্ত ডাকাবুকো চেহারা, তুলনায় পা দুটো বড়ই রোগা আর সরু। ছোট, গোল মুখ ; তাতে বসানো লম্বা ও কোনাকুনি তেড়েওঠা কান দুটো দেখলে কিসের কথা মনে পড়ত তা আর নাই বা বললুম ! বসন্তের ঘা শুকিয়ে নাকটা হয়ে গিয়েছিল বোঁচা। সব মিলিয়ে বয়সের তুলনায় দেখাত অনেক বড়। কথা বলত অল্প নাকী সুরে, চন্দ্রবিন্দু মিশিয়ে। যেমন ধরো তুমি জিজ্ঞেস করলে ফেলুকে, "কীরে, কেমন আছিস ?" ফেলু জবাব দিল, "তোঁর তাঁতে কী দরকার।"

কথার ধরনে কি তোমাদের মনে পড়ছে ঠাকুমার ঝুলি'র রাক্ষস-খোক্কসদের কথা ? না, না তেমন নয়। তবে যদি ভাবো, 'কী কথার কী উত্তর ! আচ্ছা গোঁয়ার তো ছেলেটা', তবে ভুল করবে না। ফেলু ছিল ওই রকমই। বছর বারো-তেরো বয়স হলে হবে কী, বড্ড গোঁয়ার আর বিদ্‌ঘুটে বদরাগী, রেগে যেত হুটহাট। সত্যিই যেন কেমন-কেমন !

এই কেমন-কেমন ব্যাপারটা ধরা পড়ল ও ক্লাস সেভেনে ভর্তি হবার দিন কয়েকের মধ্যে।

ফেলু তখন নতুন এলেও ওর মামাতো ভাই বিশু আগে থেকেই পড়ত আমাদের সঙ্গে। আহ্লাদে গড়া, চুপচাপ, নিরীহ ছেলেটি—চেহারায় ডিঙডিঙে, ফেলুর একেবারে উল্টো। একটু ছুকছুকে আর চুকলি-কাটা বাই ছিল, এই যা। কাণ্ডটা ঘটল বিশুকে নিয়েই।

প্রত্যেক বছরই সরস্বতী পুজোর দিনে থিয়েটার হত আমাদের স্কুলে। সেবার হঠাৎ ঝড়বৃষ্টির জন্যে শুধু পুজোই যে মাটি হল তা নয়, থিয়েটারও গেল পিছিয়ে। ঠিক হল মাসখানেক বাদে আবার হবে। যেদিন থিয়েটার তার আগের দিন দুপুরে রিহার্সালের সময় খাবার জন্যে পান্তুয়া আনা হয়েছিল এক হাঁড়ি—সেটা রাখা হয়েছিল লাইব্রেরী-ঘরে লুকিয়ে। হঠাৎ কে যেন আবিষ্কার করল লুকিয়ে-লুকিয়ে সেই পান্তুয়া সাবাড় করছে বিশু। ধরা পড়ার সময়েও ওর মুখের মধ্যে অন্তত খান আষ্টেক খোয়াভরা নধর পান্তুয়া—গলবার তল পাচ্ছে না, জেলির মত রস গড়াচ্ছে কশ বেয়ে ; চোখ দুটোরও অবস্থা এই যায় কি সেই যায় ! আমরা তো অবাক। ওই অবস্থাতেই গাঁট্টাগোট্টা চেহারার শ্যামাদাস লাইব্রেরি-ঘর থেকে টেনে এনে বেদম পিটতে লাগল বিশুকে। চড়-চাপড়ের চোটে মুখভর্তি পান্তুয়া উগ্‌রে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল বিশু।

কান্না শুনে ছুটে এলেন আমাদের নতুন ভূগোলের স্যার গোপালদা। কলকাতা থেকে আসা, ভারী নরম মনের মানুষ। শ্যামাদাসকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "ছেলেমানুষ লোভে পড়ে খেয়ে ফেলেছে ! মেরো না। আমি টাকা দিচ্ছি, বাবুয়ার দোকান থেকে আনিয়ে নাও আরও।"

আমাদের স্কুলের মাঠটি ছিল বড়। ছাড়া পেয়ে উর্দ্ধশ্বাসে মাঠের মধ্যে দিয়ে অনেকটা ছুটে গেল বিশু। যখন বুঝল কেউ আর তার নাগাল পাবে না তখন থেমে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকিয়ে ছড়া কাটল—

"শ্যামাদাস
খায় ঘাস
করে চুরি
বারো মাস।"



চোখে তখনো লেগে আছে কান্নার জল। জামা তুলে মুছতে মুছতে বলল, "এই ব্যাটা পান্তুয়া-চোর শ্যামাদাস, তোর মাথায় হাঁড়ি ভাঙব।"

শ্যামাদাস আবার ছুটে যেতেই পিছন ঘুরে ছুটে স্কুলের ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়ে অদৃশ্য হল বিশু। গোপালদা বললেন "থাক, থাক। কালই ভাব হয়ে যাবে আবার। এ-নিয়ে আর মাথা গরম করো না।"

ব্যাপারটা আমরা ভুলেই গেলুম প্রায়। মাঠে যেখানে স্টেজ বাঁধছে মজুররা, সেখানে গিয়ে জটলা করতে লাগলুম।

হঠাৎ দেখি পাঁচিল ডিঙিয়ে খ্যাপা মোষের মতো ছুটে আসছে ফেলু আর চিৎকার করছে, "কার সাধ্যি আমার ভাইয়ের গায়ে হাত তোলে ! চলে আয়—চলে আয়—"

কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাণ্ডটা ঘটে গেল। প্রকাণ্ড এক লাফ মেরে শ্যামাদাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ফেলু আর চ্যাঁচাতে লাগল, "আমি ফ্যালারাম। তোর টুটি ছিঁড়ে রক্ত চুষে খাবো—।"

ফেলুর শরীরের চাপে মাটিতে পড়ে অমন গাট্টাগোট্টা চেহারার শ্যামাদাসেরও ছেড়ে-দে-মা গোছের অবস্থা ! আলগা পা দুটো শূন্যের দিকে ছুঁড়ছে মাঝে-মাঝে, আর মাঝে-মাঝে দমবন্ধ গলায় কী যেন বলবার চেষ্টা

করছে।

সেদিন গোপালদা-স্যার না-ছাড়ালে ফেলু হয়ত সত্যি সত্যিই মেরে ফেলত শ্যামাদাসকে। আর ছাড়ালেই কি সত্যিই ছাড়ে নাকি! তার বায়নাক্কা কত! থেকে-থেকেই হাত-পা নাড়ে, আর জিজ্ঞেস করে, "শ্যামাদাস কোথায়?"

আজ বাদে কাল থিয়েটার। সব পণ্ড হয়ে যাবার ভয়ে ঘুষ দেওয়া শুরু হল তাকে। তাতেই যেন আরও পেয়ে বসল ফেলু। গণ্ডা চারেক পান্তুয়া সাঁটিয়ে আর-কিছু না পেয়ে বলল, "আমাকেও থিয়েটার করতে দিতে হবে—"

এতক্ষণ চুপচাপ থাকলেও এবার মনে হল গোপালদাও রেগেছেন একটু। চোখ পাকিয়ে বললেন, "ফ্যালা ঝামেলা করিস না বেশী। কাল থিয়েটার, এখন কি না বাবু পোঁ ধরলেন—"

ফেলু বোধহয় ধমকটা আঁচ করতে পারেনি। থতমত খেয়ে বলল, "তাহলে আমি কী করব!"

"কিচ্ছু করতে হবে না। বসে থাকবি চুপচাপ।"

বিশু কখন ফিরে এসে আমাদের পিছনে দাঁড়িয়েছে, লক্ষ্য করিনি। ফ্যালারামের কীর্তিকলাপ দেখে বোধহয় সাহস পেয়েছিল মনে। হঠাৎ টিপ্পনী কেটে বলল, "ফ্যালাদা ভাল কান নাচাতে পারে, স্যার—"

কান নাচানো ব্যাপারটা যে কী, আমরা কেউই জানতুম না তখনও। অবাক হয়ে সবাই তাকাচ্ছিল এর ওর মুখের দিকে। গোপালদা বললেন, "তোর সবই যেন অদ্ভুত, ফ্যালা! দেখা দেখি তোর কান নাচানো। ভাল হলে লাগিয়ে দেব—"

কথা শুনে ধন্যি-হয়ে-যাওয়া-ভঙ্গিতে এক গাল হাসল ফেলু। বলল, "বিশে নম্বর ডাকবি—"

তার পরেই ঘটল একটা অদ্ভুত মজার ব্যাপার। গোপালদার নির্দেশে আধা চাঁদের ভঙ্গিতে সার বেঁধে দাঁড়ালুম আমরা। মাথার ওপর ঠা-ঠা রোদ্দুর। সামনে দুটো সরু রোগা ঠ্যাঙের ওপর বড়সড় চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফেলু। এতটুকু নড়নচড়ন নেই; এমন কী, লম্বা ও মাথার দিকে কোনাকুনি-ছুঁচলো-হয়ে-যাওয়া কান দুটোও স্থির। তারপর বিশু এক দুই-তিন গোনার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুর কান দুটো শিবমন্দিরের পতাকার মতো নাচতে লাগল পত্ পত্ করে। নাচছে তো নাচছেই! মিনিট খানেক নাচিয়ে সে যখন-থামল, আমাদের মুখে আর কথা ফোটে না। বোকা বোকা মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফেলু। বিশুর মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে কৃতিত্বটা তারই।

বেশ কিছুক্ষণ পরে গোপালদা বললেন, "তুই একটা জিনিয়াস ফ্যালা! আর কী কী পারিস বল তো?"

ওজন বুঝে ফেলু বলল, "বর্ষার রাতে শিয়াল-কুকুরের ডাক ডাকতে পারি—"

"ডাক, ডাক দেখি।"

তখন লম্বা হাতের তালু দুটো মুখের কাছে চোঙার মত ধরে ধরে অদ্ভুত গলায় ডেকে উঠল ফেলু। ডাক শুনে কে বলবে সেটা দুপুর, চারদিকে ঠা-ঠা করছে রোদ্দুর। বরং মনে হবে জানলা-দরজা-বন্ধ-করা অন্ধকার বৃষ্টির রাত থমথম করছে চারদিকে; আর, দূরে দূরে পালা করে ডেকে উঠছে ভয়-পাওয়া শিয়াল আর কুকুর।



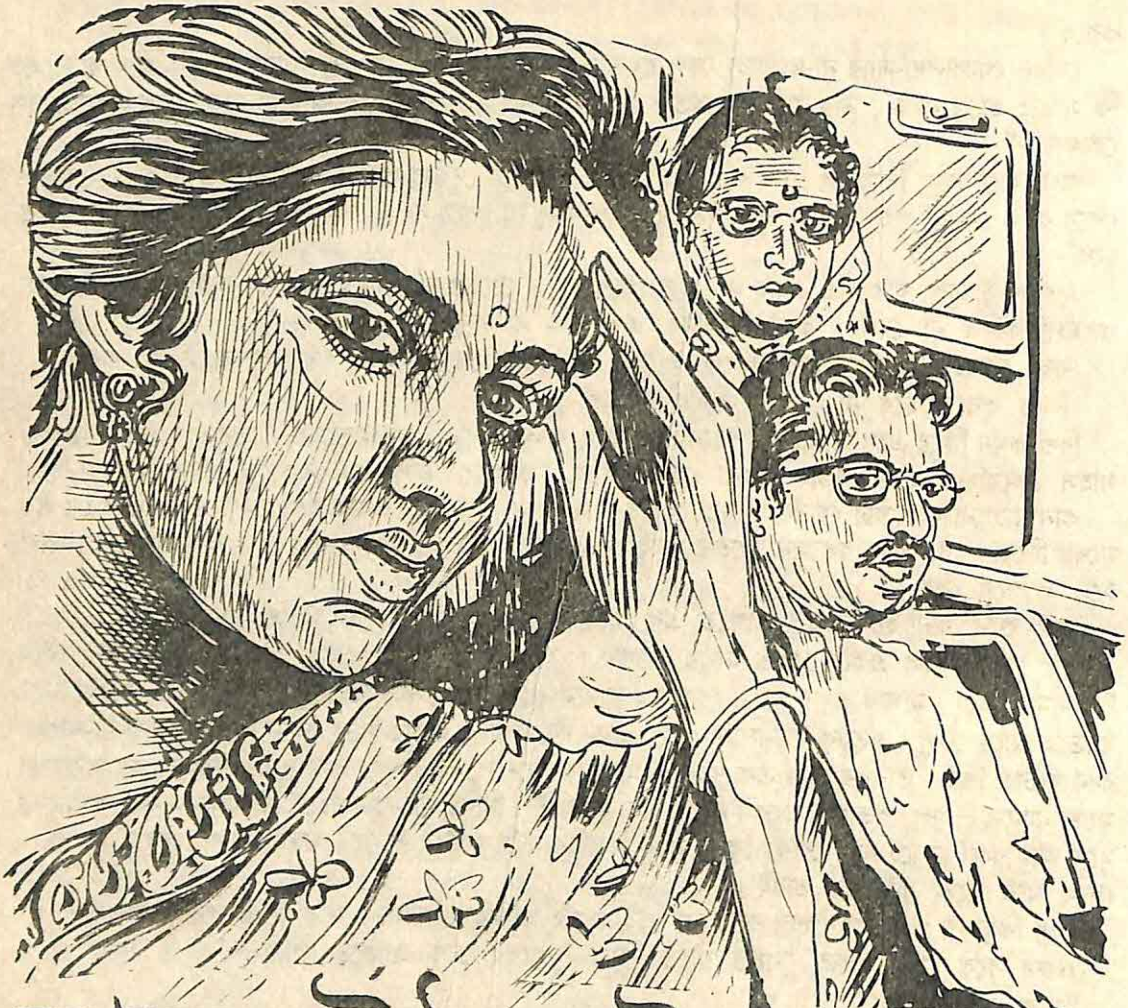
সেটা থামতে না থামতেই ফেলু বলল, "স্যার, ট্যাঁ-ট্যাঁ করব?"

"থাক, থাক হয়েছে"—গোপালদা বললেন, "এখন বাড়ি গিয়ে প্র্যাকটিস করগে যা। কাল তোকে স্টেজে নামাব।"

এক শ্যামাদাস ছাড়া আমরা সকলেই ফেলুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলুম।

পরের দিন সন্ধ্যায় টানা পাঁচ মিনিট কান নাচিয়ে, আরও মিনিট পাঁচেক জন্তু-জানোয়ারের ডাক ডেকে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল ফেলু। হাততালি পড়ল প্রচুর। ভাগনের পৈতের জন্যে স্কুলের সেক্রেটারি ভূপতি হাজরাকে থিয়েটারের আগেই চলে যেতে হ'ল। কিন্তু যাবার আগে ফেলুর জন্যে একটা মেডেল ঘোষণা করে গেলেন তিনি।

সেই থেকে গোঁয়ার ফেলু শহরের প্রায় সকলেরই চেনা হয়ে গেল। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে লোকে ডেকে বলত, "এই যে ফেলু, এসো—একটু কান নাচিয়ে যাও দেখি—" এক গাল হেসে ফেলুও দাঁড়িয়ে পড়ত তখুনি।



বাসে উঠলেই অচেনা

শেখর বসু



মিনিবাসে ওঠার মুখে নন্দনকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিলেন ওর মা। আচমকা কনুইয়ের ধাক্কা খাওয়ার জন্যে নন্দন সামান্য চটে গিয়েছিল, কিন্তু এখন মা'র ওপর রাগ দেখাবার কোনও উপায় নেই। বাসে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই মা এক্কেবারে অচেনা মানুষ হয়ে যান। সত্যি, এর কোনও মানে হয়!

কিন্তু মানে হোক আর নাই হোক, নন্দনকে এটা মেনে নিতে হয়। কদ্দিন তর্কাতর্কি করেছে, কাজ হয়নি। কদ্দিন রাগারাগি করেছে, কাজ হয়নি। বেচারা তাই এখন মনের কষ্ট মনেই চেপে রাখে।

মা বসেছেন ওদিকের সিটে, নন্দন এদিকে। মা'র পাশে বসার জায়গা আছে, কিন্তু নন্দনের ওখানে বসার হুকুম নেই। বসতে হবে অন্য কোথাও। অন্য কোথায় বসলেই শুধু হবে না, বাসের মধ্যে মা'র সঙ্গে একটা কথাও বলা চলবে না। অচেনা ছেলের মতো থাকতে হবে। তবে বাস থেকে নামার সময় খেয়াল করে নেমে আসতে হবে মা'র পেছন-পেছন।

মা সেদিন মাসিমণিকে বলেছিলেন, "আজকাল বাসের কনডাকটররা যা পাজি হয়েছে না! নন্দনকে নিয়ে বাসে উঠলেই ওর টিকিটের জন্যে জ্বালিয়ে মারে। ওইটুকু ছেলে, ওর আবার টিকিট কী? কিন্তু যুক্তির ধার ধারে ওরা। বাধ্য হয়ে তাই এখন একটা বুদ্ধি খাটাচ্ছি।"

বুদ্ধিটা কী জানতে চেয়েছিলেন মাসিমণি।

মা তখন খেলা জিতে যাওয়ার মতো চোখমুখ করে বলেছিলেন, "নন্দনকে বলে রেখেছি, বাসে উঠে তুই আমার সঙ্গে একটাও কথা বলবি না, পাশেও বসবি না। কনডাকটর টিকিট চাইলে একটা টিকিট কাটি। ওরা ভাবে আমি একা। ব্যস।"

মা'র কথা শুনে মাসিমণির সে কী হাসি। হাসতে-হাসতে চোখে জল এসে গিয়েছিল। তারপর কোনমতে চোখের জল মুছে নিয়ে বলেছিলেন, "এ মা, তুই বাসে টিকিট ফাঁকি দিস!"

তাই শুনে চটে গিয়ে মা বলেছিলেন, "কক্ষনো না। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেব না বলেই তো এ-রকম করি। নন্দন একটু বড় হোক না, দেখবি ডেকে-ডেকে টিকিট দিয়ে আসব।"

উত্তর শুনে মাসিমণি আর-এক দফা হেসেছিলেন, তারপর নন্দনের থুতনি নেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, "ছি-ছি, তুমি এখনও বাসে টিকিট কাটার মত বড় হওনি! রনি কিন্তু জেন্টলম্যান হয়ে গেছে, লেডিজ'সিটে জায়গা থাকলেও বসে না।"

রনি নন্দনের চাইতে মাত্র পাঁচ মাসের বড়, অথচ ও কত বড় হয়ে গেছে এর মধ্যেই। মাসিমণির কথা শুনে চোখে জল এসে গিয়েছিল নন্দনের।

সেই মাসিমণির বাড়িতেই আজ ভাইফোঁটার নেমন্তন্ন ছিল। ওকে ফোঁটা দিয়েছে মুন্নি, আর মা'রা ফোঁটা দিয়েছেন দুই মামাকে। মামারা চলে গেছেন টালিগঞ্জে। এখন ওরা ফিরছে ওদের কলেজ স্ট্রিটের বাড়িতে।

কিন্তু বাসটা ছাড়বে কখন?

নন্দন জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কনডাকটর গল্প করছে একজনের সঙ্গে। ওই লোকটিই বোধহয় ড্রাইভার। তার মানে বাস ছাড়তে দেরি আছে এখনও। মিনিবাসের ভেতর দিকে একবার চোখ ঘুরিয়েই কারণটা ধরতে পারল নন্দন। সামান্য কয়েকজন বসে আছে, যাত্রী আরও না বাড়লে বাস ছাড়বে না কিছুতেই।

থেমে-থাকা বাসে এইভাবে চুপচাপ বসে থাকতে একটুও ভাল লাগে না নন্দনের। কিন্তু কী-ই বা আর করার আছে? মা'র সঙ্গে তো গল্পও করা যাবে না এখন। মা ওদিকের সীটে এক্কেবারে অচেনা মানুষের মতো বসে আছেন। পাশে প্লাস্টিকের নীল ব্যাগ। ব্যাগের ওপরদিকে একটা শাড়ি আর মিষ্টির প্যাকেট। শাড়িটা মা'কে দিয়েছেন বড়মামা। মিষ্টি দিয়েছেন মাসিমণি। মিষ্টির প্যাকেটের নীচেই হলুদ প্যাকেটে ওর টি-শার্ট। শার্টটা দিয়েছে মুন্নি। আহ্, কী সুন্দর দেখতে! শার্টের কথা মনে পড়তেই নন্দন ওর বুকপকেটটা একটুখানি ফাঁক করল। পকেটের মধ্যে দুটো ঝকঝকে দশ টাকার নোট। নোট দুটো বার করে ওর দেখার ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। কিন্তু মা'র ভয়ে বার করার সাহস পেল না। অবশ্য বার করলেও মা এখন কিছুই বলতে পারবেন না। বাসের মধ্যে তো কথা বলা বারণ। তবে ঠিক ভরসা পেল না নন্দন।

ভাইফোঁটায় নন্দনেরই লাভ হয়েছে সব চাইতে বেশি। দুটো দশ টাকার নোট, একটা টি-শার্ট আর দুটো ক্যাড্‌বেরি চকোলেট। চকোলেট দুটো মা'র হাতব্যাগে। হাতব্যাগে না থেকে যদি ওর পকেটে থাকত, এক্ষুনি ও খেয়ে ফেলত। হাতে চকোলেট থাকলে চুপচাপ বাসে বসে থাকাটা একটুও কষ্টের নয়।

মিনিবাসে এর মধ্যে আরও অনেকে উঠে পড়েছে। এইমাত্র ওর পাশে বসল ঠিক ছোটকাকুর মতো দেখতে একজন। বসেই একটু দূরের কনডাকটরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী দাদা, কখন ছাড়বেন বাস?"

কনডাকটর মুখ ঘুরিয়ে "ছাড়ছি" বলে আবার আগের মতোই গল্পে জমে গেল।

ছোটকাকুর মতো দেখতে মানুষটার স্বভাবও বোধহয় ছোটকাকুর মতো, কথা না বলে থাকতে পারেন না। নন্দনকে বললেন, "পরশুর খেলাটা এখনও চোখে ভাসছে, খেলা দেখছ তুমি?"

কে না দেখছে খেলা ! নন্দন তো আবার ক্রিকেটের দারুণ ভক্ত । ও লম্বা করে একপাশে মাথা কাত করে জবাব দিল, "অনেক দিন পরে আজাহার কিন্তু দারুণ খেলেছে।"

"আচ্ছা, আমাদের রান অ্যাভারেজ কত হল এখন ?"

"ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ওয়ান।"

ব্যস, অচেনা এই কাকুর সঙ্গে ক্রিকেটের গল্পে জমে গেল নন্দন। ওর মা মাঝেমধ্যে অবাক হয়ে তাকাচ্ছিলেন এদিকে।

বাসে আরও কয়েকজন লোক উঠে পড়েছে, টিকিট কাটতে শুরু করে দিয়েছে কনডাকটর ; কিন্তু ড্রাইভারের সিট এখনও ফাঁকা। টিকিট কাটা শেষ হলে বোধহয় বাস ছাড়বে।

কনডাকটর মা'দের দিকের টিকিট কাটা শেষ করে এপাশে আসতেই নতুন কাকু নন্দনকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথায় যাবে ?"

"কলেজ স্ট্রীট।"

উত্তর শুনেই নতুন কাকু কনডাকটরের দিকে টাকা বাড়িয়ে বললেন, "একটা হেদো, আর একটা কলেজ স্ট্রীট।"

নন্দন চোরা-চোখে দেখল মা এদিকে তাকিয়ে আছেন অবাক হয়ে।

একটা টিকিট নন্দনের হাতে দিয়ে নতুন কাকু বললেন, "আমাদের ব্যাটিং-লাইন এখন কিন্তু দুর্দান্ত। সিধু পর্যন্ত আসার পর থেকে দারুণ খেলছে।"

নন্দন হাতের টিকিটটা নাড়াচাড়া করতে করতে মিনমিন করে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আমার টিকিট কাটলেন ?"

"হ্যাঁ", বলেই নতুন কাকু প্রশ্ন তুললেন, "আচ্ছা, ওয়ান-ডে ইন্টারন্যাশানালে এই বোধহয় আমাদের প্রথম চারটে হাফ-সেঞ্চুরি ?"

"হ্যাঁ।"

কনডাকটর টিকিট কাটতে কাটতে বাসের পেছনের দিকে চলে গেছে। এখন ওর জায়গায় একজন হকার। প্লাস্টিকের প্যাকেটভর্তি বাদামভাজা ঠিক তাসের মতো হাতে সাজিয়ে হকার চেঁচাতে লাগল, "সল্টেড বাদাম-এ-এ-এ সল্টিস্। সল্টেড বাদাম—এ-এ-এ সল্টিস্।"

নন্দন হঠাৎ পকেট থেকে দশ টাকার নোট বার করে বলল, "আমাকে দুটো দিন তো।"

মা'র দিকে না তাকিয়েও নন্দন পরিষ্কার বুঝতে পারছিল মা ওর দিকে কটমট করে চেয়ে আছেন। তবে যতই রাগুন না কেন, বকাবকি করতে পারবেন না। মা তো এখন অচেনা। একটা লাগসই উত্তরও নন্দন সাজিয়ে রাখল মনে-মনে। এই নিয়ে ধমকালেই বলবে, "তুমিই তো বলেছ, কারও কাছ থেকে কিছু নিলে কিছু দিতে হয়। ভদ্রলোক আমার টিকিট কেটেছেন, আমি তাই ওঁকে বাদাম খাইয়েছি।"

ভদ্রলোক কিন্তু বাদাম নিতে চাইলেন না। বললেন, "এইমাত্র নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছি, এখন বাদাম খাব কী করে ?"

কিন্তু নাছোড় নন্দনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া শক্ত। উনিই তখন হাসতে হাসতে বললেন, "ঠিক আছে, একটা প্যাকেট খোলো, আমি তোমার থেকে দু-একটা নেব।"

আরও কিছু লোকজন ওঠার পর মিনিবাস ছাড়ল। বাসের ইঞ্জিন থেকে শব্দ উঠছিল বিকট। ওই শব্দ ছাপিয়ে গল্প করতে গেলে রীতিমত চেঁচাতে হয়। নন্দনদের গল্প তাই থেমে এসেছিল প্রায়।

দু-তিনটে স্টপ যেতে না যেতেই বাসের সব সিট ভর্তি হয়ে গেল। এদিক-সেদিক কিছু-কিছু যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে। মা'কে আড়াল করে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল বলে নন্দন বেশ তারিয়ে-তারিয়ে সল্টেড বাদাম খাচ্ছিল। চোখাচোখি হওয়ার কোনও ভয় নেই। বাদাম খেতে-খেতে নন্দন ভাবছিল, একটাও কথা না বলে শুধু চোখ দিয়ে একজন আর-একজনকে কী করে এত ধমকায় !

রাস্তায় লোকজন বিশেষ ছিল না, মিনিবাস ছুটে চলেছে শাঁ-শাঁ করে। লোকজন উঠছে, নামছে। জানলা দিয়ে হালকা শীতের বাতাস আসছে মাঝেমধ্যে। সল্টেড বাদামের প্যাকেটটা খালি হয়ে এসেছে প্রায়, এমন সময় নন্দন চমকে উঠে দেখল— ।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ও, কিন্তু ঘটনাটা সত্যি। মা'র সামনে দাঁড়ানো আধময়লা

পাজামা-পরা লোকটা প্লাস্টিকের নীল ব্যাগ থেকে মা'র শাড়িটা বার করে নিচ্ছে আস্তে-আস্তে। নন্দন বুঝে উঠতে পারল না ওর কী করা উচিত এই মুহূর্তে, কিন্তু লোকটা ব্যাগ থেকে শাড়িটা বার করে নিতেই ও "চোর, চোর" বলে চেঁচিয়ে উঠল।

কে চোর, কোথায় চোর—আর পাঁচজন এ-সব বোঝার আগেই সত্যিকারের চোর শাড়িটা ফেলে দিয়ে ঠেলেঠুলে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর মিনিবাস থেকে লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়।

চোর পালালে শুধু বুদ্ধিই বাড়ে না, চোরকে মারার শখও বেড়ে যায় অনেকের। অনেকেই হায়-হায় করে উঠে বলল, "ইশ্! হাতের কাছে পেয়েও চোরটাকে পেটানো গেল না!" একজন নন্দনকে বললে, "খোকা না চেঁচিয়ে আমাদের কাউকে দেখিয়ে দিত যদি।"

নন্দনের কৃতিত্বে সবচাইতে খুশি বোধহয় ওর নতুন কাকু। ভদ্রলোক নীচে থেকে শাড়িটা তুলে মা'র দিকে এগিয়ে দিতে-দিতে বললে, "এই ছেলেটার জন্যেই কিন্তু আপনার শাড়িটা বেঁচে গেল। নিন, একে এবার মিষ্টি খাইয়ে দিন।"

নীল প্লাস্টিকের ব্যাগে রাখা মিষ্টির প্যাকেটটা দেখেই বোধহয় ভদ্রলোক নন্দনকে মিষ্টি খাওয়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কথাটা শুনে আরও কয়েকজন হইহই করে উঠলেন একসঙ্গে হ্যাঁ দিদি, ওর জন্যেই আপনার নতুন শাড়িটা বেঁচে গেছে, মিষ্টি খাওয়ান ওকে।

মা'র হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে খুব মজা পাচ্ছিল নন্দন। চোরটোরে মা'র খুব ভয়। সেই চোর এইমাত্র চোখের সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেছে। তবে ভাগ্যি ভাল, শাড়িটা নিতে পারেনি।

কয়েকজন আবার আগের ওই কথাটাই বলল, "কই দিদি, মিষ্টি খাওয়ান ওকে।"

মার দিকে তাকিয়ে নন্দনের এবার ভীষণ হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু কিছুতেই হাসলে চলবে না। হাসলেই ফাঁস হয়ে যেতে পারে, মা'র সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক! অন্যদিকে তাকিয়ে প্রাণপণে হাসি চাপার চেষ্টা করে যেতে লাগলো নন্দন।

পাশের নতুন কাকুটি এবার মুচকি হেসে নন্দনের মা'কে বললেন, "ঠিক আছে, আপনার হয়ে আমিই ওকে একটা প্রাইজ দিয়ে দিচ্ছি।" এই না বলে উনি পকেটে হাত ঢোকাতেই মা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, "না, আপনি ওকে কিছু দেবেন না, আমি দিচ্ছি।"

মা হাতব্যাগ খুলে চকোলেট দুটো এগিয়ে দিলেন নন্দনের দিকে। তাই দেখে হাততালি দিয়ে বলে উঠল একজন, "বাহ্! এ তো দারুণ প্রাইজ। নিয়ে নাও খোকা।"

নন্দন অচেনা ছেলের মতো মা'র হাত থেকে চকোলেট দুটো নিয়েই মুখ ফেরাল অন্যদিকে।

উত্তেজনার মধ্যে থাকলে বোধহয় সময় কেটে যায় তাড়াতাড়ি। নন্দন হঠাৎ বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল কলেজ স্ট্রীট এসে গেছে। মা উঠে দাঁড়িয়েছেন।

মা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই নন্দনও উঠে পড়েছিল। মিনিবাসে লোকজন কমে গেছে বেশ, দুই-একজন মোটে দাঁড়িয়ে আছে। নন্দন হঠাৎ পাশের কাকুর হাতে একটা চকোলেট ধরিয়ে দিয়ে ছুট লাগাল। কাকু "এ কী, এ কী" করে উঠলেন, কিন্তু আর কিছু বলার আগেই বাস থেকে নেমে পড়েছিল নন্দনরা। ওরা নামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাস ছেড়ে দিল আবার।



অন্যান্য দিন বাস থেকে নামার পরে অচেনা মা আগের মতোই চেনা হয়ে যান। কিন্তু আজ আর তা হল না। ঠিক অচেনা মানুষের মতোই মা হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন বাড়ির দিকে। পেছন-পেছন নন্দন। বাড়ি ফিরেও মা ওর সঙ্গে কোনও কথা বলেননি।

কিন্তু পরদিন অনেকের কাছ থেকেই জেনে গেল, মা ওর ওপর বেজায় খুশি। সকলের কাছেই ওর বুদ্ধি আর সাহসের খুব তারিফ করেছেন। তার পরদিন ওর স্কুলের জামা-প্যান্ট কিনে দেওয়ার জন্য মা ওকে নিয়ে একটা স্পেশাল বাসে উঠলেন।

আগের অভ্যেসমতো নন্দন বাসে উঠেই অন্য সিটে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু মা ওকে ধরে নিয়ে নিজের পাশে বসালেন। তারপর কনডাকটারের দিকে একটা পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বললেন, "দুটো এসপ্লানেড।"

একটার বদলে দুটো টিকিট কাটতে দেখে নন্দন খুব খুশি। তার মানে মা'র হিসেবেও ও এখন বড়। মা ওর দিকে তাকিয়ে নেই, কিন্তু মা'র মুখে ছোট্ট একটা হাসি দেখতে পাচ্ছিল নন্দন। হাসলে মা'কে ভীষণ

ভাল লাগে। মা'র দিকে আর-একটুখানি সরে এসে নন্দন বলল, "মা, সল্টেড বাদাম খাবে, সেদিন কিনেছিলাম।"

মা'কে কিছু খেতে দিলে মা সব সময় বলে থাকেন, "পরে।" কিন্তু আজ নন্দনকে অবাক করে দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, দে, একটুখানি।"

প্লাস্টিকের প্যাকেট ছিড়ে মা'র হাতে কয়েকটা বাদাম দিল নন্দন। মা এদিক-ওদিক তাকিয়ে টুক করে দু-তিনটে দানা ফেলে দিলেন মুখে। স্পেশাল বাস বেশ জোরে ছুটে চলেছিল, চারদিকে কত রকমের আওয়াজ ; কিন্তু মা'র তৃপ্তি করে বাদাম খাওয়ার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল নন্দন।

ভুবন সর্দার



ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

যখনকার কথা বলছি তখন বর্ধমান জেলায় ধাড়ান, পলাসন, পিপুলদা, সুবলদা, সাহসেনপুর প্রভৃতি গ্রামগুলো ডাকাত প্রধান গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত ছিল। এখানকার বাগদী ডাকাতরা ছিল প্রবল পরাক্রান্ত। যেমন ভয়ঙ্কর ছিল এদের চেহারা, তেমনি অমানুষিক শক্তি ছিল এদের দেহে। দামোদর নদের অববাহিকায় এইসব ডাকাতদের ভয়ে তখন আশ-পাশের গ্রামের লোকেরা তটস্থ হয়ে থাকত সব সময়; দলবদ্ধ না হয়ে রাতভিত কেউ গ্রাম গ্রামান্তরে যেত না। দিন দুপুরে পথে ঘাটে ঠ্যাঙাড়ের উপদ্রব আর রাতে ডাকাতের ভয়। এরই মধ্য দিয়ে জেলার মানুষরা দিনাতিপাত করত।

তা এই অঞ্চলের ডাকাতরা ছিল বড়ই দুর্ধর্ষ। আর ডাকাতিও করত এরা বড় বড় জায়গায়। বড় বড় জমিদাররাই ছিল এদের আসল শিকার। তারপর পথে ঘাটে অচেনা লোকদের মারধোর, জিনিসপত্তর লুটপাট করাও ছিল আর এক পেশা। তাই এই সমস্ত ডাকাতদের ভয়ে জমিদাররাও সদা সতর্ক থাকত এবং এদের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য বলিষ্ঠ চেহারার কিছু লেঠেলকেও প্রতিপালন করত।

তারাপ্রসন্নবাবুও এই অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন। তাঁর জমিদারিতে ভুবন সর্দার নামে এক লেঠেল ছিল। ভুবন নিজেও এক সময় ছিল এক দুর্ধর্ষ ডাকাত। তবে তার দলের লোকেরা সবাই ধরা পড়ে যাওয়ায় সে নিজের দেশ ছেড়ে এসে জমিদার তারাপ্রসন্নবাবুর বাড়িতে আত্মগোপন করে। তারাপ্রসন্নবাবু ভুবনের পূর্ব পরিচয় জানতেন না। তবে ভুবনের সাহসিকতা, কর্তব্য-পরায়ণতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে তার ওপর খুবই প্রসন্ন ছিলেন।

ভুবন সর্দার দিনের বেলায় ঘুমতো আর রাত জেগে পাহারা দিত। ভুবনের লাঠির সঙ্গে যাদের পরিচয় ছিল তারা ভুবনকে ঘাঁটাত না। এই অঞ্চলের ডাকাতরাও ভয় করত ভুবনকে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা লাঠি হাতে ভুবন সর্দার বাড়ি পাহারা দিচ্ছে এমন সময় বহু দূরে কয়েকটি উজ্জ্বল আলোর রেখা দেখতে পেল।

জমিদার তারাপ্রসন্নবাবুও দোতলার বারান্দা থেকে দেখতে পেলেন সেই দৃশ্য। দেখেই ভয়ে শঙ্কিত হয়ে ডাক দিলেন—ভুবন, একবার এদিকে এসো তো ?

ভুবন উঠোনে দাঁড়িয়েই লাঠিতে ভর দিয়ে তিড়িং করে লাফিয়ে বারান্দায় উঠল। এরকম লাঠিয়াল সত্যই বিরল। শুধু লাঠিতে ভর দিয়েই বড় বড় গাছের মগডালে সে অনায়াসে উঠে পড়তে পারত। লাঠিতে ভর দিয়ে ছিটকে বাড়ির ছাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। আর লাঠিতে ভর দিয়েই দশ বিশ মাইল দূরের গ্রাম থেকে সামান্য কিছু সময়ের মধ্যে ঘুরে আসতে পারত।

যাই হোক। ভুবন সর্দার বারান্দায় এলে তারাপ্রসন্নবাবু দূরের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে বললেন—ঐ দেখো।

ভুবন সর্দার সেই দিকে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁ, আমিও লক্ষ্য করেছি। কতকগুলো আলোর শিখা। মনে হচ্ছে কতকগুলো মশাল জ্বালিয়ে কারা যেন এদিকে আসছে।

তারাপ্রসন্নবাবু বললেন—এই সন্ধ্যে রাতে মশাল জ্বালিয়ে যখন দলে দলে সব এগিয়ে আসছে তখন ওরা যে কারা তা বুঝতে পারছো তো ? অতএব তৈরী হও। এরা যেভাবে আসছে তাতে মনে হচ্ছে গ্রামকে গ্রাম এরা না জ্বালিয়ে দেয়।

ভুবন বলল—ঠিক আছে। আপনি বাড়ির মেয়েদের নিয়ে গুপ্ত কক্ষে চলে যান। আমি দেখে আসি দলে ওরা কতজন।

এই বলে যেই না ভুবন যেতে চায় অমনি তারাপ্রসন্নবাবু ওর একটি হাত খপ করে ধরে বললেন—না ভুবন, এ সময় তুমি আমাদের ফেলে রেখে কোথাও যেও না। ওদের খোঁজ নেবার জন্যে আমি অন্য লোক পাঠাচ্ছি। কেন না তুমি বাড়িতে না থাকলে আমি লোহার সিন্ধুকে ঢুকেও শান্তি পাব না। এই বলে তারাপ্রসন্নবাবু ভুবনকে আটকালেন এবং আর একজন লোককে বললেন—যাও তো দূর থেকে একটু ভালো করে দেখে এসো তো ওরা কারা। তারপর সেই বুঝে ব্যবস্থা নেবো। কেন না দিনকাল খুব খারাপ। অতএব সতর্ক হয়ে থাকতে দোষ কি ?

তারপর আদেশ পেয়েই লোকটি লাঠিতে ভর করে অন্ধকারে এগোতে লাগল মশালধারীদের দেখতে।

তখনকার দিনে ডাকাতরা রণপার সাহায্যে বহুদূর দূরান্তরে ডাকাতি করতে যেত। কিন্তু শুধুমাত্র একটি লাঠিতে ভর করেও অনেকে অপূর্ব কৌশলে খুব তাড়াতাড়ি দূরে যাতায়াত করতে পারত। এই যাতায়াতে ভুবন সর্দারের জুড়ি ছিল না কেউ। তবু এই কৌশলেই লোকটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই মশালধারীদের খোঁজ নিয়ে এসে বলল—না বাবুমশাই। ভয়ের কোন কারণ নেই। হুগলীর দিক থেকে একদল লোক বর-কনে নিয়ে এইদিকে আসছে। বাজনা বাদ্যি বাজিয়ে মশাল জ্বেলে অন্ততঃ জনা পঞ্চাশেক লোক এগিয়ে আসছে এদিকে।

তারাপ্রসন্নবাবু আশ্বস্ত হয়ে বললেন—যাক বাবা। বাঁচা গেল। কিন্তু এই সব অঞ্চলে যেরকম ডাকাতের উপদ্রব তাতে তো এদের এইভাবে যেতে দেওয়া যায় না।

লোকটি বলল—তা অবশ্য ঠিক। তবে দলে তারা এত বেশি যে ওদের ঠেকায় কার সাধ্য। তাছাড়া লাঠি সড়কি বল্লম তলোয়ার সবই আছে ওদের সঙ্গে।

এই কথা শোনা মাত্রই ভুবন সর্দার উত্তেজিত হয়ে উঠল।

এমন সময় দূর থেকে নানা রকম বাদ্যি বাজনার শব্দ শোনা যেতে লাগল।

তখন সন্ধ্যে রাত্রি। আলো আর বাদ্যি বাজনার শব্দ শুনে তো আহ্লাদে আটখানা হয়ে গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই ছুটল কি আসছে দেখতে।

এদিকে সুসজ্জিত পাল্কি কাঁধে বর-কনের শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে গ্রামে এসে ঢুকল। গ্রামের বারোয়ারীতলায় বিশাল বটগাছের নিচে বিশ্রামের জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসল সকলে। অনেক দূর থেকে আসছে তো সব। কাজেই বিশ্রামের জন্য এবার একটু বসার প্রয়োজন।

জমিদার তারাপ্রসন্নবাবু বর-কনের দলকে ডাকাত ভ্রমে প্রথমে খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর যখন বুঝলেন তাঁর আশঙ্কা ভুল তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। তিনি এমনিতে সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তাই

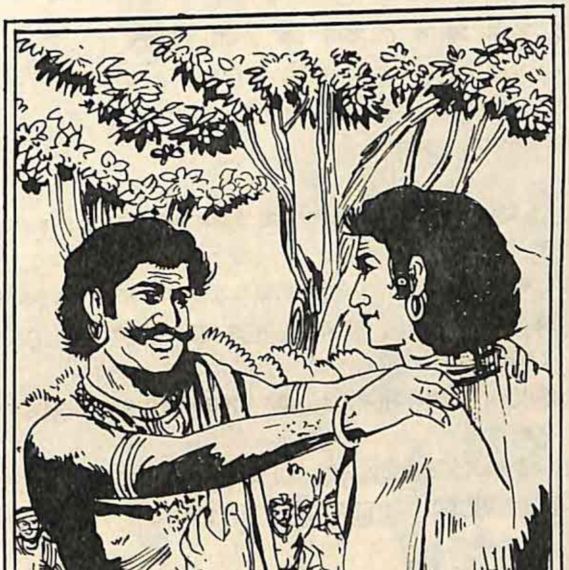
বললেন—তাহলে ভুবন, ঐ লোকগুলো তো আজ রাত্রে এই গ্রামের অতিথি। ওদের কাছে গিয়ে একটু জিজ্ঞেস করে দেখো আমাদের কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা ওদের। যদি ওরা আজ রাত্রে থাকতে চায় বা খেতে চায় তাহলে সেই মতো ব্যবস্থা করো।

ভুবন এতক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল। এবার একটু হেসে বলল—বাবু! এতটা উদারতা না দেখিয়ে বরং আপনার লেঠেলদের তৈরী হয়ে বাড়ির চারপাশে লুকিয়ে থাকতে বলুন।

—সে কি! এ তুমি কি বলছ ভুবন?

—ঠিকই বলছি। আপনি আর দেরী করবেন না। একবার নায়েব মশাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।

তারাপ্রসন্নবাবু ভীত হয়ে বললেন—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।



—একটু পরেই বুঝতে পারবেন। ভুবন সর্দার এত ভুল করে না। বিপদের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে বাবু। আপনি বাড়ির মেয়েদের ও ছোট ছেলেপুলেদের গুপ্ত কক্ষে পাঠিয়ে দিন। তাড়াতাড়ি করুন, দেরী করবেন না।

তারাপ্রসন্নবাবু ভুবন সর্দারকে ভালো রকমই চিনতেন। তাই ওপর থেকেই হাঁক দিয়ে লেঠেলদের বললেন—এই, ভুবন কি বলছে শোন। বলে নায়েব মশাইকে ডাকতে নিচে নেমে এলেন।

একটু পরেই নায়েব মশাই এলেন। ভুবন নায়েব মশাইয়ের কানে কানে কি যেন বলতেই নায়েব মশাই দ্রুত চলে গেলেন সেখান থেকে। ভুবন এবার বারান্দা থেকে নিচে নেমে এলো। তারপর লেঠেলদের বলল—তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে এই বাড়ির আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকো। আর একটু বাদেই হয়তো এ বাড়িতে ডাকাত পড়বে।

লেঠেলরা বলল—কি করে বুঝলে?

বাঘের গায়ের গন্ধ যেমন তার অস্তিত্ব জানিয়ে দেয় তেমনি ওদের এই সশস্ত্র আবির্ভাবও ওদের পরিচয় পাইয়ে দিচ্ছে। ওরা সত্যিই বর-কনে নিয়ে এলে ওদের ভেতর থেকে কেউ না কেউ আমাদের কাছে এসে রাতের আহার এবং আশ্রয় প্রার্থনা করত। কিন্তু সে সব না করে চুপচাপ বসে রইল বারোয়ারীতলায়। এতে কি মনে হয়? আমার মনে হচ্ছে এদের বর-কনে সবই ভুয়া। আসলে এটা ওদের ছদ্মবেশ। আর ওই বাজি বাজনার উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামের লোককে ভুলিয়ে অন্যমনস্ক করা। ওদের অসর্তকতার সুযোগে ওরা এসে এখানে ডাকাতি করবে। অতএব তোমরা সতর্ক থাকো।

ভুবনের কথামতো লেঠেলরা তাই করল।

এদিকে নায়েব মশাই ভুবন সর্দারের শেখানো পড়ানো মতো লোকজন সঙ্গে নিয়ে বারোয়ারীতলায় এসে অতিথিদের জিজ্ঞেস করলেন—আপনাদের বরকর্তা কে?

একজন ষণ্ডামার্কা বাবড়ি চুলওয়ালা লোক গোঁফে পাক দিয়ে এগিয়ে এসে বলল—আমি।

—আমাদের মা ঠাকরুণ জানতে পাঠিয়েছেন আজ রাত্রে আপনারা কি এখানে থাকবেন? যদি থাকেন

তাহলে আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এখানে হতে পারে। কেননা আমাদের নিয়ম আছে এই গ্রামে কেউ অতিথি হয়ে এলে আমরা তাদের অভুক্ত থাকতে দিই না।

বাবড়ি চুলওয়ালা লোকটি বলল—তা মন্দ প্রস্তাব কি? কিন্তু তোমাদের প্রজাবৎসল জমিদার তারাপ্রসন্নবাবু থাকতে হঠাৎ মা ঠাকরুণ এই নিমন্ত্রণ জানালেন কেন?

নায়েব মশাই হাত কচলাতে কচলাতে বললেন—মানে, বাবুমশাই তো নেই। উনি আজই সকালে লোকজন নিয়ে বর্ধমান গেছেন একটি বিশেষ কাজে। ফিরতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে। তাই মা ঠাকরুণ বলে পাঠালেন বাবু নেই বলে অতিথি সেবার যেন কোনরকম ত্রুটি না হয়। আর এও বলে দিয়েছেন আপনারা ভিন দেশি লোক। হয়তো জানেন না এ সমস্ত জায়গা ভালো জায়গা নয়। তাই আপনারা পারলে এ রাত্রিটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালে যেখানে ইচ্ছে যান।

—সে ভেবে দেখবখন। তো তোমাদের সেই ভুবন সর্দার লোকটি কি এখানে আছে?

নায়েব মশাই বললেন—হঠাৎ ভুবন সর্দারের খোঁজ করছেন কেন বলুন তো?

—সে আমাদের পুরনো বন্ধু। তার সঙ্গে একটু দেখা করবার ইচ্ছে আছে আমাদের।

—তাই নাকি! কিন্তু মহাশয় ভুবন সর্দার তো এখানে নেই।

—কোথায় গেছে সে?

—ভুবনও তো বাবুর সঙ্গে গেছে। পথে ঘাটে বাবুর যদি হঠাৎ কোন বিপদ হয় তখন বাবুকে রক্ষা করবে কে? কাজেই ভুবনের সঙ্গে তো এখন দেখা হবে না।

বাবড়ি চুলওয়ালা লোকটি এবার গোঁফে তা দিয়ে বলল—জয় মা। তা তোমাদের ভুবন সর্দার লোকটি কিন্তু সত্যিই দুর্ধর্ষ। তবে কি জান—ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই। এই যে সে বাবুর সঙ্গে গ্রাম থেকে চলে গেল এখন হঠাৎ কোন বিপদ হলে তোমাদের রক্ষা করবে কে?

নায়েব মশাই বললেন—সে অবশ্য ঠিক। তবে আমাদের এখানে সচরাচর কোন বিপদের আশংকা দেখি না আমরা। তারপরেও যদি কিছু ঘটে তবে সেটা দুর্ভাগ্য।

বাবড়ি চুলওয়ালা লোকটি বলল—বেশ। আমরা এই রকমটিই চাইছিলুম। তোমাদের মা ঠাকরুণকে বলো আমরা আজ রাত্রে এখানেই থাকছি। তোমরা আমাদের রাতের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা একটু তাড়াতাড়ি করো তাহলে।

নায়েব মশাই ফিরে এসে সেই কথাটা ভুবন সর্দারকে বলতেই ভুবন বলল—ঠিক আছে। যা ভেবেছি তাই। আপনি এক কাজ করুন—বেশ কড়া করে কিছু লোককে সিদ্ধি বাটতে বসিয়ে দিন। তারপর সেই সিদ্ধির সরবৎ বালতি বালতি নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে থাকুন ওদের। তবে খুব সাবধান, লোভে পড়ে আপনার লোকেরা যেন ঐ সিদ্ধি চেখে দেখতে না চায়। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

নায়েব মশাই বললেন—ও ভারটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও ভুবন। এই বলে নায়েব মশাই তাঁর সমস্ত অনুচরদের সিদ্ধি বেটে সরবৎ তৈরী করতে লাগিয়ে দিলেন। তারপর সেই সরবৎ বড় বড় বালতিতে করে নিয়ে চললেন বারোয়ারীতলায়।



এদিকে নায়েব মশাই চলে আসার পর দলের লোকেরা কি সব কথাবার্তা কয় তা শোনবার জন্য ভুবনের একজন অনুচর লুকিয়ে ছিল বট গাছের আড়ালে। নায়েব মশাই চলে আসতেই লোকটি দেখল বর-কনের দল আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়ল।

বাবড়ি চুলওয়ালা লোকটি বলল—আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম রে ভাই। এ যে দেখি না চাইতেই জল। বাবু তারাপ্রসন্ন নেই। ভুবন সর্দার নেই। তার মানে আরো কিছু লোক নেই। এ বাড়িতে ডাকাতি করার এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর কি হতে পারে?

আর একজন বলল—তার ওপর উপরি পাওনা এই নেমন্তন্ন। ভালোই হ'ল। অন্ধকারে লুকিয়ে চুরিয়ে আচমকা ঢুকতে হবে না। দল বেঁধে খেতে যাব আর সেই সুযোগে লুটপাট করে কেটেকুটে রেখে আসব।

বাবড়ি চুলওয়ালা লোকটি বলল—এমন সুযোগ হবে জানলে এত পরিকল্পনা করে বাজি বাজনা না নিয়ে এলেই হোত। হৈ হৈ করে আচমকা ঢুকে পড়লেই চুকে যেত ল্যাঠা।

লোকটি এসব শুনেই চুপিচুপি এসে খবর দিল ভুবনকে। তারাপ্রসন্নবাবুও শুনলেন। শুনে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন তিনি।

ভূবন সর্দার বলল—আপনি নির্ভয়ে থাকুন বাবু। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ আপনার গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেব না আমি।

তারাপ্রসন্নবাবুর ভয় তবুও গেল না। তিনি দুহাত জোড় করে ইষ্ট দেবতাকে ডাকতে লাগলেন।

ডাকাতের দল যখন বারোয়ারীতলায় বট গাছের নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আনন্দে উল্লাস করছে তখন নায়েব মশাইয়ের লোকেরা দলে দলে সিদ্ধির বালতি নিয়ে এসে বলল—তা মাননীয় অতিথিরা, আপনাদের জন্য আমাদের এখানে লুচি মণ্ডার ব্যবস্থা হয়েছে। ততক্ষণ একটু সরবৎ খেয়ে ক্লান্তি দূর করুন।

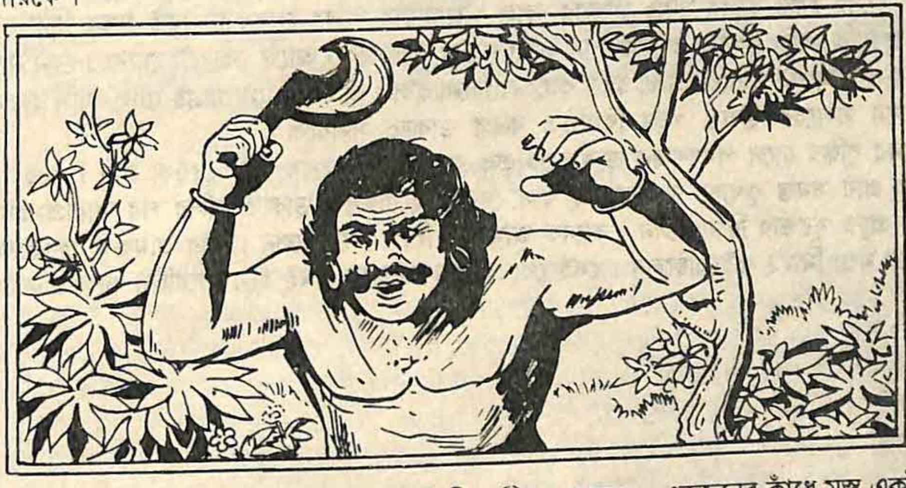
নায়েব মশাইও তদারকি করতে করতে বললেন—ওরে দে দে অতিথিদের সরবৎ দে। বেশ যত্ন করে খাওয়া।

ডাকাতরা তো আকণ্ঠ পুরে সেই সরবৎ খেয়ে খুব প্রশংসা করতে লাগল—আহা কি চমৎকার। এমনটি আমরা কখনো খাইনি।

নায়েব মশাই বললেন—আমাদের গ্রামের এই সরবতের এক বিশেষ গুণ আছে। খেলে খিদে হয়, হজম হয়। ঘুম আসে। একবার খেলে ভোলা যায় না।

একে সিদ্ধির সরবৎ। তারপর অঢেল খাওয়া। কাজেই খেতে খেতে নেশা হ'ল। আর নেশার ঘোরে সবাই তখন চেঁচাতে লাগল—আরো দাও আরো দাও করে।

ওরা যত চায় এরাও তত দেয়। তারপর যখন দেখল আর না খাওয়ালেও চলবে তখন গিয়ে খবর দিল ভূবন সর্দারকে।



একটু পরেই দেখা গেল কয়েকজন লোক ঢোল কাঁসি বাজিয়ে আসছে। একজনের কাঁধে মস্ত একটা হাড়িকাঠ। আর ভূবন সর্দারের হাতে একটি ধারালো কাতান (খড়্গ)।

ওরা এসে ঢোল কাঁসি বাজিয়ে বারোয়ারীতলায় হাড়ি কাঠ পুঁততে লাগল।

আর ভূবন সর্দার কাতান উঁচিয়ে বারোয়ারীতলায় দেবীর শূন্য আসনের কাঠামোর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—মা-মাগো, আজই যেন ওদের শেষ রাত হয় মা।

এই দেখে একজন ডাকাত সিদ্ধির ঘোরেই জিজ্ঞেস করল—কি ভায়া, তোমরা এসব এখানে এনেছ কেন?

ভূবন সর্দার বলল—আজ আমাদের শুভ রাত্রি। তাই আজ মায়ের সামনে বলি হবে।

—অ। তা আমরা সেই বলির প্রসাদ পাবো তো?

—নিশ্চয় পাবে। সবাই জোড় হাত করে মাকে ডাকো।

ইতিমধ্যে ভূবনের ইঙ্গিতে ডাকাতের দলকে লেঠেলরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

ভূবন বলল—এদিকে যে এক মুশকিল হয়ে গেছে ভাই।

—কি মুশকিল হয়েছে বলো?

—বলি তো হবে, কিন্তু বলির পাঁঠা যে পাওয়া যাচ্ছে না।

—সে কিরকম কথা। ওসব কিছু আমরা শুনতে চাই না। আমরা বলি দেখব। বলির প্রসাদ চাই

আমাদের। যেমন করে পারো বলি দাও।

ভুবন সর্দার বলল—আরে সেই জন্যেই তো আমি এসেছি। আমি বলি কি পাঁঠা নাইবা পেলাম। মায়ের পূজোর জন্যে তোমাদের ভেতর থেকে কি কেউ বলির পাঁঠা হতে পারো না?

এমন সময় ডাকাতের ভেতর থেকে একজন 'প্যাঁ প্যাঁ' করে ডাকতে ডাকতে এসে বলল—আমি, আমি হব বলির পাঁঠা। আমাকে বলি দাও আজ, তবে ভাই, একটা কথা আগেই বলে রাখছি আমার ভাগের পেসাদটা কিন্তু বেশি চাই।

সেই না শুনে আর একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—একি মগের মুলুক নাকি? তুই কেন বেশি পেসাদ পাবিরে? তাছাড়া আমি থাকতে তুই কি পাঁঠা হবি। পাঁঠা তো আমি হবো।

অন্য ডাকাতরা তখন পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। ওরা পাঁঠা হলে আমরাও তো পাঁঠা।

ভুবন সর্দার বলল—তোমরা সবাই পাঁঠা। একটু সবুর করো, তোমাদের সবাইকেই এক এক করে এই হাড়ি কাঠে বলি দেবো আমি।

এইবারেই হল মুশকিলের চূড়ান্ত। কে আগে পাঁঠা হবে তাই নিয়ে ডাকাতদের দলে নিজেদের ভেতর লেগে গেল দারুণ মারামারি। তার তারই ফাঁকে ভুবন করল কি হাতের সামনে যাকে পেল তাকেই ধরে বলি দিতে লাগল।

এইভাবে দলকে দল শেষ করে দেবার পর একজনই শুধু বাকি রইল। সে হল সেই বাবড়ি চুলওয়ালা লোকটি। সেই হচ্ছে দলের সর্দার। সর্দার বলল—আমাদের দলের লোকেরা সবাই যখন পাঁঠা হ'ল তখন আমিই বা বাকি থাকি কেন? আমিও পাঁঠা হবো। তবে ভাই একটু আস্তে কোপটা মেরো। যেন না লাগে।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সর্দারের মাথা হাড়ি কাঠে লাগানো হ'ল। আর লাগানো মাত্রই ঢোল কাঁসি বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ভুবন সর্দারের উদ্যত খড়্গ দ্বিখণ্ডিত করল ডাকাত সর্দারকে।

ভুবনের বুদ্ধির চালে পঞ্চাশজন ডাকাতকে এক রাতের মধ্যে শেষ করে দেওয়া হ'ল। সেই রাতে এই অঞ্চলের প্রায় সমস্ত কুখ্যাত ডাকাতকেই বলি দেওয়া হয়েছিল। ডাকাত বলির পর তারাপ্রসন্নবাবু ভুবন সর্দারকে প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিলেন। অনেক জমিজমা লিখে দিয়েছিলেন। আর গ্রামশুদ্ধু লোককে পরদিন পেট ভরে মণ্ডা মিঠাই খাইয়েছিলেন। সেই থেকে ভুবন সর্দারের নামই হয়ে গিয়েছিল ডাকাত কাটা ভুবন।



দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ মিঠুয়ার খুব আনন্দ। একে রবিবার, তার ওপর আবার আকাশ পরিষ্কার, ঘন নীল। ঝকঝকে তকতকে রোদ। অল্প হাওয়াও আছে। ঘুড়ি ওড়াবার পক্ষে এর চেয়ে ভাল আবহাওয়া আর কী হতে পারে! বিশেষ করে শিলংয়ের মত জায়গায়। যেখানে সকাল দশটা বাজতে না বাজতেই আকাশে কোথ্ থেকে উড়ে আসে এক রাশ গোমড়ামুখো মেঘ। তারপর মেঘ জমতে জমতে শেষমেষ বিকেলের দিকে ছিচকাঁদুনে ছেলের মত দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি না ঝরিয়ে ছাড়ে না কিছুতেই।

কিন্তু আজকের সকালের চেহারা একেবারে আলাদা। মাথার ওপরে আকাশ যেন এক ঘন নীল জাজিম। তাতে ছিটে ফোঁটা সাদা সুতোও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। পাহাড়, উপত্যকা, নদী, ঝরণা, লেক, বাড়ি, ঘর, পাইন গাছ—সব কিছু আজ সূর্যের রোশনাইতে ঝকঝকে তকতকে। চোখে পড়ে, নিঃসীম নীল শূন্যে উড়ছে এক ঝাঁক সাদা পাখি। ওরা কোথা থেকে এসেছে কে জানে!

এমন একটা দিনে পড়ার বই পড়তে কার ভাল লাগে! তাই বারান্দায় রোদ্দুরে বাবার কাছে পড়তে বসে প্রায়ই আনমনা হয়ে যাচ্ছিল মিঠুয়া। বারবার ওর মন চলে যাচ্ছিল নীরস পড়ার বইয়ের পাতা থেকে বাইরের নীল আকাশের জাজিমে।

পড়াতে পড়াতে বার দুই ধমকালেন মিঠুয়ার বাবা, কি মিঠুয়া, পড়ায় মন নেই কেন? তখন থেকে দেখছি কেবল—

বাবার কথায় মনে মনে একটু লজ্জা পায় মিঠুয়া। সত্যি কথা বলতে কি, এমন একটা সকালে বসে ইংরেজি গ্রামারের কচকচি পড়তে কারই বা ইচ্ছে করে! তাই মাঝে মাঝেই ওর চোখ যাচ্ছে পাইন বনের মাথায় নীল আকাশের দিকে, আবার কখনও ঘরের ভেতরে বেডের টেবিলের নিচে, যেখানে রাখা আছে ওর প্রিয় ঘুড়ি আর লাটাই।

মিঠুয়া কিছু না বললেও বোধহয় ওর মনের ভাবটা বুঝতে পারেন ওর বাবা। বললেন, 'ঠিক আছে, আজ এখন কিছুক্ষণ খেলে নে রাতে না হয় আবার পড়াতে বসব—

বাবার কাছ থেকে ছুটি পেয়ে একছুটে বইপত্র রেখে আসে পড়ার ঘরে,তারপরেই ঘুড়ি লাটাই নিয়ে বাড়ির বাইরে। আজ আর সম্রাট, নীল, রাজীবদের সঙ্গে খেলা নয়, আজ বাড়ির বাগানে দাঁড়িয়ে মনের সুখে ঘুড়ি ওড়ান।

মিঠুয়ার লাটাই আর মাঞ্জা সুতো কলকাতার চাঁদনি চক থেকে কিনে এনে দিয়েছেন ওর বাবা। অনেকগুলি ঘুড়ি—লাল, নীল, হলুদ, সবুজ,—কত নানা রঙের। কিন্তু ওর সবচেয়ে প্রিয় নীল ঘুড়িটা যেটা লাবানের দোকান থেকে মিঠুয়া কিনেছিল প্রায় বছর খানেক আগে। নীল রঙের ঘুড়িটার মাঝ কামানির (মাঝখানের কাঠি) দু-পাশে সাদা দুই চোখ। ঝট করে দেখলে মনে হয় যেন ঘুড়ি নয়, একটা লোকের মুখ। পুরান বলে ঘুড়িটা অনেক জায়গায় ছিড়েখুঁড়ে গেছে। তবু পরম যত্নে তাপ্পি লাগিয়ে নীল ঘুড়িটাকে তকতকে করে রাখে। বিশেষ দিন দেখে আকাশে ওড়ায় মিঠুয়া।

একটা উঁচু টিলার ওপর মিঠুয়াদের বাড়ি। সেই উঁচু টিলার ওপর দাঁড়িয়ে নীল ঘুড়িটা ওড়াতে শুরু করে মিঠুয়া। কিন্তু হাওয়া আজ যেন একটু বেশি। ঘুড়িটা বড্ড পুনটুং (গোত্তা) খাচ্ছে। দমকা হাওয়ায় পুনটুং খেতে খেতে নীল ঘুড়িটা যেন দু-চোখ দিয়ে বলে ওঠে, 'বুড়ো হয়ে গেছি, দমকা হাওয়ার সঙ্গে আজ আর লড়তে পারছি না। একটা লেজ লাগিয়ে দাও বরং। তারপর আবার বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখাব—'

নীল ঘুড়ির কথা বুঝতে পেরে আস্তে আস্তে ঘুড়িটাকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসে মিঠুয়া। তারপর হলুদ টিসু কাগজ কেটে বেশ বড়সড় একটা লেজ তৈরি করে। সেই লেজটা আঠা দিয়ে ভাল করে সেঁটে দেয় নীল ঘুড়ির সঙ্গে।

এবার নীল ঘুড়ি তার হলুদ লেজ নিয়ে পতপত করে উড়তে থাকে আকাশে। উড়তে উড়তে উঠে যায় অনেক উঁচুতে। মিঠুয়াদের কাঠের বাড়ি, হক সাহেবের বাগানের পাইন গাছের উঁচু মাথাও ছাড়িয়ে যায় মিঠুয়ার নীল ঘুড়ি। আশেপাশের অন্য ঘুড়িগুলোর দিকে অবহেলার চোখে তাকায় মিঠুয়া, ওর প্রিয় নীল ঘুড়িই সবচেয়ে ওপরে উড়ছে। অন্য ঘুড়িগুলো অনেক নিচে। আশেপাশের সবাই খানিকটা ঈর্ষার চোখে তাকিয়ে থাকে ওর নীল ঘুড়ির দিকে।

কী একটা কাজে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে যান মিঠুয়ার মা। অবাক হয়ে দেখেন, মিঠুয়ার নীল ঘুড়ি সবার চেয়ে উঁচুতে উড়ছে।

মিঠুয়ার মা সাবধান করেন, 'ছেঁড়া ফাঁটা পুরান ঘুড়ি, আর বেশি ওপরে তুলিস না। এরপর আর সামলাতে পারবি না।'

মনে মনে জানে মিঠুয়া, ওর নীল ঘুড়ি পুরান ছেঁড়া ফাটা, তবু সে কথা অন্য কেউ বললে ওর খুব খারাপ লাগে। ওর নীল ঘুড়ি, এখনও সেই আগের মতোই তেজী আছে, যেন সেটা মাকে দেখাতেই মিঠুয়া আরও উঁচুতে তুলতে থাকে তার নীল ঘুড়ি। নীল আকাশের বুকে ছোট্ট একটা নীল পাখির মতই উড়তে থাকে মিঠুয়ার প্রিয় ঘুড়ি। মিঠুয়ার বুকটা ভরে যায় গর্বে। পেরেছে, পেরেছে, বুড়ো হলেও মিঠুয়ার নীল ঘুড়ি সবাইকে টেক্কা দিতে পেরেছে।

কিন্তু একটু পরেই আচমকা শুরু হয় দমকা হাওয়া। সেই দমকা হাওয়ায় সাইতালিং (পাক) খেতে শুরু করে নীল ঘুড়ি। বিপদ আঁচ করে মিঠুয়া তাড়াতাড়ি নামাতে শুরু করে নীল ঘুড়িকে। কিন্তু দমকা হাওয়ার বেগ ক্রমেই বাড়ছে। এরই মধ্যে আবার নতুন বিপদ। হাওয়ার দাপটে হঠাৎ ছিড়ে যায় নীল ঘুড়ির হলুদ লেজ। হলুদ লেজ ছিঁড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীল ঘুড়ি প্রচণ্ড টালমাটাল হয়ে ওঠে। হাওয়ার দাপটের মুখে মিঠুয়া আর যেন সামলাতে পারে না। তবু ঘুড়িটাকে নিচে নামিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে না। মিঠুয়ার নীল ঘুড়ি গোত্তা খেয়ে পড়ে হক সাহেবের বাগানের উঁচু পাইন গাছের মাথায়। তারপর অনেক চেষ্টা করেও মিঠুয়া পাইন গাছের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করতে পারে না নিজের প্রিয় নীল ঘুড়িকে। জোরে টানতে গিয়ে পাইনের ডাল থেকে কেবল সুতোটাই ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে।

পাইনের ডালে জড়িয়ে পড়ে মিঠুয়ার প্রিয় নীল ঘুড়ি ওর দিকে অসহায় দুচোখ মেলে যেন তাকিয়ে থাকে। মিঠুয়া শুনতে পায়, নীল ঘুড়ি বলছে, 'আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি তাই আর পারলাম না। শুধু একটা অনুরোধ আমাকে ভুলো না মিঠুয়া।'

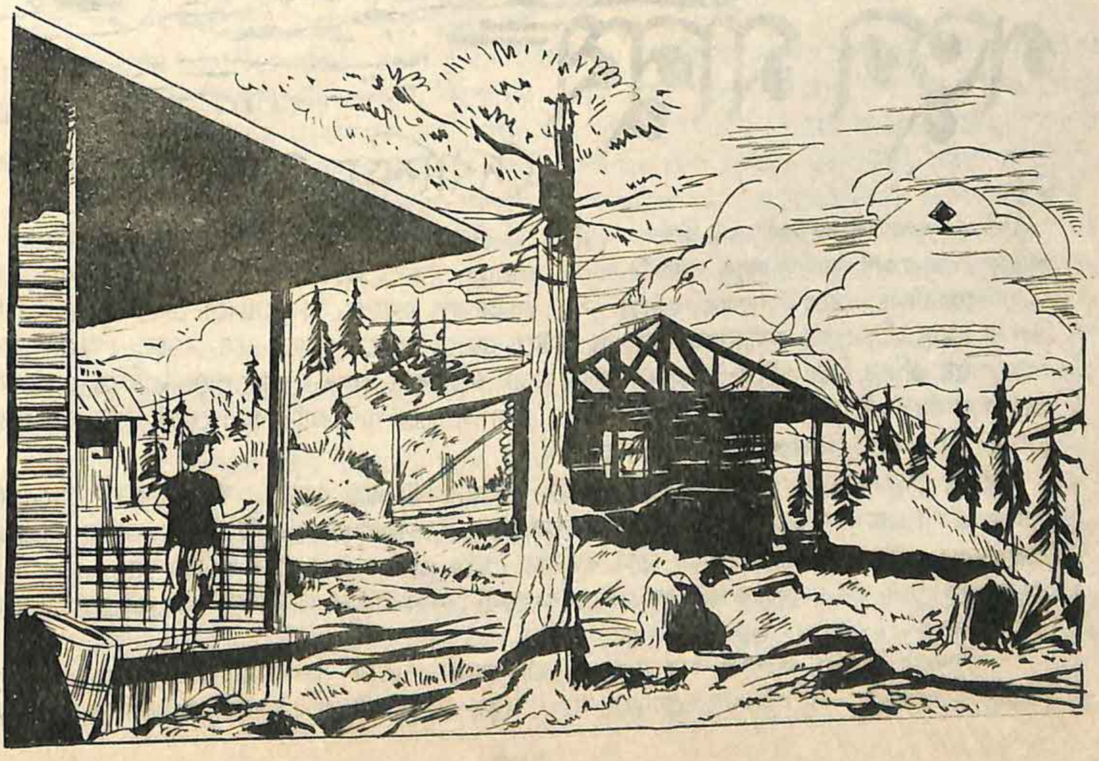
মিঠুয়া কী করে ভুলবে তার প্রিয় নীল ঘুড়িকে, যাকে এক বছর আগে ঘুড়ি ওড়াতে শেখার প্রথম দিন কিনে

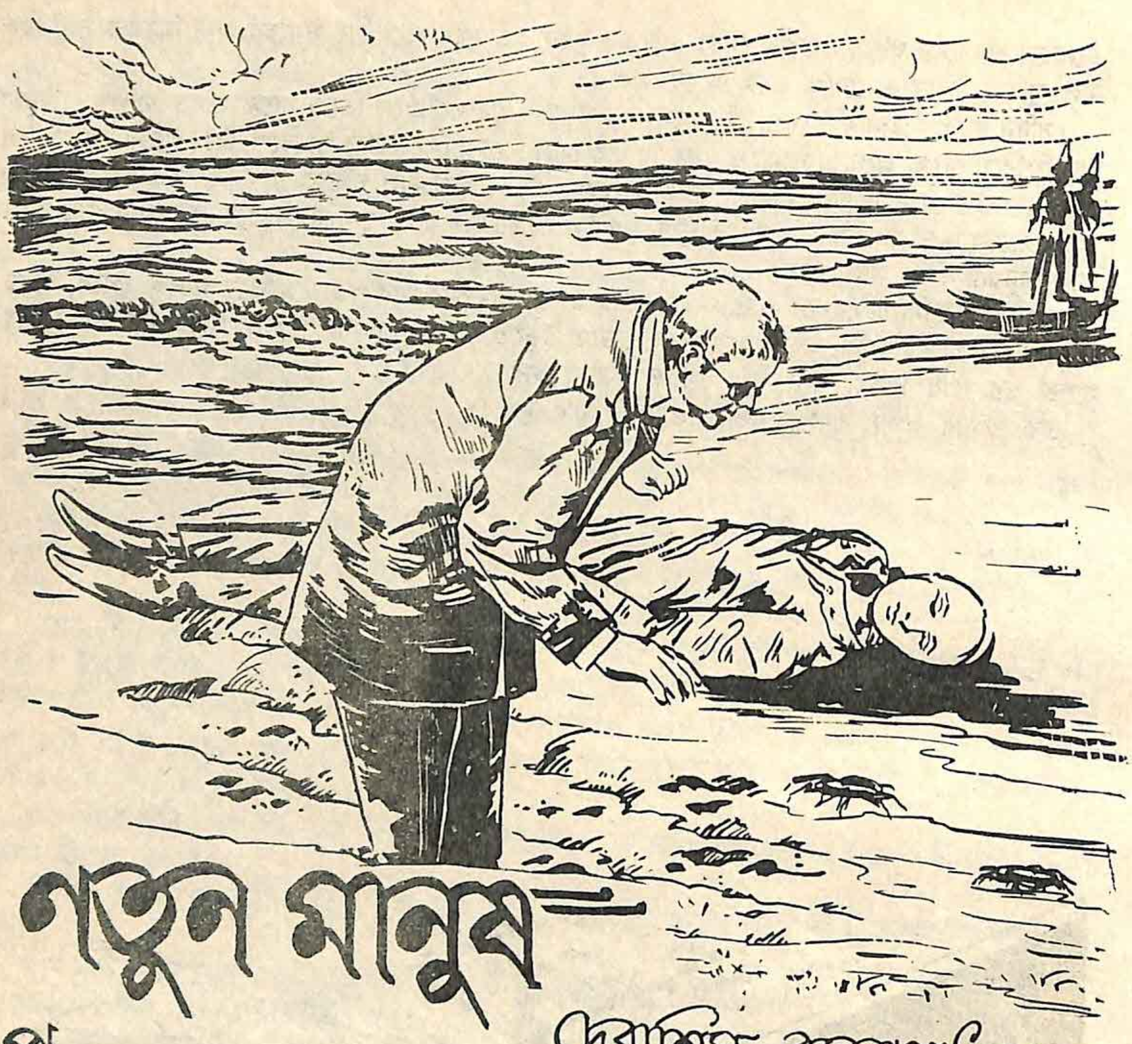
এনেছিল লাবানের ঘুড়ির দোকান থেকে এই এক বছর কত সুখে-দুঃখে সব সময়ের জন্য মিঠুয়ার সঙ্গী ছিল নীল ঘুড়ি। মিঠুয়ার চোখে ভরে আসে জল।

সেদিন রাতে বিছানায় শুয়েও ঘুম আসে না মিঠুয়ার। চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে মাথার বালিশ। মিঠুয়া ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, অঘোরে ঘুমোচ্ছে, মিঠুয়ার বাবা-মা। বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে বাড়ির দরজা খুলে ঢাকা বারান্দায় এসে দাঁড়ায় মিঠুয়া। তাকিয়ে দেখে, এক আশ্চর্য নীল ঘুড়িকে দেখবার জন্য হক সাহেবের পাইন গাছের দিকে তাকায়। কিন্তু নীল ঘুড়ি ত পাইন গাছের মাথায় আটকে নেই। তবে কি আবার ঝড়ে উড়ে গেল-মিঠুয়ার প্রিয় নীল ঘুড়ি।

একটু পরেই মিঠুয়া দেখতে পায়, পাইন বনের ওপরে, লুমপারিংয়ের পাহাড় ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উড়ছে মিঠুয়ার নীল ঘুড়ি। মিঠুয়া অবাক হয়ে দেখে, উড়তে উড়তে পৃথিবীর সব নদী, পাহাড়, অরণ্য, সবকিছু ছাড়িয়ে যাচ্ছে ওর প্রিয় ঘুড়ি। নীল ঘুড়ি কারও কাছেই হার মানে নি।

এক অপার স্বর্গীয় হাসিতে ভরে ওঠে মিঠুয়ার মুখ।





নতুন মানুষ

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

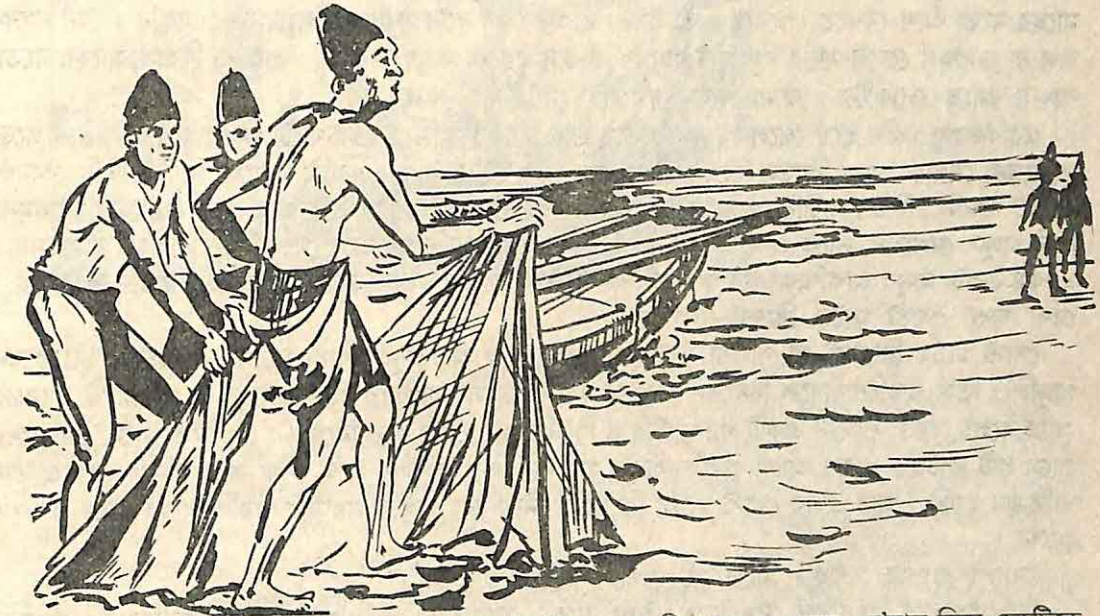
পুরী ও গোপালপুরের মাঝামাঝি নির্জন সমুদ্রসৈকতে ভোরবেলা লোকটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। প্রতিদিন ভোরবেলা অরবিন্দবাবুর পায়চারি করার অভ্যাস। তিনিই প্রথম মৃতদেহটি দেখতে পেলেন।

ঢেউয়ের কিনারা ঘেঁষে তালগোল-পাকানো দেহটা যে আসলে মানুষের, তা দূর থেকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না। মনে হচ্ছিল, বড় একটা শুশুক বোধহয় ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে ওখানে এসে ঠেকেছে। অরবিন্দবাবু পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে চমকে উঠলেন। একটা মানুষ মরে পড়ে আছে। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলেন, মেঘলা আকাশের নীচে বিশাল সৈকতে তিনি একা। বঙ্গোপসাগরের ঢেউ আদিমকাল থেকে সেই যে অশান্ত, বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে, আজও তার শেষ নেই।

পুরী বা গোপালপুরের মতো সমুদ্র-শহর হিসেবে এই জায়গাটা গড়ে ওঠেনি। সমুদ্রের কাছে জেলেদের পুরনো একটা গ্রাম। এ ছাড়া আশেপাশে আর জনবসতি নেই। জেলেদের একটি কুঁড়েঘর ভাড়া নিয়েছেন অরবিন্দবাবু। শীতের সময় প্রতিবারই তিনি কলকাতা থেকে এখানে মাসখানেক কাটিয়ে যান। ভিড় তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। সমুদ্রের সান্নিধ্যে একান্তে কয়েকটা দিন কাটানোর জন্য তিনি তাই এই জায়গাটাকেই বেছে নেন।

অরবিন্দবাবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলেন, যদি গ্রামের কাউকে পাওয়া যায়। জেলেরা ভোর-রাতে ডিঙি-নৌকোগুলো নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে যায়। অদ্ভুত এইসব নৌকো। হালকা কয়েকটা কাঠের তক্তা

পাশাপাশি লাগিয়ে মোচার খোলের মতো একটা জিনিস ওরা তৈরি করে নেয়। ওটাই ওদের নৌকো। দুরন্ত সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে লুটোপুটি খেলেও নৌকোগুলো ডুবে যায় না। বিরাট এক-একটা ঢেউয়ের আছাড় ওরা অবলীলাক্রমে সহ্য করতে পারে। অরবিন্দবাবু ভেবেছিলেন, ওরকমই কিছু নৌকোয় গ্রামের কয়েকজন জেলেকে এখন দেখতে পাবেন। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। অর্থাৎ ওদের ফেরার সময় হয়নি। মৃতদেহটির পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এবার উনি কী যেন ভাবলেন। কে জানে, হয়তো আচমকা বড় কোনও ঢেউ এসে দেহটিকে আবার ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তাই এভাবে ফেলে যাওয়া উচিত নয়। দু'হাত দিয়ে তিনি মৃতদেহটিকে টানতে টানতে ডাঙার দিকে নিয়ে এলেন। আর সেই মুহূর্তেই চমকে উঠলেন অরবিন্দবাবু।



সেই প্রথম লোকটিকে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ হ'ল তাঁর। এক কিশোরের মৃতদেহ। দু'হাত দিয়ে দেহটিকে টানতে গিয়ে অরবিন্দবাবু টের পেলেন, কিশোরের চেহারা যতই শক্তপোক্ত হোক, ওর ওজন কিন্তু দেহের গঠনের তুলনায় বেশ কম। ফোলানো একটা জামা আর প্যান্ট ওর পরনে। পায়ের জুতো-জোড়া চ্যাটালো ও লম্বা। এ-ধরনের জুতো আমাদের ডুবুরিরাই সচরাচর ব্যবহার করে থাকে। অরবিন্দবাবু অবশ্য সব থেকে অবাক হলেন অন্য একটা ব্যাপার দেখে। তাঁর দু' হাতে আঠার মতো চ্যাটচেটে একটা জিনিস লেগেছে। শুকনো হাতে কী করে এই আঠার মতো জিনিসটা লাগল ? তখনই টের পেলেন, মৃত কিশোরের শরীরে এই আঠা লেগে আছে। দেহটি দু'হাত ধরে টানার সময় ওটা তাঁর গায়ে লেগেছে। অরবিন্দবাবুর হঠাৎ কী যেন মনে হ'ল। তিনি তৎক্ষণাৎ মৃতদেহটিকে উপুড় করে শুইয়ে দেবার কথা ভাবলেন। তারপরই আবার নিজেকে সামলে নিলেন। মৃতদেহ নিয়ে নাড়াচাড়া করা ঠিক নয়। থানা-পুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ে গেলে ছুটি কাটানোর আনন্দটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি নিজের ডেরায় ফিরে এসে ঠিক করলেন, থানায় একটা খবর পাঠাতে হবে।

ইতিমধ্যে জেলেরাও ফিরে এসেছে। আজ ওদের জালে ধরা পড়েছে বেশ কিছু পমফ্রেট। এমন টাটকা পমফ্রেট কলকাতায় সচরাচর মেলে না। জেলেরা এই মাছ নিয়ে পুরী বা গোপালপুরের বাজারে যাবে। জেলেদের ছেলে সামরু টাটকা মাছ দাঁড়িপাল্লায় অরবিন্দবাবুকে ওজন করে দিতে দিতে বলল, সে পুরী যাচ্ছে।

"তা হলে, তুই গিয়ে থানায় খবরটা দে।"

অরবিন্দবাবুর দিকে অবাক হয়ে তাকাল সামরু। কোট-প্যান্ট পরা এই প্রবীণ মানুষটি এই সাতসকালে নিশ্চয় রসিকতা করছেন না। সামরুর বয়স বছর পনেরো হলেও, তার বুঝতে অসুবিধে হ'ল না, পুরু চশমার আড়ালে গভীর উদ্বেগের ছায়া পড়েছে অরবিন্দবাবুর চোখে।

ওদিকে সৈকতে কারা হইচই জুড়ে দিয়েছে। চালাঘরের উঁচু দাওয়ায় বেরিয়ে এসে অরবিন্দবাবু যা

ভেবেছিলেন, ঠিক তা-ই দেখতে পেলেন। মৃতদেহটিকে ঘিরে জেলেরা কয়েকজন জড়ো হয়েছে। কিছুটা উত্তেজনা, কিছুটা বিভ্রান্তি। শান্ত, ছিমছাম জীবনের ছন্দ ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছে মৃতদেহটি। জেলে-সর্দার সুমিনকে চেঁচিয়ে কী যেন বলতে শোনা গেল। তারপরই সুমিন হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মৃতদেহটির পাশে।

দুপুরের আগেই পুলিশের জিপ এসে হাজির। পুলিশ-অফিসার মিঃ মহান্তি এলেন অরবিন্দবাবুর কাছে। তাঁর কাছে সব খোঁজখবর নিলেন। ভোর থেকে যা-যা ঘটেছে তার বিবরণ দিলেন অরবিন্দবাবু। মিঃ মহান্তি তাঁর নোটবুকে সব লিখে নিয়ে, মৃতদেহটি জিপে তুলে পুরী ফিরে গেলেন। পুলিশ-অফিসার যেতে না যেতেই জেলে-সর্দার সুমিন উত্তেজিত গলায় অরবিন্দবাবুকে যা বলল তা রীতিমত চমকপ্রদ। মরা মানুষটার গায়ে সে মাছের মতো আঁশ দেখতে পেয়েছে। তা ছাড়া, তার নাকের দুটো ফুটোয় ছিল চামড়ার ঢাকনি। যেন নাকে জল না ঢোকে। জেলে-সর্দার তার ষাট বছরের জীবনে এরকম মানুষ দেখেনি। তার দৃঢ় বিশ্বাস, মাছের মতো পাখনা আছে লোকটির। জামা খুলে দেখলেই সেটা ধরা পড়বে।

অরবিন্দবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। কলকাতায় তাঁর নিজের বাড়িতে ছোটখাটো যে লাইব্রেরিটি তিনি গড়ে তুলেছেন, সেখানে আছে বিবর্তন নিয়ে দুষ্প্রাপ্য বেশ কিছু বই ও পুঁথি। এরকম মানুষের বিবরণ তিনি কোনও বইয়েই পাননি। বিচিত্র শারীরিক গঠন নিয়ে কোনও কোনও মানুষ জন্মায় বটে, কিন্তু আজ যে-মানুষটির নমুনা তিনি চাক্ষুষ দেখলেন, তাকে প্রকৃতির সে-রকম একটা খামখেয়ালিপনা বলে মেনে নিতে তাঁর মন রাজি নয়। এরকম একটা মানুষ আকস্মিকভাবে জন্মায়নি বলেই তাঁর সন্দেহ। তবে, নিছক সন্দেহই। প্রমাণ কিছু নেই। দেখা যাক, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট কী বলে।

পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে যা পাওয়া গেল, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। পোস্ট মর্টেম করেছিলেন ডাঃ রমেন গাঙ্গুলি। তিনি অরবিন্দবাবুকে চিনতেন। জানতেন, বিচিত্র সব ব্যাপারে অরবিন্দবাবুর আগ্রহ আছে। আগ্রহ আছে বলেই, বাড়িতে তিনি একটি ল্যাবরেটরি ও মিউজিয়মও তৈরি করে নিয়েছেন। পুরীতে নেমে, জেলেদের গ্রামে ছুটি কাটাতে যাবার আগে অরবিন্দবাবুও প্রতিবার ডাঃ গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা করে যান। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আর এবার পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটি নিয়ে ডাঃ গাঙ্গুলি সরাসরি অরবিন্দবাবুর কাছে উপস্থিত হলেন।

"দারুণ ব্যাপার মশাই। নিজে না দেখলে বিশ্বাস হ'ত না।"

ডাঃ গাঙ্গুলিকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। ওঁকে আরও কোনও ভূমিকা করতে না দিয়ে অরবিন্দবাবু বললেন, "কী দেখলেন আগে সেটাই শুনি।"

"ছেলেটির কাছে দু'জোড়া ফুসফুস। এমন অবস্থায় তাকে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয় যে, তার জন্যই এই বাড়তি ফুসফুসের ব্যবস্থা। আমাদের ফুসফুস শুধু বাতাস থেকেই অক্সিজেন নিতে পারে। কিন্তু ছেলেটির আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম। ভাবা যায় না। ঘাড়ে পালকের মতো বড়-বড় রোঁয়া। মনে হয়, জলের গভীরে সরাসরি অক্সিজেন নিয়ে এই রোঁয়াগুলো সেই অক্সিজেন পাঠিয়ে দেয় রক্তকণিকায়। হৃৎপিণ্ডও দেখলাম একেবারে নতুন ধরনের। সেখানে সাড়ে চারটি চেম্বার। অর্থাৎ মানুষের হৃৎপিণ্ডের থেকেও জটিল এই হৃৎপিণ্ড। নাকের ফুটো দিয়ে জল যাতে শরীরে না ঢোকে তার জন্য নাকে ঢাকনি দেওয়া আছে। ডাঙায় উঠলে আবার এই পাতলা চামড়ার ঢাকনিটা নিজে থেকেই ভিতরে গুটিয়ে যায়।"

জেলে-সর্দারের কথাটা মনে পড়ে গেল অরবিন্দবাবুর। সেও নাকে ঢাকনির কথা বলেছিল। ডাঃ গাঙ্গুলির কথা অবশ্য তখনও ফুরিয়ে যায়নি। ডাঃ গাঙ্গুলি কী বলছেন, শোনা যাক। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন অরবিন্দবাবু।

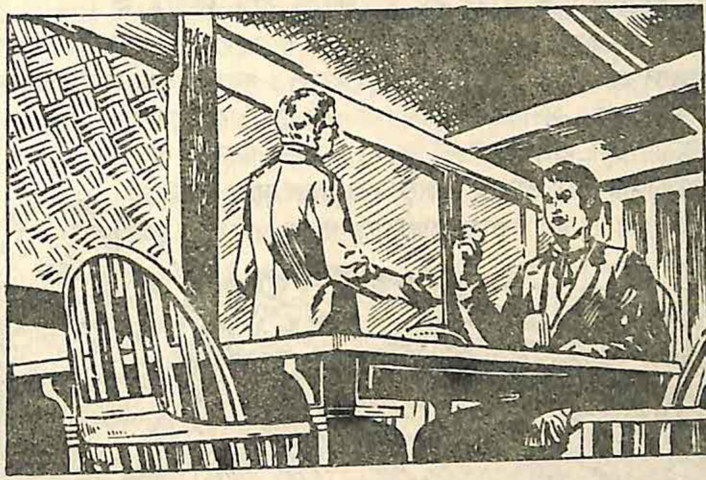
"ছেলেটির চোখ দুটোও অদ্ভুত। চোখ দুটো এমনই যে, কোথাও কোনও ধ্বনি বা প্রতিধ্বনি উঠলে এই চোখের তারায় ধরা পড়ে। চোখের পাতা নেই। আশেপাশে সূক্ষ্ম রাসায়নিক কোনও পরিবর্তন ঘটলে কিংবা অন্য কোনও প্রাণী নিঃশব্দে এসে উপস্থিত হলে এই চোখ দুটো তার সঙ্কেত দেয়।"

"তার মানে, তুমি বলতে চাও ছেলেটি জলের নীচে থাকত। ওর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো এমনই যে, জলের নীচে বাস করতে ওর কোনও অসুবিধাই হ'ত না।

"নির্দিষ্টভাবে আমি কিছু বলতে চাই না। উভচর প্রাণীরও কিছু শারীরিক লক্ষণ ওর মধ্যে দেখেছি। তবে এটা ঠিক, জলের নীচে থাকতে হলে শরীর বিশেষভাবে তৈরী হওয়া দরকার এবং ছেলেটির শরীর ঠিক সেইরকমই।"

"ডেডবডি কি পুলিশের হাত তুলে দিয়েছ ?"

"হ্যাঁ। তবে মিঃ মহান্তিকে অনুরোধ করেছি, তিনি যেন ডেড বডিটা বরফে জমিয়ে রাখেন। আমার মনে হয়, আরও খুঁটিয়ে দেখা দরকার। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে এরকম একটা জটিল মানুষ জন্মাতে পারে বলে আমার মনে হয় না।"



"তুমি বলছ, কেউ তাকে তৈরি করেছে ?"

"অসম্ভব নয়। তবে হাতে যখন প্রমাণ নেই তখন এটা বলি কী করে। এটা কোনও ইঞ্জিনিয়ারের সৃষ্টি হলে আমি অবাক হব না।"

"ইঞ্জিনিয়ার্ড ম্যান ? বলো কী !"

"ঠিক তা-ই। আপনি তো জানেন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারদের অসম্ভব কিছু নেই।"

"জিন নিয়ে গবেষণা কি এতদূর এগিয়েও গিয়েছে ? এগিয়ে গেলেও আমরা তার খোঁজখবর পাইনি ?"

"ওই ছেলেটার শরীর আরও চুলচেরা বিশ্লেষণ করুন। দেখবেন আরও অনেক কিছু জানতে পারবেন। ভবিষ্যতের মানুষের একটা প্রজাতি কেমন হবে তার অভ্রান্ত হদিস ওই ডেড বডির মধ্যে লুকনো আছে। তুতানখামান-এর রত্নভাণ্ডারের থেকেও দামি ওই ডেড বডিটা। আপনি একবার নিজে গিয়ে দেখুন।"

ডাঃ গাঙ্গুলির সঙ্গে কথা বলতে বলতে একসময় সন্ধে নেমে এসেছে। দুপুর থেকেই দু'জনে আলোচনা শুরু করেছিলেন। মাঝখানে অরবিন্দবাবু লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়েছেন। বারদুয়েক উঠে স্টোভ জ্বালিয়ে তৈরি করেছেন কালো কফি। কফির কাপে চুমুক দিতে-দিতে আবার দুজনেই গভীর আলোচনায় ডুবে গিয়েছেন। বুঝতে পারেননি, সন্ধেও প্রায় ফুরোতে চলল। ডাঃ গাঙ্গুলির ফেরার সময় হয়েছে। বাইরে জিপ দাঁড়িয়ে। ওকে জিপে তুলে দিয়ে সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালেন অরবিন্দবাবু। মাথার উপর সুবিস্তৃত আকাশ আর নক্ষত্রপুঞ্জ। নীচে কালো সমুদ্র। অরবিন্দবাবুর মনে হ'ল, তিনি আদিম এক প্রকৃতির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। এই প্রকৃতির অনেক রহস্য আজও রহস্যই থেকে গেছে। মানুষ কয়েক হাজার বছরের চেষ্টায় এখন পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি রহস্যের জট খুলতে পেরেছে। আবার মানুষ নিজেও কম রহস্য সৃষ্টি করছে না। ওই রকমই একটি রহস্যের জাল তাঁর মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু অরবিন্দবাবুর আপাত প্রশ্ন মাত্র দুটি। কে সৃষ্টি করল ওই উভচর মানুষ ? আর এখানেই বা সে এল কী করে ?

অরবিন্দবাবু লক্ষ্য করেননি, অন্ধকারে এক ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার কথা শুনে প্রথমে তিনি চমকে উঠেছিলেন। তারপর বুঝতে পারলেন, সুমিন-সর্দার ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চায়।

"আমি সব কথা শুনেছি বাবু। ডাক্তারবাবু তোমাকে যা বলে গেল, সব আমি দাওয়ায় বসে শুনেছি। তোমরা আমাকে দেখতে পাওনি। আমি তো বলেছি বাবু, ওটা মাছ-মানুষ। জ্যান্ত ধরা পড়লে ভাল হ'ত। তা হলে ওর কথা আমরা শুনতে পেতাম।"

"ও যে মানুষের ভাষায় কথা বলে, সেটা কি ধরে নেওয়া ঠিক হবে ? জলের নীচে ঠোঁট নেড়ে ডাঙার মানুষের মতো কথা বলা যায় না। কথা শোনাও যায় না। ওই মানুষের হয়তো নিজস্ব ভাষা আছে।"

"ডাঙার মানুষের ভাষাও সে জানে বাবু। আমার তা-ই মনে হয়। ডাঙায় তো ওদের আসতে হবেই।"

এই কথাটাই এখনও স্পষ্ট নয় অরবিন্দবাবুর কাছে। সমুদ্রের নীচে যদি কেউ কোনও কলোনি বা উপনিবেশ গড়ে তোলে, তা হলে তাকে পৃথিবীর ভাষা জানতে হবে কেন ? শরীরটাকেই যখন সে জলের নীচে বসবাসের উপযোগী করে নিয়েছে, তখন ভাষা কি আর সে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে না ! সুমিন সর্দারকে নয়,

অরবিন্দবাবু এবার নিজের মনেই বিড়বিড় করে উঠলেন, ওরা মাছ-মানুষ নয়, জলের মানুষ। আর কেউ যদি সত্যিই ওরকম মানুষ তৈরি করে থাকে, তা হলে সে নির্ঘাত মানুষের প্রয়োজন মেটাতেই অন্যান্য প্রাণীও সৃষ্টি করবে। শুধুমাত্র বিশেষ কয়েকটা মানুষের সৃষ্টি করেই সে হাতগুটিয়ে বসে থাকবে না।

অরবিন্দবাবুর অনুমান যে অমূলক নয়, কয়েকদিন পরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। মাইল-বিশেক দূরে ধরমপুরে ভোর রাতে জেলেদের জালে হঠাৎ এক কিম্ভূত প্রাণী ধরা পড়ল। খবর পাওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ সেখানে দৌড়লেন অরবিন্দবাবু। সঙ্গে সুমিন সর্দার। সুমিনই পথ দেখিয়ে তাঁকে সেখানে নিয়ে গেল। অরবিন্দবাবু যা দেখলেন, তার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এ তাঁর কল্পনার বাইরে।

বিশাল এক জলজন্তুকে জেলেরা ডাঙায় টেনে তুলেছে। জালে ধরা পড়ার সময় জন্তুটাকে যতটা ভারী মনে হয়েছিল, পরে দেখা গেল তা নয়। জালে আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে জড়িয়ে ডাঙায় তোলার জন্য কয়েকজন জেলে



একসঙ্গে হাত লাগিয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল, একজন জাল ধরে টানতেই জন্তুটা সুট্ করে ডাঙায় উঠে এল। বড় কথা, জন্তুটা এখনও প্রাণে বেঁচে আছে। সুমিন গিয়ে গা টিপে-টিপে দেখল। তাতে অবশ্য জন্তুটার আপত্তি দেখা গেল না। ওয়ালরাস বা সিন্ধুঘোটকের মতো চেহারা। চারটে পা। মাছের লেজের মতো লেজও আছে একটা। দেহের অনুপাতে চোখ দুটো খুবই ছোট। সুমিন আবার ওর গায়ে একটা খোঁচা দিতেই সে নড়েচড়ে উঠল। শুধু নড়েচড়েই উঠল না, ওজনও খানিকটা কমিয়ে নিল।

"দেখলেন বাবু, বেলুনের মতো হাওয়া ভর্তি শরীর। ভুস্ করে হাওয়া বেরিয়ে গেল। চোখের সামনে দেখুন, কেমন চুপসে যাচ্ছে।"

অরবিন্দবাবুর অবশ্য তখন এসব কথা কানে ঢুকছে না। তিনি দেখলেন, জেলেদের ছোট ছেলে তামরু সমুদ্রের শ্যাওলা জন্তুটার মুখে গুঁজে দিতেই, সে কচ্‌মচ্ করে তা চিবোতে লাগল। তিনি আরও দেখলেন, দুগ্ধবতী গাভীর যেমন বাঁট থাকে, এই জন্তুর সেরকম বাঁট আছে। পলিথিনের নলের মতো দেখতে কয়েকটা নল সেই বাঁটে লাগানো। নলের মুখে বসানো আছে কল। অরবিন্দবাবু এটাও বুঝলেন যে, এই জন্তু ডাঙাতেও বেঁচে থাকে। তা না হলে, এতক্ষণ বেঁচে আছে কী করে?

জন্তুটাকে জুওলজিস্টদের হেফাজতে পাঠিয়ে, তার যত্নআত্তির ব্যবস্থা করে অরবিন্দবাবু ডেরায় ফিরে এলেন। নিজের হাতে তিনি এখানে রান্না করে খান। কেরোসিন স্টোভ, প্রেশার কুকার, হাঁড়িকুড়ি, কড়াই মিলে ছোটখাটো একটি হেঁসেল-ঘরই তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। কোনও ব্যাপারেই তিনি অগোছালো নন। একটা ইকমিক কুকারও সঙ্গে এনেছেন। এখন কাঠকয়লার আগুনে ইকমিক কুকারেই খিচুড়ি চাপিয়ে দিলেন। প্রতিদিনই তিনি সমুদ্রে স্নান করেন। আজ পাতকুয়ো থেকে বালতি দিয়ে জল তুলে স্নান করেন। তারপর পাজামা ও পাঞ্জাবী পরে ফিটফাট হয়ে খেতে বসলেন। গরম খিচুড়ি আর ডিমভাজা। সঙ্গে আলুসেদ্ধ খাওয়ার দিকে আজ তাঁর একেবারেই মন নেই। খেতে-খেতে জানলা দিয়ে চোখ চলে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। দুপুরে হাওয়ার দাপট বাড়ে, সেই সঙ্গে দাপট বেড়ে যায় ঢেউয়েরও। ফুঁসে ওঠে সমুদ্র। ঢেউয়ের গর্জনে গর্জনে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। ঘরের পাশে খেলার মাঠে কখন জিপ এসে থেমেছে, অরবিন্দবাবু তাই তা টের পাননি।

জিপের শব্দ ঢেউয়ের শব্দে চাপা পড়ে গিয়েছিল। ডাঃ গাঙ্গুলি ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে বছর পঁয়ত্রিশের ছিপছিপে এক ভদ্রলোক। মাথার চুল অবিন্যস্ত। পথের লাল ধুলোয় গায়ের উরস্টেড কোটও রক্তিম আভা ধারণ করেছে। ভদ্রলোকের চেহারাটাও কেমন যেন উশকোখুশকো।

"আগে ওর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। বয়সে ও আমার থেকে অনেক ছোট হলেও, আমার বন্ধুই বলতে পারেন। ওর সঙ্গে আমার আলাপ চণ্ডীগড়ে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস-এ। আমি তখন চণ্ডীগড়ে একটা সেমিনারে গিয়েছিলাম। কেম্পিয়াও তখন ছুটিতে আমেরিকা থেকে কয়েকদিনের জন্য ওখানে এসেছিল। দারুণ ছাত্র। এম· আই· টি· ও প্রিন্সটনে সেলুলার অ্যান্ড মলিক্যুলার বায়োলজি নিয়ে গবেষণার পর ও এখন ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন বৃত্তি পেয়েছে। জিন-এর ওপর কাজ করছে। বিজ্ঞানী হিসেবে এই বয়সেই বেশ নাম করেছে কেম্পিয়া।"

"বোসো, বোসো। ভালই হ'ল। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আলোচনা করা যাবে," অরবিন্দবাবু কেম্পিয়া ও ডাঃ গাঙ্গুলিকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন। বয়স মানুষকে একটা বাড়তি সুবিধে দেয়। অরবিন্দবাবুরও তাই হয়েছে। কেম্পিয়া নামীদামি বিজ্ঞানী হলেও, বয়সে তাঁর থেকে ছোট বলে তিনি তাঁকে প্রথমেই 'তুমি' বলে সম্বোধন করলেন। তুমি বলে কাউকে সম্বোধন করলে, একটা স্নেহের সম্পর্কও তার সঙ্গে সহজেই পাতানো যায়। কেম্পিয়ার অবশ্য এ-ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেখা গেল না। ওকে ভেতরে-ভেতরে বেশ অস্থির বলেই মনে হ'ল আর সেই অস্থিরতা প্রবীণ অরবিন্দবাবুর চোখ এড়িয়ে গেল না।

"তা কী মনে করে এখানে?" অরবিন্দবাবু একদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বললেন।

কেম্পিয়ার হয়ে উত্তর দিলেন ডাঃ গাঙ্গুলি, "হঠাৎ খবর পেলাম ও দিল্লি এসেছে। তখনই ওকে টেলিগ্রাম করলাম। অদ্ভুত যে মৃতদেহটি পাওয়া গিয়েছে, সে-কথা জানিয়ে ওকে অবিলম্বে আমার কাছে চলে আসতে বলেছিলাম। টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্রই ও প্লেনে ভুবনেশ্বর হয়ে পুরী চলে এসেছে। আমিও ওকে আপনার কাছে নিয়ে এলাম।"

অদ্ভুত মৃতদেহ কিংবা সকালে পাওয়া বিচিত্র জন্তুটি নিয়ে আলোচনার চেয়েও এই মুহূর্তে অরবিন্দবাবুকে অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহী দেখা গেল।

"দিল্লিতে কবে এসেছ? ছুটিতে নাকি? বাড়ি কোথায়?

"বাড়ি ওর বাঙ্গালোরে। তবে দিল্লিতে সায়েন্স কংগ্রেসের কাজে এসেছে। আবার কয়েকদিন পরেই ফিরে যাবে। আমি ভাবলাম মৃতদেহটা ওর দেখা দরকার। বিশেষ করে ও যখন এই লাইনেই কাজ করছে।" ডাঃ গাঙ্গুলি কথা বলছেন কেম্পিয়ার হয়ে। মাঝখানে কেম্পিয়া নিজে কী যেন বলার চেষ্টা করল। কিন্তু ডাঃ গাঙ্গুলি তাকে থামিয়ে দিয়ে ওর মুখপাত্র হয়ে উঠলেন।

"তোমার বন্ধুটি বোধহয় নিজে কিছু বলতে চায় না? দিল্লি থেকে এতটা পথ উড়ে এসে ওকে কাহিল দেখাচ্ছে।" অরবিন্দবাবু মৃদু হেসে গাঙ্গুলিকে বললেন। কথাটা শুনে কেম্পিয়া নড়েচড়ে বসল। মনের অস্থিরতা সে কিছুতেই গোপন করতে পারছে না।



"ডেডবডিটা আমি দেখতে চাই। তা ছাড়া এ-নিয়ে আপনার কোনও ফাইন্ডিং আছে কি না সেটাও আমার জানা দরকার।" কেম্পিয়া অনেকক্ষণ পরে মুখ খুলল।

"ডেডবডি তো আমার হেফাজতে নেই। তুমি বরং পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করো। আর আমার ফাইন্ডিং যদি কিছু থেকেও থাকে তা আমি তোমাকে জানাতে যাব কেন? যা বলার তা পুলিশকেই বলব। প্রথম আলাপেই কি সব কথা বলা যায়?" অরবিন্দবাবু সচরাচর কাউকে কড়া কথা বলেন না। কালেভদ্রে যদি সে-রকম কথা কাউকে বলেনও, তা হলেও গলার নরম সুরটি কিন্তু অবিকৃতই থাকে।

"আমি আশা করি, বিজ্ঞানের স্বার্থে আপনি আমাকে সব কথা জানাবেন।"

"বিজ্ঞানের স্বার্থে?"

"যদি বলি ভারতীয় বিজ্ঞানের স্বার্থে?"

"ভারতীয় বিজ্ঞান, নাকি ভারতীয় বিজ্ঞানীর কথা ভেবেই আমাকে সব কথা বলতে হবে। দাবিটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না কি?" কথাটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন অরবিন্দবাবু। ভারতীয় বিজ্ঞানের স্বার্থ বলতে ঠিক কী বোঝাতে চাইছে কেম্পিয়া? আজ সকালে অদ্ভুত যে জন্তুটা ধরমপুরে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে, তার কথাও অরবিন্দবাবু বেমালুম চেপে গেলেন। কেম্পিয়া যেরকম ছটফট করছে, তাতে হয়তো সে

নিজেই কিছু কথা কবুল করে বসবে। অরবিন্দবাবু একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, "আমি একটা অসমাপ্ত সভ্যতা আবিষ্কার করতে চলেছি। কেউ হয়তো ভাবছে জলের নীচে নতুন এক সভ্যতা গড়ে তোলা যায়। চাষবাসের জমি, খনি বিদ্যুৎ, গৃহপালিত পশু কোনও কিছুরই অভাব থাকবে না সেখানে। আমি সেই সভ্যতার দুটি নিদর্শনের পরিচয় পেয়েছি। একটি মানুষ, অন্যটি গৃহপালিত পশু। পশুটিকে ঠিক কী বলব বুঝতে পারছি না। সামুদ্রিক গোরু, যে দুধ দেবে? আমি যা অনুমান করছি, তা ভুল নয়। কিন্তু, প্রশ্ন হ'ল..."

"তার আগে বলুন, আপনি ওই সভ্যতাকে হাফ-ডান সিভিলাইজেশন বলে ধরে নিচ্ছেন কেন? যে ওই সভ্যতা সৃষ্টি করছে, সে কি মাঝপথে ইস্তফা দিয়েছে? সমস্ত ব্যাপারটাই তার এখনও এক্সপেরিমেন্ট-এর স্টেজে। এখনই শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক হবে?" অরবিন্দবাবুর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে উঠল কেম্পিয়া। তাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

"কোনও সিদ্ধান্তেই আমি পৌঁছতে চাইছি না। আমি অন্য কথা ভাবছি। জলের নীচে যদি সভ্যতা গড়ে ওঠে, তা হলে সে-সভ্যতা কেমন হবে? একেবারে আদি যুগের মত অগ্নিহীন সভ্যতা? ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি না তো আমরা? আর জলের নীচে মানুষ কোনও ঋতু পরিবর্তন দেখতে পাবে না। আসলে কোনও ঋতুই সেখানে থাকবে না। একঘেয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই তাদের দিন কাটবে।"

অরবিন্দবাবুর কথায় কেম্পিয়াকে চিন্তিত মনে হ'ল। আপনি ঠিকই বলেছেন। ঋতু পরিবর্তন না থাকলে মানুষের জীবনেও তার ছাপ পড়বে। মানুষের জীবন হয়ে উঠবে বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু তার আগে বলুন, সেই মানুষটিকে কেমন দেখলেন?

"কার কথা বলছ?" না-বোঝার ভান করছেন অরবিন্দবাবু। নিশ্চল দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন কেম্পিয়ার চোখে।

"যার মৃতদেহ কয়েকদিন আগে এখানে পাওয়া গিয়েছে। যার পোস্ট মর্টেম করেছেন ডাঃ গাঙ্গুলি।"

"তা-ই তো বলছিলাম জলের নীচে সভ্যতার প্রথম নিদর্শন ওই মানুষ। কিন্তু তুমি আমাকে আমার সব কথা বলতে দাওনি। আমি ভাবছি, কোথায় এই সভ্যতার কেন্দ্র? কে ওই প্রাণ সৃষ্টি করেছে? এখানেই বা মৃতদেহটি ভেসে উঠল কেন? ছেলেটির মৃত্যুর কারণই বা কী? ডাঃ গাঙ্গুলি কিন্তু আমাকে ছেলেটির মৃত্যুর কারণ জানাননি।" পর পর কয়েকটা প্রশ্ন কেম্পিয়া ও ডাঃ গাঙ্গুলির দিকে ছুঁড়ে দিলেন অরবিন্দবাবু।

ডাঃ গাঙ্গুলি বললেন, "শ্বাসকষ্টে ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে। হয়তো জল থেকে ওঠার জন্যই তা হয়েছে।"

"কিন্তু তুমি তো বলেছ, উভচর প্রাণীর সব বৈশিষ্ট্যই ওর শরীরে আছে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু শ্বাসকষ্টই তার মৃত্যুর কারণ। কেন শ্বাসকষ্ট হ'ল তার কোনও শারীরিক লক্ষণ মৃতদেহে ফুটে ওঠেনি। অর্থাৎ আমি পাইনি। এমনও হতে পারে, স্রষ্টার পরীক্ষানিরীক্ষা পুরোপুরি সফল হয়নি। তাঁর নির্মাণকৌশলেই হয়তো কোথাও ভুল থেকে গিয়েছে। এটা একটা রহস্য, যার উত্তর আমি জানি না।"

"রহস্যভেদ করবে পুলিশ। অন্তত এটা তাদের কাজ। আমি তাই তো কেম্পিয়াকে পুলিশের কাছে যেতে বলেছিলাম। যদি ওর কোনও আগ্রহ থাকে। জিন নিয়ে যখন সে গবেষণা করছে, তখন আমার মনে হয় শারীরবিদ্যার দিক থেকে ব্যাপারটা ওর খতিয়ে দেখা উচিত।" অরবিন্দবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

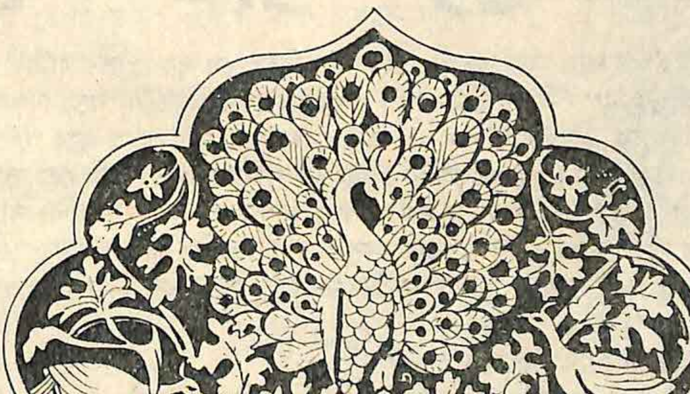
কেম্পিয়াকে নিয়ে ডাঃ গাঙ্গুলি চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন অরবিন্দবাবু। একসময় উঠে গিয়ে স্টোভ জ্বালালেন। কফি তৈরি করে ধূমায়িত মগটি নিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসলেন। জানলা দিয়ে বাইরে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, অস্থির ঢেউগুলো যন্ত্রণায় আছড়াচ্ছে।

কয়েকদিন পর ধরমপুর সমুদ্র-সৈকতে আবার কেম্পিয়ার সঙ্গে তাঁর দেখা হল। কেম্পিয়া বলল, "এমন একটা দিন আসছে, যখন মানুষ নিজেই তার বিবর্তনের রূপকার হয়ে উঠবে। নিজের ইচ্ছে ও প্রয়োজনমতো সেদিন সে তার শরীরের বিবর্তন ঘটাবে।"

"তাতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রকৃতিকে হয়তো আমরা অস্বীকার করতে চাই। তাই নিজেরাই নিজেদের বিবর্তনের রূপকার হতে চাইছি।" অরবিন্দবাবু বললেন।

"এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, যখন এই বিবর্তন ছাড়া আর উপায় থাকবে না।" কেম্পিয়া হাসতে-হাসতে বলল। প্রথম দিন যাকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছিল, সেই কেম্পিয়াকেই এখন বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে। ধরমপুরের নির্জন সৈকতে সেদিন সে কী করছিল, কেনই বা সে তখনও দিল্লি বা আমেরিকা ফিরে যায়নি, তা আর জিজ্ঞেস করতে যাননি অরবিন্দবাবু।

কিন্তু এর থেকেও তাঁর একটা বড় প্রশ্ন ছিল। স্রষ্টারা কেন নিজেদের আদলে নতুন পৃথিবীর মানুষ সৃষ্টি করছেন না? স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির এই তারতম্য কি নতুন পৃথিবীর মানুষ ভাল চোখে দেখবে?



মুনিয়ার বিল



সুধীন্দ্র সরকার

গাঁয়ের লোক পই পই করে মানা করল। এমন কী হরিহর, যে ওর দেশের বাড়ির খেতখামার দেখাশোনা করে সে বলল, মুনিয়ার বিলে যাবেন না। ওখানে চোরাবালিতে পা পড়ে বিপদ হতে পারে। তাছাড়া কী পাখি মারবেন, পাখিটাখি ওখানে আর নেই, সব মরে ভূত হয়ে গেছে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। গগন শুনল না। বরং বুক ফুলিয়ে বলল, আমি তো চোরাবালিতে নাচতে যাচ্ছি না, যে তলিয়ে যাব। অতবড় বিলে দু-একটা পাখি নিশ্চয় পাব। অনেকদিন বালিহাঁসের রোস্ট খাইনি বুঝলি!—তারপর দুহাত নাড়িয়ে বলল, তোরা বাপু আর বাগড়া দিস না! কতদিন পরে দেশের বাড়িতে এলুম বালিহাঁসের মাংস খাওয়ার জন্যে। তাছাড়া সঙ্গে যখন লুলু আছে ভয় কী? চোরাবালি ও ভালই চেনে, কী বলিস?

হেঁ হেঁ করে হেসে উঠল গগন।

লুলু লেজ নাড়ছিল পাশে দাঁড়িয়ে। অনেকদিন পরে মনিবকে কাছে পেয়ে ওর আনন্দ আর ধরে না।

হরিহরের মেয়ে পুঁটু ছাগলছানার সঙ্গে খেলা করছিল তখন। খেলতে খেলতে গগনের কথা কানে যেতেই দুম করে বলে ফেলল, লুলু নিজেই যদি চোরাবালিতে আটকে পড়ে, তখন কী হবে?

চোপ!—গগন রেগেমেগে মুখ ভেংচাল, যতবড় মুখ না, ততবড় কথা!—হরিহরকে লক্ষ্য করে ফের বলল, তোর মেয়েটা বড্ড ফোক্কর! লুলু আমার কুকুর, ওর কিছু হলে আমি বুঝব।

হরিহর মেয়েকে ধমকাল। পুঁটু কেঁদে ফেলল ভ্যাঁ করে। গগন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এয়ারগানটা কাঁধে নিয়ে পা বাড়াল বিলের দিকে। মিলিটারি কায়দায় ওঠানামা করতে লাগল ওর পা। লুলু ছুটল আগে আগে।

গগন পেছনে।

আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দুবার হোঁচট খেল গগন। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা মচকাল বোধ হয়। যন্ত্রণায় বসে পড়ল পা ধরে। শহরে থাকতে থাকতে গাঁয়ের পথে হাঁটাচলার অভ্যেস প্রায় ভুলেই গেছে। অথচ ছোটবেলায় এই আলের পথে কত না ছুটোছুটি করত। কতবার দৌড়ে দৌড়ে এই পথ ধরেই গেছে মুনিয়ার বিলে পাখি মারতে। প্রথম প্রথম গুলতিতে মারত। তারপর কলেজে পড়ার সময় এই এয়ারগান কাঁধে করেই এই পথে গেছে কতবার। সেই কলেজের ছাত্রাবস্থা থেকে লুলু ওর শিকারের সঙ্গী। তখন লুলু ছিল খুব ছোট।

অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছিল লুলু। মুখ ঘুরিয়ে পেছনে গগনকে না দেখে থমকে দাঁড়াল। এই হতভাগা অত জোরে ছুটছিস কেন?—ডান পাটা ধরে চিৎকার করল গগন। এমনভাবে কথাটা বলল যেন হোঁচট খাওয়ার জন্যে লুলুই দায়ী।

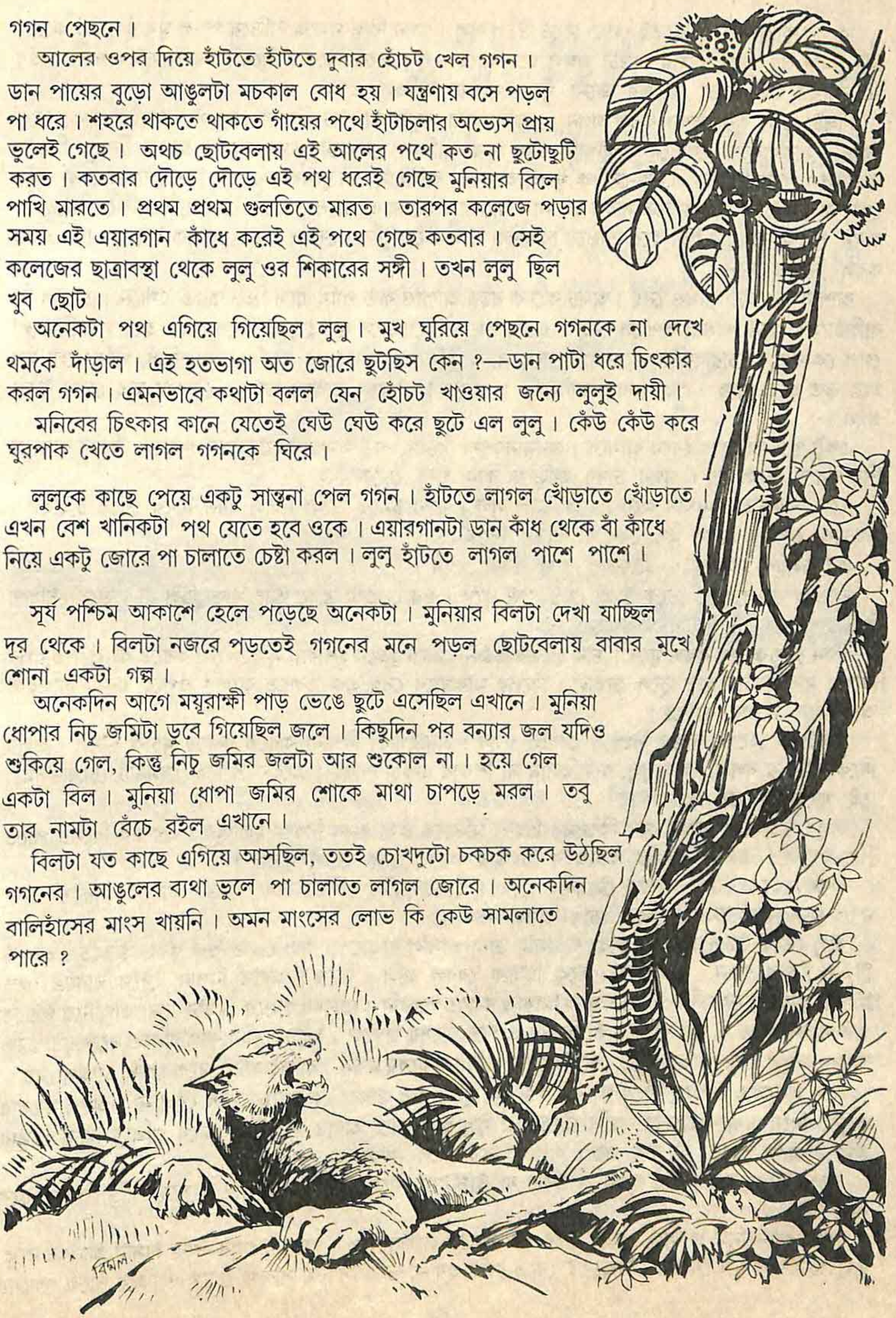
মনিবের চিৎকার কানে যেতেই ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল লুলু। কেঁউ কেঁউ করে ঘুরপাক খেতে লাগল গগনকে ঘিরে।

লুলুকে কাছে পেয়ে একটু সান্ত্বনা পেল গগন। হাঁটতে লাগল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। এখন বেশ খানিকটা পথ যেতে হবে ওকে। এয়ারগানটা ডান কাঁধ থেকে বাঁ কাঁধে নিয়ে একটু জোরে পা চালাতে চেষ্টা করল। লুলু হাঁটতে লাগল পাশে পাশে।

সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে অনেকটা। মুনিয়ার বিলটা দেখা যাচ্ছিল দূর থেকে। বিলটা নজরে পড়তেই গগনের মনে পড়ল ছোটবেলায় বাবার মুখে শোনা একটা গল্প।

অনেকদিন আগে ময়ূরাক্ষী পাড় ভেঙে ছুটে এসেছিল এখানে। মুনিয়া ধোপার নিচু জমিটা ডুবে গিয়েছিল জলে। কিছুদিন পর বন্যার জল যদিও শুকিয়ে গেল, কিন্তু নিচু জমির জলটা আর শুকোল না। হয়ে গেল একটা বিল। মুনিয়া ধোপা জমির শোকে মাথা চাপড়ে মরল। তবু তার নামটা বেঁচে রইল এখানে।

বিলটা যত কাছে এগিয়ে আসছিল, ততই চোখদুটো চকচক করে উঠছিল গগনের। আঙুলের ব্যথা ভুলে পা চালাতে লাগল জোরে। অনেকদিন বালিহাঁসের মাংস খায়নি। অমন মাংসের লোভ কি কেউ সামলাতে পারে?



বিলের কাছাকাছি পৌঁছতেই লেজ নেড়ে উঠল লুলু। গগন কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মুখ কাঁচুমাচু করে। হাঁটু সমান উঁচু ঘাসে বিলের পাড়টা জঙ্গল হয়ে আছে। লুলু মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছিল সেই জঙ্গলে। শুধু 'ঐ'-কারের মত খাড়া লেজের জন্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল ওকে।

বিলটা ভাল করে লক্ষ্য করল গগন। কচুরিপানার সবুজ কার্পেটে বিলের প্রায় সব জলটাই ঢাকা পড়ে গেছে। মাঝখানটায় যেখানে একটুখানি জল দেখা যাচ্ছিল, সেখানে পড়ন্ত সূর্যের আলো ঠিকরে ঠিকরে পড়ছিল। পাড়ে দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক খুঁজল অনেক। বালিহাঁস তো দূরের কথা, একটা শালিখের দেখা পর্যন্ত পেল না। পাড়ের বুকে হাঁটতে সাহস হল না। ঘাসের জঙ্গলের আড়ালে কোথায় চোরাবালি লুকিয়ে আছে কে জানে? এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিক ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল এবং অবাক হল খুব! বিড়বিড় করল নিজের মনে।

আশ্চর্য! একটা পাখিও নেই। অথচ কয়েক বছর আগেও কত পাখি এসে ভিড় করত এখানে। তাহলে কি বালিহাঁসের রোস্ট খাওয়া কপালে নেই? এতটা পথ ঠেঙিয়ে এসে শুধু হাতেই ফিরে যেতে হবে? পাখিগুলো গেল কোথায়? চোরাবালির ভয়ে পালিয়েছে, নাকি গুলিতে মরার ভয়ে? হরিহর বলেছিল, পাখিগুলো সব মরে ভূত হয়ে গেছে। তাই আবার হয় নাকি? আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে বোকার মত হেসে উঠল গগন।

একটু পরে অন্ধকার নেমে আসবে। জনমানবশূন্য বিলের পাড় থমথমে হতে শুরু করবে। উত্তুরে বাতাসে শিরশিরিয়ে উঠল গা। গগন চাদর জড়িয়ে কান গলা ঢেকে নিল।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা খানখান করে ডেকে উঠল লুলু। গগন চমকে উঠল। লুলু বাড়ি ফিরে যেতে চাইছিল। গগনকে ওখানে রেখে মুখ ফেরাল বাড়ির দিকে।

এই চললি কোথায়!—চিৎকার করে উঠল গগন।

দাঁড়িয়ে পড়ল লুলু, ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে। ওর লেজটা তখন আর খাড়া ছিল না। ভয়ে সেঁধিয়ে ছিল পেছনের পা দুটোর মাঝখানে।

গগন চুকচুক শব্দ করল মুখে। ডান হাতের তর্জনী ঠোঁটে ছুইয়ে ইশারায় লুলুকে চুপ করতে বলল। তারপর বিলের মাঝখানটায় হাত তুলে দেখাল। বিলের মাঝখানে সেই এক চিলতে জলের ওপরে একটা বালিহাঁস আপনমনে সাঁতার কাটছে।

হাঁসটাকে দেখেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গগন। এয়ারগানে নিশানা করতে করতে মুচকি হাসল। লুলুর দিকে তাকিয়ে বলল, দ্যাখ লুলু, বলেছিলাম না শিকার একটা পাবই। একেবারে ঠিক যেমনটি চেয়েছিলুম। তুই খামোখাই ভয় পাচ্ছিস!

লুলুর চাহনিতে কেমন যেন বিস্ময়ের চিহ্ন। মনিবের কথা শুনে বিরক্ত হল খুব। একবার বিলের পাড়ে গিয়েই ফিরে এল। তারপর কানফাটা চিৎকার করে ডেকে উঠল দু'বার।

গগন ধমকে উঠল, ফালতু চেঁচাচ্ছিস কেন? হাঁসটা যদি পালিয়ে যায়? উড়ন্ত হাঁসকে মারতে পারব নাকি?—এয়ারগানের মাছিতে চোখ রাখল গগন।

লুলু ডেকে উঠল আবার। চকিতে হাঁসটা ডানা ভাসাল বাতাসে। জল ছেড়ে শুরু করল উড়তে। হঠাৎই ট্রিগার টিপল গগন। এয়ারগান থেকে ছিটকে বেরল গুলি। নিজের অব্যর্থ নিশানা দেখে ঘাবড়ে গেল নিজেই। আগে কোনদিন উড়ন্ত বস্তুকে আঘাত করতে পারেনি। চোখের পলকে হাঁসটা ডানা ঝাপটিয়ে পড়তে শুরু করল গোঁত খাওয়া ঘুড়ির মত, বিলের ওপারে ঘাসের জঙ্গলে। হাঁসের ডানা ঝাপটানিতে নড়েচড়ে উঠল ঘাসের জঙ্গল। লুলু একনাগাড়ে ডেকে চলেছে খ্যাপা কুকুরের মতন। বালিহাঁসটার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

লুলু অনবরত ডাকছে দেখে গগন বিরক্ত হল খুব। এত ডাকার কি আছে ভেবে পেল না। আগে যতবার লুলুকে নিয়ে এখানে এসেছে, গুলি ছোঁড়ামাত্র লুলু ছুটে গেছে আহত শিকারকে মুখে ঝুলিয়ে নিয়ে আসার জন্য। আজ হঠাৎ কী হল ওর! পাগল হয়ে গেল নাকি?

লুলুর উদ্দেশ্যে চিৎকার করল, শিগগির যা, হাঁসটাকে নিয়ে আয়। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, বাড়ি ফিরতে হবে না?

কথা কানে নিল না লুলু। গরর গরর শব্দ করতে লাগল মুখে। গগন যতবার ওঁকে হাঁসটা আনতে বলে, লুলু অন্যদিকে মুখ ফেরায়। কিছুতেই যেতে রাজি হয় না ভয়ে সিঁটিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে গগনের

দিকে।

গগন ক্যাঁক করে একটা লাথি মারল লুলুর পেটে। কেঁউ কেঁউ চিৎকার করে দুপা পেছনে সরে গেল লুলু। অগত্যা এয়ারগানে চোখ রেখে টিপ করল লুলুর দিকে। লুলু আর দাঁড়াল না। মনিবের ইচ্ছেমত শুরু করল ছুটতে। পাড় ধরে বিলের ওপারে।

গগন পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে লুলুকে দেখতে গিয়েই যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে উঠল। ভুলেই গিয়েছিল পায়ে ব্যথার কথা। লুলুকে আর দেখা গেল না। ঘাসের জঙ্গলের আড়ালে লুলুর ছোট্ট শরীরটা ততক্ষণে হারিয়ে গেছে।

কুয়াশামাখা অন্ধকার নেমে এল মুনিয়ার বিলে। ঘন অন্ধকারে গগন একা। ইতিমধ্যে সময়ও গড়িয়ে গেছে অনেকটা। কোন পাত্তা নেই লুলুর। গগনের চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ। আগে তো কোনদিন এরকম হয়নি। এর আগে লুলু চোখের পলক পড়তে না পড়তে কতবার গুলি খাওয়া শিকারকে খুঁজে এনেছে।



গগন চিৎকার করে ডাকল, লুলু! লুলু!

কোন সাড়া এল না। শুধু লুলু শব্দটাই কানে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল ওর।

তবে কি কোন বিপদে পড়ল লুলু? এতক্ষণে তো ওর ফিরে আসার কথা। চোরাবালিতে তলিয়ে যায়নি তো? অজানা আশঙ্কায় মনটা হুহু করে উঠল গগনের। পুঁটুর কথা মনে পড়তেই টনটন করে উঠল বুক। সত্যি সত্যি লুলু যদি চোরাবালিতে আটকে পড়ে? ও তো যেতে চাইছিল না, গগনই ওকে মেরে ধরে পাঠাল।

একটু ইতস্তত করে লুলুকে খুঁজতে বেরল গগন। এয়ারগানটা লাঠির মত মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে পা বাড়াল সাবধানে। বিলের ওপারে গিয়ে খুঁজতে হবে লুলুকে। লুলু যদি চোরাবালিতে আটকে পড়ে, উদ্ধার করতে হবে তাকে।

অন্ধকারে সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। পাড় ধরে কয়েকপা হাঁটার পর থমকে দাঁড়াল গগন। মাথাটা হঠাৎ কেমন যেন ঘুরে গেল ওর। মনে হল, পাদুটো কে যেন নিচের দিকে টানছে। কেঁপে উঠল পা, টলে উঠল সারা শরীর। কিছুক্ষণ আচ্ছন্নর মত দাঁড়িয়ে রইল সামনের দিকে চেয়ে। ঝাপসা হয়ে উঠল দৃষ্টি। ওপারে ঘাসের জঙ্গলে তখন ঘন কুয়াশার আস্তরণ। হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। অবাক বিস্ময়ে গগন দেখল, বালিহাঁসটা যেখানে গুলি খেয়ে পড়েছিল, সেই আগাছার জঙ্গলের ওপর দাঁড়িয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে একটা বিরাটকায় বালিহাঁস। বালিহাঁসের আকার দেখে মনে ধাঁধা লাগল ওর। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাখিদের মত চেহারা! টের‍্যাডেকটিল, র‍্যামফোরিনকাস ইত্যাদি দৈত্যপাখিদের যুগ তো কবেই শেষ হয়ে গেছে! বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে হঠাৎ ডাইনোসররা কোত্থেকে আসবে? ও কি নিজে তাহলে সময়ের পেছনে চলে গেল?

অতিকায় বালিহাঁসের ডানার আন্দোলনে ঝড় উঠল মুনিয়ার বিলে। এবং সেইসঙ্গে শোনা গেল লুলুর কানফাটা চিৎকার। লুলুর ডাক শুনে চমকে উঠল গগন। দেখল, বালিহাঁসটার ঠোঁটের মধ্যে লুলু। চারপা ছুঁড়ে ছটফট করছে বেরিয়ে আসার জন্যে। লেজটা বালিহাঁসের ঠোঁটে আটকে, আর লুলু ঝুলছিল শূন্যে। ঠিক কাক যেমন করে নেংটি ইঁদুর ধরে। লুলুরও তখন সেই অবস্থা।

এগারগানটা নিশানা করল গগন। যদি দৈত্যহাঁসটা এয়ারগানের শব্দে চমকে গিয়ে লুলুকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু ট্রিগারে আর আঙুল ছোঁয়াতে হল না তার আগেই বিশালাকায় হাঁসটা লুলুকে ছেড়ে দিয়ে ঠোঁটটা বাড়াল গগনের দিকে। গগন একটু পেছনে হেলে গেল। দৈত্য বালিহাঁসটা তখন এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছিল ওর দিকে। বুকটা ধড়ফড় করে উঠল গগনের। আতঙ্কে ছুটে পালাতে গেল, কিন্তু পারল না। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল। পাদুটো কে যেন অনবরত পাতালের দিকে টানছিল ওর। হাঁসটা প্রায়ই কাছে এসে পড়েছে দেখে গোঁ গোঁ শব্দে জ্ঞান হারাল তখনি।

লুলু বিলের ওপার থেকে ফিরে এসেই দেখে মনিব চোরাবালিতে কোমর অব্দি ডুবে। ঘেউ ঘেউ চিৎকার করে, অচৈতন্য মনিবের জামা ধরে টানাটানি করেও যখন মনিবকে উদ্ধার করতে পারল না, তখনি ছুটে গেল গ্রামে। একটু পরেই হরিহরের সঙ্গে লুলু ফিরে এল লোকজন নিয়ে। গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় লুলু সে যাত্রায় গগনের প্রাণ বাঁচিয়েছিল বটে, কিন্তু বিলের ওপারের ঘাসের জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও গুলি খাওয়া বালিহাঁসের কোন সন্ধান পায়নি।



মিঃ এক্স



প্রণব সেন

কলিং বেলের শব্দ কানে যেতেই ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন ডঃ সুনীল রায়। বাইরে যারা দাঁড়িয়ে আছে কেউই তাঁর পরিচিত নয়। উনি অপেক্ষা করছিলেন মানসের জন্য। মানসের আসার সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ তাই উদ্বেগ বাড়ছিল। মানস এসেছে ভেবে দরজা খুলেছিলেন। কিন্তু তাকে দেখতে না পেয়ে বিরক্ত হলেন। অথচ যারা এসেছে তাদের অবজ্ঞা করে চলে যাওয়া যায় না। প্রশ্ন করলেন, বলুন আপনারা কি চান ?

পল্টু ওদের নেতা। ও উত্তর দিল, আপনি এ পাড়ায় নতুন এসেছেন তাই আমাদের চেনেন না। আমরা এ পাড়ায় খুবই পরিচিত। প্রত্যেক বছর বারোয়ারী গণেশ পুজো করি, তাই চাঁদা নিতে এসেছি।

—আমাকে কত দিতে হবে ?

—একশ টাকা।

—এত টাকা তো আমি দিতে পারব না।

—আপনি জানেন বাজার কত চড়া, এই বাজারে পুজোর খরচ চালাতে এই টাকা না দিলে যে চলবে না। উনি এই অদ্ভুত যুক্তি শুনে অবাক হয়ে গেলেন। প্রশ্ন করলেন, তবে পুজের খরচ কমাবার চেষ্টা করছেন না কেন ?

নীলুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল তার উত্তর, জ্ঞান না দিয়ে একশ টাকা ছাড়ুন। এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না, আমাদের অনেক কাজ আছে।

—একবার তো বলেছি একশ টাকা দিতে পারব না ? তবুও আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?

—এভাবে কথা বলবেন না। এত টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছেন অথচ আমরা টাকা চাইলে দিতে পারবেন না।

—আমার টাকা দিয়ে কি করব আর না করব, তার কৈফিয়েৎ কি আপনাদের দিতে হবে ?

পল্টুর মেজাজ একটু গরম হয়ে উঠল—চোখ রাঙিয়ে কথা বললে তার ফল ভোগ করতে হবে জেনে রাখুন। এ পাড়ায় থাকতে হলে পাড়ার ছেলেদের আব্দার রক্ষা করতে হবে।

—ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে আপনারা টাকা আদায় করতে পারবেন না।

—ঠিক আছে, আমরাও দেখছি টাকা আপনি দেন কিনা।

ওরা চলে যাবার জন্য পা বাড়ালে উনি দরজা বন্ধ করে দিলেন।

দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে। গায়ের জোর দেখিয়ে মানুষকে অপদস্থ করে টাকা আদায় করার চেষ্টা চলছে চারদিকে, সকলেই প্রতিবাদ করতে ভয় পায়। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। মানুষের এই ভয় আছে বলেই সমাজবিরোধীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বারোয়ারী গণেশ পুজো করতে কে বলেছে ? পুজো করা আসল লক্ষ্য নয়, মূল লক্ষ্য কি করে টাকা আদায় করা যায়।

ইজিচেয়ারে বসে এইসব কথা ভাবছিলেন ডঃ সুনীল রায়। উনি একজন বৈজ্ঞানিক, সম্প্রতি যন্ত্রমানবের সামাজিক ভূমিকা প্রসঙ্গে তাঁর গবেষণা সুধীজনের প্রশংসা লাভ করেছে।

কলিং বেলের শব্দ কানে যেতে চিন্তার ব্যাঘাত ঘটল। এবার নিশ্চয়ই মানস এসেছে। দরজা খুলে মানসকে দেখে প্রশ্ন করলেন, তুমি এত দেরি করলে কেন ?

—বাড়ি থেকে বেরিয়েছি ঠিক সময়, কিন্তু মাঝপথে এসে বাস থেমে গেল, কিছু ছেলে বাসে উঠে বলল, আপনারা নেমে যান, বাস আর চলবে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

ওরা বলল, আমাদের নেতাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, তারই প্রতিবাদে আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি।

বাস থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। রাস্তায় চলতে চলতে অনেকের মন্তব্য কানে এল, একজন ওয়াগন ব্রেকারকে পুলিশ ধরেছে তাতে অন্যায় কি হয়েছে ?

ডঃ রায় বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন মানসের কথা। এই ঘটনা শুনে উনি বুঝলেন সমাজটা ক্রমশ অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছে, এর হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বার করতে হবে।



কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ডঃ রায় বললেন, দেখ মানস, আমরা বিজ্ঞানের যে ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করছি, তাতে সাধারণ মানুষ কিভাবে উপকৃত হতে পারে ? শুধু মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের প্রশংসা বা তাদের প্রয়োজনের দিকে নজর দিলে চলবে না। বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে হবে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটাতে।

—আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

—যন্ত্রমানবকে দিয়ে আমরা অনেক দুরুহ কাজ করিয়ে নিই, আজ তাকে আমি অন্যভাবে ব্যবহার করতে চাই। এই কথা ভেবে আমি আমার গবেষণার বিষয়বস্তু ঠিক করেছিলাম। যন্ত্রমানবের সামাজিক ভূমিকার প্রসঙ্গ নিয়ে তুমি তো সে থিসিস পড়েছ।

—আপনি কাজ শুরু করুন, আমার পক্ষে আপনাকে যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব আমি নিশ্চয়ই করব।

—আমি তোমার কাছ থেকে এই আশ্বাসটুকু পেতে চেয়েছিলাম। তুমি যখন আমার মত সমর্থন করেছ, তবে আজ থেকেই আমরা কাজ শুরু করে দিই।

মানস কাজ করতে প্রস্তুত। ডঃ রায়ের মত একজন খ্যাতিমান বৈজ্ঞানিকের সহকারী হিসাবে কাজ করার সুযোগ সহজে পাওয়া যায় না। এই সুযোগ যে তার জুটেছে সেইজন্য সে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করল।

দিনের পর দিন কাজ চলছে, দিনরাত পরিশ্রম করতে কোন অসুবিধা নেই। মানস বাড়ি ফেরার কথা ভুলে গেছে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে পৃথিবীর অন্য সবকিছু ভুলে থাকতে পারে। একমাস পরিশ্রমের পর

যন্ত্রমানব তৈরি করেছে। পুরোপুরি মানুষের মত দেখতে, মানুষের সঙ্গে তফাৎ করা সহজে সম্ভব নয়।

ডঃ রায় পরীক্ষামূলকভাবে কাজে লাগানোর জন্য যন্ত্রমানবকে নির্দেশ দিলেন, আমাদের জন্য দু কাপ কফি করে নিয়ে এস তাড়াতাড়ি।

দশ মিনিটের মধ্যে কফি নিয়ে হাজির। ডঃ রায় যন্ত্রমানবের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে হ্যাণ্ডসেক করলেন। এইভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনে ওকে ব্যবহার করতে পারলেই পরিশ্রম সার্থক হবে।

দিন দুয়েক পরের ঘটনা। একদিন বিকেলে ডঃ রায় মানসের সঙ্গে গল্প করছেন, এমন সময় সদর দরজায় কারা যেন অবিরাম ধাক্কাধাক্কি করছে। উনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন, যন্ত্রমানবকে বললেন, তুমি দরজা খুলে দেখ তো কারা এসেছে।

যন্ত্রমানব দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের কি প্রয়োজন ?

—আপনি কে ? আপনাকে বলে কোন লাভ নেই।

—আমাকে বলতে পারেন, আমি এ বাড়িতে থাকি।

—আমার টাকা চাই।

—টাকা দেওয়া সম্ভব নয়, আর কেন টাকা দেব ?

ওরা কয়েকজন জোর করে ঘরের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতেই যন্ত্রমানব দরজা আগলে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলল, জোর দেখিয়ে কোন লাভ নেই, ভেতরে ঢুকতে আমি দেব না।



পল্টু পকেট থেকে ছুরি বের করে আক্রমণ করল, যন্ত্রমানবের তলপেট লক্ষ্য করে ছুরি চালাতেই পল্টু ছিটকে পড়ল দেয়ালে। সারা শরীরে বিদ্যুতের প্রবাহ খেলে গেছে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে শরীর। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি যেন নেই। পল্টুর অবস্থা দেখে দলের অন্য চারজন কিছুটা থমকে গিয়ে একসঙ্গে এগিয়ে গেল যন্ত্রমানবকে আক্রমণ করতে। একজন মুখে ঘুষি মেরে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। মুখটা যেন লোহার মত শক্ত, আঙুলের হাড় হয়ত ভেঙে গেছে। এই অবস্থায় কেউ আর ঘুষি মারার চেষ্টা করল না। আর তিনজন ওদের অবস্থা দেখে কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল।

যন্ত্রমানব এগিয়ে এসে দু হাতে দুজনকে কলার ধরে মাটি থেকে কিছুটা ওপরে তুলে ছুঁড়ে দিল। সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে পড়েছে, পায়ে চোট লেগেছে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পায়ে ভর দিতে পারছে না ঠিকমত। বাকি একজনকে তীব্র ঘুষি চালাতেই সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

এই অবস্থায় সকলেই ভয় পেয়ে গেছে। এমন শক্তিমান পুরুষের সঙ্গে মোকাবিলা করার কথা কোনদিন ওরা ভাবতে পারেনি। তাই পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে যন্ত্রমানব ঘরে ঢুকতেই ডঃ রায় বিপুলভাবে অভিনন্দন জানালেন, এই তো চাই, এমনভাবে ওদের শায়েস্তা করতে পারলে বাছাধনরা জোর-জুলুম চালানো বন্ধ করতে বাধ্য হবে।

এই খবর রটে যেতে বেশি দেরি হয়নি। এই অঞ্চলের অনেক মানুষ ছুটে এসেছেন ডঃ রায়ের কাছে। এতদিন পর সত্যিই একজন এ পাড়ায় এসেছে যে পাড়ার উঠতি মস্তানদের মোকাবিলা করার মত সাহস রাখে। কেউ জোরজুলুম বরদাস্ত করতে পারেননি, কিন্তু ভয় পেয়ে সব অত্যাচার বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। আজ যেন সকলেই মনোবল ফিরে পেয়েছেন।

নবীনবাবু বললেন, আপনার মত মানুষকে কাছে পেয়ে সত্যিই আমরা গর্বিত। আপনার সাহস আমাদের বুকে নতুন শক্তি এনে দিয়েছে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াতে পারলে তা সত্যিই মাথায় চেপে বসে।

মঙ্গলবাবু বললেন, আপনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তাতে বাছাধনরা কিছুটা ঠাণ্ডা হবে। সারা বছর ধরে শুধু টাকা দাও। আজ দুর্গাপুজো, কালে কালীপুজো, পরশু সরস্বতীপুজো, এমনকি এখন গণেশপুজো শুরু করেছে। টাকা না দিলে ভয় দেখায়।

সকলের অভিনন্দনের উত্তরে ডঃ রায় যন্ত্রমানবকে দেখিয়ে বললেন, আমাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে ওকে আপনারা অভিনন্দন জানান।

সকলে ওকে ঘিরে অনেক প্রশংসার কথা উচ্চারণ করলেন, সত্যিই আপনার অসীম সাহসের পরিচয় পেয়ে আমরা মুগ্ধ।

যন্ত্রমানব হেসে উত্তর দিল, আপনারা সকলেই যদি এগিয়ে আসেন তবে এই কাজে আমি আরো এগিয়ে যেতে পারি।

এই ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন চলে গেছে। বিকেলবেলায় ডঃ রায় মানস আর যন্ত্রমানবকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। পাড়ার পার্কে মানুষ কম আসে, বিশেষ করে সন্ধ্যে হয়ে এলে সকলেই ঘরের দিকে পা বাড়ায়। তিনজনে ঘাসের ওপর বসে গল্প করছে, এমন সময় পল্টু তার দল নিয়ে পার্কে হাজির।

আজ দলে আছে দশজন। চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। পল্টু চিৎকার করে বলল, আমাদের পুজো বন্ধ করে দিয়েছে এত বড় সাহস। আজ দেখি কার শক্তি আছে আপনাদের উদ্ধার করে।

যন্ত্রমানব হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেপরোয়া ঘুষি চালাতে শুরু করল। যন্ত্রমানবের শরীর থেকে আলোর রশ্মি বেরতে শুরু করেছে। সেই আলো ওদের চোখের ওপর পড়তেই চোখে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। সকলে মাটিতে শুয়ে পড়ে চোখে হাত দিয়ে ছটফট করছে।

যন্ত্রমানব বলল, দু ঘন্টা ধরে তোদের এই অবস্থায় থাকতে হবে। তারপর চোখে দেখতে পাবি। আর যদি কোনদিন বেয়াদপি করবি তো চিরকালের জন্য অন্ধ করে দেব।

যন্ত্রদানব রেগে গেলে শরীর থেকে এমন আলোর রশ্মি বেরিয়ে আসে, ডঃ রায় নিজেও ওয়াকিবহাল ছিলেন না। আজ নতুন জিনিস আবিষ্কার করতে পেরে নিজে যথেষ্ট খুশি। ওদেরকে এই অবস্থায় দেখে কেউ কেউ ছুটে আসছে। খবর রটে যেতে সময় লাগছে না, ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। দশজন মস্তানকে এত সহজে কিভাবে কাবু করতে পেরেছেন, এ প্রশ্ন সকলের মনে।

ওরা তিনজন উঠে চলে গেলেন বাড়িতে, এখন আর গল্প করা সম্ভব নয়।

এই খবর রটতে রটতে সংবাদপত্রের অফিসে গিয়ে পৌঁছেছে। সাংবাদিকরা ছুটে এলেন ডঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

ডঃ রায় জানালেন, এ কৃতিত্ব শুধু আমার প্রাপ্য নয়। আমরা তিনজন মিলে এই কাজ করেছি। তবে আমাদের সাথী মিঃ এক্স-এর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। ওর প্রশংসা করে আপনারা লিখবেন তাতেই আমরা খুশি।

মিঃ এক্স, মানে যন্ত্রমানবটির সঙ্গে সাংবাদিকরা কথা বললেন, ছবি তুলতে চাইলেন, কিন্তু মিঃ এক্স ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে রাজি হল না।

প্রতিটি সংবাদপত্রের পাতায় সংবাদ ছাপা হয়েছে। মিঃ এক্স-এর অসীম সাহসের জন্য সকলেই প্রশংসা করেছেন। এলাকার মানুষরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে এখন তাঁরা অনেক নিশ্চিন্তে পথে চলাফেরা করতে পারছেন, অনেক নিরাপত্তা ফিরে পেয়েছেন। পল্টুর দলের লোকেরা ভয় পেয়ে গেছে। ওদের পুরনো কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। সেদিন চোখের অসহ্য যন্ত্রণার কথা কেউ ভুলতে পারেনি। এখনও সেই কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে, বেয়াদপি করবি তো চিরকালের জন্য অন্ধ করে দেব।

এমন একজন মানুষকে নিয়ে সরকার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে। ওকে যদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ব্যবহার করা যায়, তবে সমস্ত মানুষ উপকৃত হবে। সরকারপক্ষের একজন মন্ত্রী এসে দেখা করলেন ডঃ রায়ের সঙ্গে। উনি প্রস্তাব দিলেন, মিঃ এক্সকে আমরা প্রশাসনের কাজে ব্যবহার করতে চাই। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে এমন একজন নির্ভীক মানুষের আজ বড় বেশি প্রয়োজন।

ডঃ রায় বললেন, যদি মিঃ এক্স রাজি হয় আমার কোন আপত্তি নেই।

—মিঃ এক্স আপনি কি রাজি আমার প্রস্তাবে ?

—এখনই ঠিক কিছু বলতে পারছি না, আমাকে ভাববার সময় দিন।

—ঠিক আছে আমি আপনাকে দিন সাতেক সময় দিচ্ছি, আপনি ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে জানাবেন।



উনি চলে গেলেন। মিঃ এক্স কি সিদ্ধান্ত নেবে তাই নিয়ে ডঃ রায় আর মানস আলোচনা শুরু করল। মানস বলল, অনেক মানুষের প্রয়োজনের কথা ভেবেই আমরা ওকে সৃষ্টি করেছি, আজ যখন সে সুযোগ পাওয়া গেছে তা হাতছাড়া করে কোন লাভ নেই।

ডঃ রায় মানসের যুক্তি মেনে নিলেন। সুতরাং মিঃ এক্সকে আরো দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করা হবে। এই কাজে সফল হলে সারা পৃথিবীতে এক আলোড়ন সৃষ্টি হবে। তখন ডঃ সুনীল রায় আর মানস বসু পৃথিবীর মানুষের কাছে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াবেন। এখন উজ্জ্বল আগামী দিনের কথা ভেবে দুজনের মনে নতুন আনন্দ দেখা দিল।

ডঃ রায় ওকে সব রকম আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য সারা শরীর বুলেটপ্রুফ পাত দিয়ে ঢেকে দিলেন। গুলি, বোমা এবার আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

নির্দিষ্ট দিনে সেই মন্ত্রী মিঃ এক্সের মতামত জানার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। মিঃ এক্স সম্মতি দেওয়ায় উনি আনন্দ প্রকাশ করলেন।

তবে প্রশাসনের কেউ কেউ আপত্তি তুলেছেন, এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে একজন অনভিজ্ঞ লোককে নিয়োগ করা ঠিক হবে না। কিন্তু তার উত্তরে মন্ত্রী বলেছেন, পরীক্ষামূলকভাবে আমরা এই কাজ করতে চাই। যদি উনি সাফল্য লাভ করতে না পারেন তবে অনায়াসে ওনাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

—এতদিন ধরে অভিজ্ঞ লোকরাই যখন কিছু করতে পারেননি, এখন ওনার পক্ষে কি করা সম্ভব তা কি অনুমান করা যায় না ?

—সুযোগ দিয়ে একবার দেখি, শুধু অনুমানের ভিত্তিতে একজনের যোগ্যতাকে ছোট করে দেখে কি লাভ ?

অবশেষে সকলেই একমত হলেন যে মিঃ এক্সকে নিযুক্ত করা হবে এক মাসের জন্য। যদি সফল হতে পারেন তবে মেয়াদ বাড়ানো হবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিঃ এক্সকে নিযুক্ত করা হল। ওনার জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডঃ রায় আর মানসকে ইচ্ছেমতো যাওয়া আসার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

মিঃ এক্স দায়িত্ব হাতে নিয়ে শুরু করলেন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযান। প্রতিদিন এক একটা ডেরায় হানা দেন, আর গ্রেপ্তার করে জেলে পোরেন। এইভাবে কাজ চলতে থাকায় শহরের সমাজবিরোধীরা ভয়ে তটস্থ হয়ে উঠেছে। সকলেই অবাক, কোথাও এতটুকু গোলমাল হয় না, অথচ গ্রেপ্তার হচ্ছে প্রতিদিন। তবে কি ওরা স্বেচ্ছায় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করছে ? সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য এই পথ বেছে নিয়েছে ?

মানুষ যেমন খুশি ভাবুক, কিন্তু আসল ব্যাপার অন্যরকম। মিঃ এক্সের অতর্কিত আক্রমণে সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এলে মিঃ এক্সের শরীর থেকে এক ধরণের জোরালো রশ্মি বেরিয়ে এসে প্রতিপক্ষের শরীরের সব শক্তি শুষে নেয়। সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে পড়ে যায় মাটির পুতুলের মত। তখন গ্রেপ্তার করার জন্য সঙ্গীরা এসে হাতে হাতকড়া পরিয়ে ভ্যানে তুলে নেয়।

কাজ চলছে । শহরের মানুষের জীবনে নিরাপত্তা ফিরে এসেছে । চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি শহরের বুক থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখন সংবাদপত্রে এই ধরণের কোন খবর থাকে না ।

চারদিকে আলোচনা চলছে, সত্যিই এতদিনে একজন যোগ্য মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে । যারা একদিন মিঃ এক্সের নিয়োগ নিয়ে বিরোধিতা করেছিলেন তারাই আজ সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করছেন ।

মিঃ এক্স এবার ঠিক করলেন বন্দর এলাকায় হানা দেবেন । এখানে সবচেয়ে বেশি জঘন্য কাজ হয় । পৃথিবীর অনেক দেশেই বন্দর এলাকাগুলিতে অন্ধকারের রাজত্ব গড়ে উঠেছে ।

আজ মিঃ এক্স কুড়িজন সঙ্গী নিয়ে ভ্যানে করে এগিয়ে চলেছেন, হঠাৎ একজন অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাবেন ?

মিঃ এক্স উত্তর দিলেন, পৌঁছলেই বুঝতে পারবেন কোথায় যেতে চাই ।

—আগে থেকে জানতে পারলে কাজের সুবিধা হয় ।

—আমার স্বভাবই এই । আগে থেকে জানিয়ে কোন কাজ করতে পারি না । আমি চাই অতর্কিত আক্রমণ করতে যাতে প্রতিপক্ষ মোকাবিলা করার কোন সুযোগ না পায় ।

—কিন্তু আমাদের জানাতে আপত্তি কোথায় ?

—না, কোন আপত্তি নেই । তবু একজন জানলে আর পাঁচজন জেনে যেতে পারে তাই গোপন করে রাখাই ভাল ।

অফিসার সন্তুষ্ট হলেন না মিঃ এক্সের কথা শুনে, তবু সরাসরি কিছু বলার সাহস পেলেন না ।

মিঃ এক্সের কাছে সংবাদ আছে আজ এই ঘাঁটি আক্রমণ করতে পারলে দশ লক্ষ টাকার চোরাই মাল ধরা পড়বে এবং আন্তর্জাতিক চোরাচালান দলের একটা অংশ যারা এখানে কাজ করছে তাদের ধরা সম্ভব হবে ।

গাড়ি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে গেছে । গাড়ি থেকে সবাই নেমে পড়লেন । মিঃ এক্স সকলকে নির্দেশ দিলেন তাঁকে অনুসরণ করার জন্য । একজন পুলিশ গুপ্তঘাঁটির পথ চেনে, সেই পথ দেখিয়ে চলেছে । অনেক অন্ধকার পথ ঘুরে ঘুরে অবশেষে হাজির হলেন সেই বাড়ির সামনে ।

দোতলা বাড়ির শেষ প্রান্তে একটা বড় ঘর, সেখানে দলের নেতা রাজাসাহেব ওরফে খোকন সরকার তার সাগরেদদের নিয়ে আলোচনা করতে ব্যস্ত । মিঃ এক্স আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরে খবর পৌঁছে গেছে ।

মিঃ এক্স সকলকে নির্দেশ দিলেন, আপনারা সতর্ক থাকুন যাতে কেউ পালিয়ে না যেতে পারে । আমি একাই ওপরে যাচ্ছি ।

দরজা খুলে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে ধাক্কা মারলো মিঃ এক্সকে । উনি পড়ে গেলেন মাটিতে । পড়ে যেতে যেতে পকেটে হাত ঢুকিয়ে সুইচ টিপে দিলেন । শরীর থেকে তীব্র রশ্মি বেরিয়ে আসছে, যারা ছুটে এসে জাপটে ধরতে চেয়েছিল, তারা মাঝপথে এসে থমকে গেল । চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না । হাঁটার জন্য শরীরে সামান্য শক্তিটুকুও হারিয়ে গেছে। সকলেই মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে ।

মিঃ এক্স উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিলেন, খোকনবাবু রিভলভার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করুন । না হলে আপনার অনুচরদের মতো আপনাকেও মাটিতে শুয়ে পড়তে হবে ।

সকলের দিকে তাকিয়ে খোকন বুঝতে পারছে না এত শক্তিমান মানুষগুলো কেমন করে অসহায় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল । অথচ এদের নিয়ে কত কাজ হাসিল করেছে । পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কাজ করেছে দিনের পর দিন ।

খোকন পালাতে চায়, কিন্তু দরজা মাত্র একটা সেই দিকেই দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ এক্স । গুলি চালাতে চালাতে পালিয়ে যাওয়ার কথা মনে হতেই খোকন মিঃ এক্সকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল । বুকে লেগে গুলিটা মাটিতে পড়তে দেখেই খোকন অবাক হয়ে গেছে ।

মিঃ এক্স বললেন, আপনি আমার কথা যখন শুনতে চাইছেন না, তখন আমার অস্ত্র প্রয়োগ করি, দেখি আপনি কেমন করে আমার হাত এড়িয়ে পালাতে পারেন ।

হঠাৎ কপালে আলো দপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল । খোকনের চোখ ঝলসিয়ে উঠেছে, যেন একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে। এত আলোর মধ্যেও সবকিছু অন্ধকার । এই অবস্থায় কোথায় পালাবে ?

মিঃ এক্স বারান্দায় নিচে দাঁড়িয়ে থাকা সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন, আপনারা ওপরে এসে সকলকে গ্রেপ্তার করুন ।

ঘরে ফিরে এসে দেখেন খোকন কি যেন হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কি খুঁজছেন ?—মিঃ এক্স জানতে চাইলেন।

—কিছু না।

—আপনাকে সব্‌ই বলতে হবে খোকনবাবু। আজ যখন সবাইকে ধরতে পেরেছি কথা বের করে নিতে বেশি সময় লাগবে না।

সকলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলেছেন। মিঃ এক্স ড্রাইভার কেবিনে বসে আছেন, পাশে সেই পুলিশ অফিসার। আজকের এই অভিযানের সাফল্যে উনি যথেষ্ট বিস্মিত।

উনি মিঃ এক্সের শক্তির রহস্য জানতে চান, তাই বললেন, আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করব, আপনি উত্তর দেবেন ?

—বলুন।

—আপনি কিভাবে এতগুলো মানুষকে হার মানালেন ? আপনি একটুকু আঘাত পেলেন না এই বা কি করে সম্ভব ?

—এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারছি না, আমি দুঃখিত।

—আপনি যদি আমাদের জানান তবে আমরাও এইভাবে সফল হতে পারব। আপনি নিশ্চয়ই চান আমরাও আপনার আদর্শ অনুসরণ করি।

—এই রাস্তা আপনাদের জন্য নয়, আর তাছাড়া আমার মত কাজ আপনারা কখনও করতে পারবেন না।

মিঃ এক্সের কাজে সাফল্য লাভ করার আসল সূত্রটি অজানা রয়ে গেল সকলের।

সংবাদপত্রের পাতায় এই বিরাট দলের সমস্ত গোপন কার্যকলাপ প্রকাশিত হয়েছে। খোকনের কাছ থেকে আরো কিছু মাতব্বরের হদিশ পাওয়া গেছে। তাদের ধরতে পারলে বন্দর এলাকায় সমস্তরকম চোরাকারবার বন্ধ করা সম্ভব হবে।

মিঃ এক্স আর দিন দশেকের মধ্যে সকলকে গ্রেপ্তার করে হাজতে পুরলেন। এক মাসের মধ্যেই মিঃ এক্স যোগ্যতা প্রমাণ করলেন।

মিঃ এক্সকে নিয়ে চারদিক তোলপাড় চলছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাংবাদিকরা ছুটে আসছেন। তাঁরা চান মিঃ এক্স সম্পর্কে পুরো তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু মিঃ এক্স কারোর সঙ্গে দেখা করতে রাজি নন। সকলকেই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যদি মিঃ এক্স সম্পর্কে কিছু জানতে চান, তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডঃ সুনীল রায় ও মানস বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

এই ঘোষণায় সকলে সন্তুষ্ট নন। সরাসরি মিঃ এক্সের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ না পেয়ে বাধ্য হয়ে ডঃ সুনীল রায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন অনেকে। কিন্তু কেউ তাঁর শক্তির আসল রহস্য সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেননি।

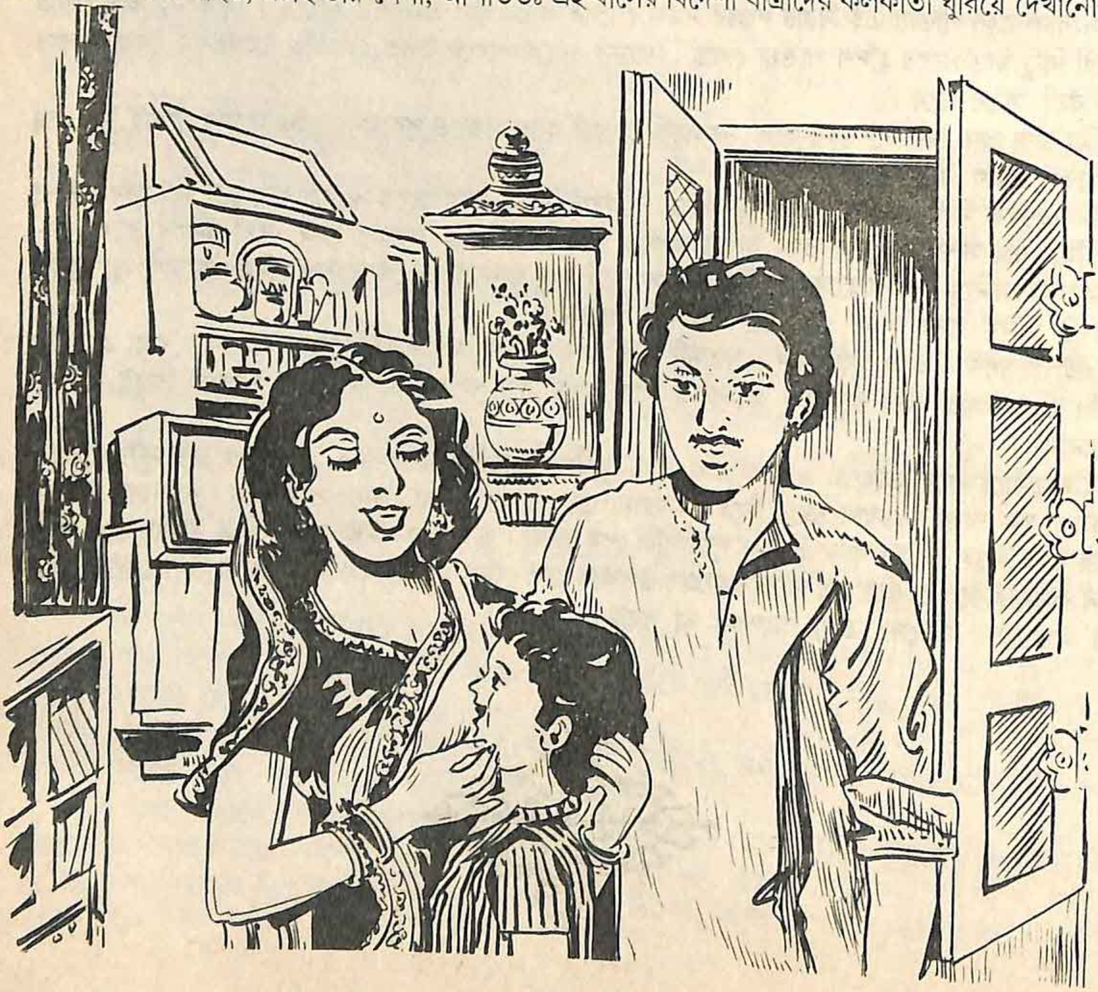
ইজিচেয়ারে বসে ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ সুনীল রায়। আচমকা ঘুম ভাঙতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, চোখ কচলে ঘরের কোণে তাকালেন। যন্ত্রমানব দাঁড়িয়ে আছে তাঁর দিকে চেয়ে। কাজ এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। ডঃ রায়ের ইচ্ছা যদি সত্যিই যন্ত্রমানবকে দিয়ে এমন কাজ করিয়ে নেওয়া যায় তবে সমাজের উপকার হতে পারে। এমন এক ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজে হাত লাগালেন মানসের জন্য অপেক্ষা না করে।

মাল্যবানের কলকাতা ভ্রমণ

— প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় —

"নমস্কার। কলকাতা নামক একটি বিখ্যাত শহরের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই। আজকে আমরা আবিষ্কারের চেষ্টা করব কলকাতা শহরকে। মনে রাখবেন, যদি আপনারা মাত্র এক ঘণ্টায় ভারতবর্ষকে দেখতে চান, তাকে বুঝতে চান কলকাতাই তবে সেই উপযুক্ত জায়গা। ইট্ ইস্ ইণ্ডিয়া ইন মিনিয়েচার। চারপাশে তাকিয়ে লক্ষ্য করুন, দেখতে পাবেন, আপনার দেখা অন্যতম দরিদ্র শহরটির নাম কলকাতা। চারদিকে ভিখিরি, লোকের ভীড়ে রাস্তা দেখা যায় না। একপাশে ডাঁই করা জঞ্জাল, নোংরা বাড়িঘর। তবুও কি অফুরন্ত প্রাণশক্তি কলকাতার মানুষের। এইসব কষ্টকেই তারা ভোগ করছে হাসিমুখে। সব কষ্টকেই তাঁরা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন। যদি আপনারা প্রশ্ন করেন, কলকাতার গোপন রহস্য কী, আমি বলব, রাস্তায় পথচলা যে কোনো একজনকে দেখুন, উত্তর পাওয়ার জন্য খুব বেশি সময় আপনার লাগবে না।"

সবেমাত্র তখন বাসটা গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে থেকে শহরের রাস্তায় পড়েছে। তার মধ্যে মাল্যবানের বাবা শান্তিময় সেন হাতে মাইক তুলে নিয়েছেন। লম্বা বাসটা ভর্তি বিদেশী মানুষজন, আর বাবা দাঁড়িয়ে আছেন ড্রাইভার আসনের ঠিক সামনে। তাঁর মুখটা বাসের যাত্রীদের দিকে ঘোরানো। মাল্যবানের বাবা কলকাতার একজন নামজাদা গাইড, এটাই তার পেশা, আপাততঃ এই বাসের বিদেশী যাত্রীদের কলকাতা ঘুরিয়ে দেখানোর



দায়িত্ব তাঁর । মাল্যবান সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ক্লাশ টুয়েলভ-এর ছাত্র । ওর মা সেই স্কুলেরই জীববিজ্ঞানের শিক্ষিকা । বাড়িতে বাবার মুখে বিদেশীদের কথা শুনতে শুনতে ওর একটা আগ্রহ জন্মেছিল ওদের খুব কাছ থেকে দেখার । বাবাই যখন গাইড, তখন আর সঙ্গে যেতে অসুবিধে কোথায় ? এখন ডিসেম্বর মাস, কয়েকদিন আগেই ওর পরীক্ষা হয়ে গেছে । কিন্তু কখনোই মুখ ফুটে বাবাকে বলতে পারেনি । একদিন বাবা যখন এসে মায়ের সঙ্গে গল্প করছিল, আগামী সপ্তাহে একটা টুরিস্ট-টিম আসছে কলকাতা দেখতে, আর বাবাই তাদের গাইড, তখন ও আর চুপ করে থাকতে পারেনি । রাত্তিরে খেতে বসে বাবাকে বলেই ফেলল কথাটা । শুনে বাবা খানিকক্ষণ অল্প হেসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন । মাল্যবান বেশ আগ্রহ নিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়েছিল, যদি তিনি ওর হয়ে কিছু বলেন । কিছুক্ষণ পর বাবাই বললেন—"ঠিক আছে, তোমাকে নিয়ে যেতে পারি । দু'দিন পরেই তো তোমার রেজাল্ট, যদি ফার্স্ট হতে পারো, তবেই তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে ।"

মাল্যবান তো জানতোই ও ফার্স্ট হবে । ঠিক তাই । ক্লাসে আন্টির কাছ থেকে রেজাল্টটা নিয়েই ও আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল । বন্ধুরা অবাক হয়েছিল, কারণ ও তো চিরকালই ফার্স্ট হয় । তবে এবছর এতো আনন্দের কি আছে ? কিন্তু মাল্যবান কি করে বোঝাবে ওদের ! রেজাল্টটা হাতে দিয়ে বাবাকে প্রণাম করতেই হাসিমুখে বাবা বলেছিলেন—"আগামী সোমবার সকাল সাতটার মধ্যে তৈরি হয়ে থেকো ।"

এই কারণেই মাল্যবান সম্ভবত প্রথম একজন বাঙালী কিশোর, যে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সঙ্গে কলকাতা ভ্রমণের সুযোগ পাচ্ছে । বাবার ঠিক সামনের সিটেই বসে আছে মাল্যবান । এই মুহূর্তে বাবার শেষ কথাগুলো শুনে ও চমকে সোজা হয়ে বসল । নিজের অজান্তেই বোধহয় জানলার বাইরে চোখ চলে গেল । কই, এমন করে তো পরিচিত শহরটা কখনো চোখে পড়েনি । বরং রোজকার দুর্ভোগে, স্কুল থেকে ফেরার পথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্যামে আটকে থেকে মাল্যবান রাগ করেছে প্রশাসনের ওপর । বিরক্ত হয়েছে, কেন সকলে এসব মুখ বুজে সহ্য করে ! কিন্তু তার মধ্যেও বেঁচে-থাকার ইচ্ছেটা যে প্রতিদিন বাড়ছে, এই রহস্যটা তো ও বুঝতে পারেনি । বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতেই মাল্যবান চোখ ফেরালো বাসের মধ্যে । ওরই যদি এই অবস্থা হয়, তবে বিদেশী পর্যটকদের না-জানি কি হচ্ছে !

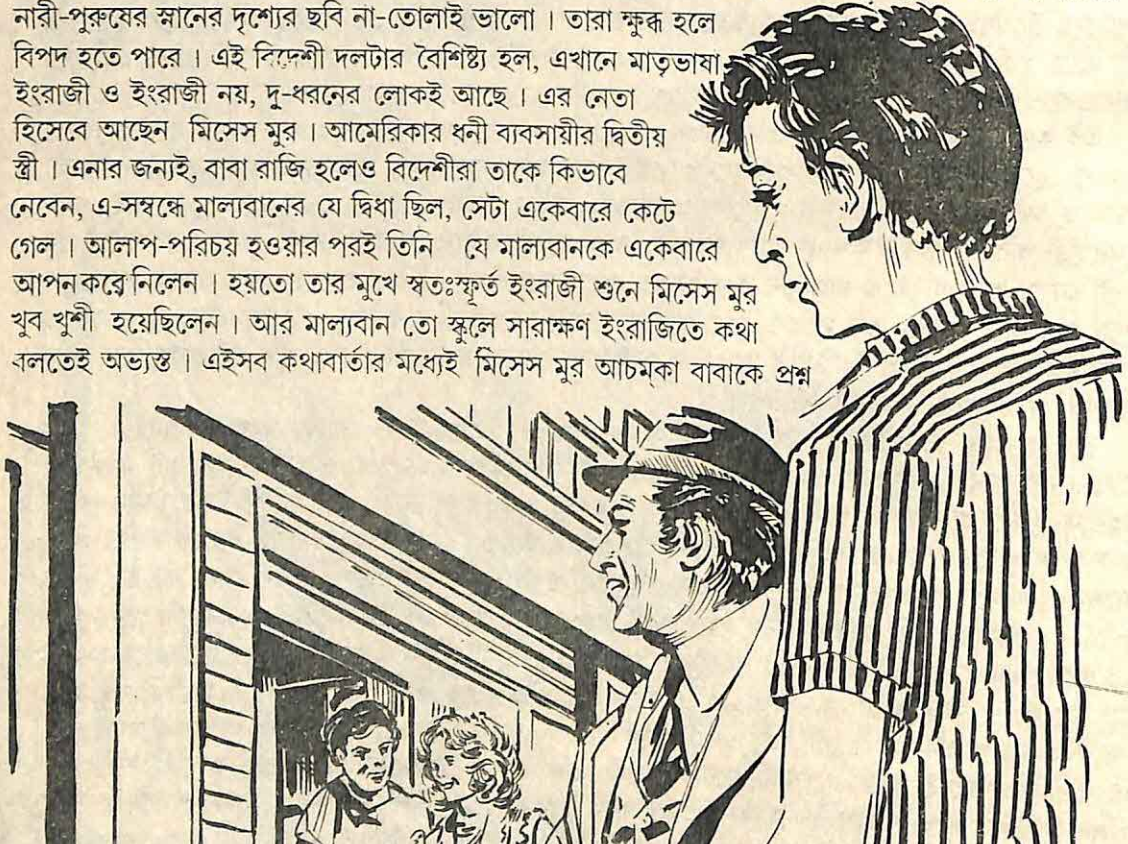
তবে শুধুমাত্র বিদেশীদের সঙ্গে ঘোরার আনন্দ ছাড়াও, আর একটা গোপন কারণও আছে । সেটা মাল্যবানের মনের একেবারে গোপন কথা, এমনকি মা-বাবাকেও কখনো বলেনি । আসলে এই কলকাতা শহরকে ও মনেপ্রাণে ভালোবাসে । আর ভালোবাসে বলেই, শহরটাকে ভালো করে জানার ইচ্ছে । যবে থেকে ও সবকিছু বুঝতে শিখেছে, এই ইচ্ছেটা তবে থেকেই ওর মনের গভীরে সযত্নে লালিত হয়েছে । তাই যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী কলকাতাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন, তখন ওর বুকের গভীরে দারুণ একটা কষ্ট হয় । এই শহরে ওর জীবনের কুড়ি বছর কেটেছে, রাস্তা দিয়ে হাঁটলে ও মাঝেমাঝেই ইট-কাঠের একটা সুন্দর গন্ধ পায় । ওর স্কুলের বন্ধুরা যেভাবে ন্যাস্টি এই শহরটাকে গালাগাল দেয়, মাল্যবান তখন আলগোছে উঠে পড়ে জমাটি আড্ডা থেকে । কেমন করে যে কলকাতার প্রতি ওর ভালোবাসা এত তীব্র হল, কে জানে!মাঝেমাঝেই মনে হয়, চেনা এই শহরটার মধ্যে যেন আর একটা শহর আছে । এমনিতে দারিদ্র্য কাকে বলে, মাল্যবান জানে না । ওর বাবা-মা দুজনেই কাজ করেন, কোনো অভাবই তারা অপূর্ণ রাখেননি । ও পড়েও শহরের অভিজাত ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে ! কিন্তু তবু আসা-যাওয়ার পথে রাস্তায় কিম্বা ফুটপাতে অসংখ্য লোককে বসে থাকতে দেখে, তাদের বুকচাপা ঝুপড়ীগুলো দেখে, ওদের বাড়ির ঠিক পেছনের বস্তীতেই ওরই বয়সী ছেলেদের নোংরা অভুক্ত চেহারা দেখে, অথবা কোন্নগরে মামাবাড়ি যাওয়ার সময় হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুয়ে থাকা মানুষগুলোকে দেখে, ওর কেমন যেন মনে হয়, তাদের ঝক্‌ঝকে কলকাতার বাইরেও আরেকটা কলকাতা লুকিয়ে আছে কোথাও । ওদের বাড়িতে কাজ করে সরমামাসী । তাঁর ছেলে হাবুলের সঙ্গে মাল্যবানের খুব ভাব । ও দেখেছে, মা যখন হাবুলকে খেতে দেয়, তখন আনন্দে ওর চোখগুলো চক্‌চক্ করে । এইসব রহস্যের প্রতি জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই মাল্যবানের খুব আগ্রহ । তাই বিদেশীদের সঙ্গে কলকাতাকে দেখার পাশাপাশি তাকে জানার ইচ্ছেটাও মিলেমিশে গিয়েছিল । আর এইরকম সুবর্ণ সুযোগ কি আর কোনোদিন পাওয়া যাবে ? তাই বাবা যখন আবিষ্কারের কথা বললো, তখন থেকেই একধরনের রোমাঞ্চ ওর শরীর-মনকে ঘিরে ধরেছে ।



বাসটা তখন ছুটে চলেছে সুরেন ব্যানার্জী রোড ধরে । শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত এই বাসটা সাধারণত বিদেশী পর্যটকদের জন্যই ব্যবহার করা হয় । বাসে বিদেশীরা আছেন মোট তিরিশজন । তার মধ্যে আমেরিকানই

বেশি। এছাড়াও আছে স্পেন, ফরাসী ও ইংলন্ডের কয়েকজন। মাল্যবানের এই খবরটা শুনেই মনে হয়েছিল, এই বাসটা যেন বাইবেলে পড়া সেই নোয়ার নৌকোর মতো। পৃথিবীর সব দেশেরই অন্ততঃ একজন করে হলেও এখানে আছেন। অবশ্য ইয়োরোপটা যদি গোটা পৃথিবী হয়! তবে এই দলটাকে বেশ সাহসীই বলতেই হবে। দিল্লীতে থাকার সময় অনেকেই এদের বুঝিয়েছিলেন, কলকাতায় কখনো যেও না। সেখানকার দূষিত জল-হাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়বে। তবু তারা কলকাতাকে দেখতে এসেছেন কেন? কারণটা সুন্দরভাবে বললেন মিসেস গ্রীণ। কালিফোর্ণিয়ার একটি কলেজের দর্শনের অধ্যাপিকা। বাবার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন—"ভারতবর্ষের বোম্বে বা দিল্লী ঘুরে আমার কোনো ফিলিংস্ হয়নি। মনে হল যেন নিজের দেশেই বেড়াতে এসেছি। তখনই ভেবে নিই, কলকাতায় যাব। ভারতের আসল চেহারাটাকে দেখার জন্যই তো এদেশে আসা। এখন মনে হচ্ছে, আমি বোধহয় খুব একটা ভুল করিনি।"

বাসের সকলের চোখই এখন্ বাইরের দিকে। অনেকেই আবার দামী ক্যামেরায় ছবি তুলতে ব্যস্ত। যাত্রীদের আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে ছবি তোলার কোনো বাধা নেই। তবে ফুটপাতের ঘর বা রাস্তায় নারী-পুরুষের স্নানের দৃশ্যের ছবি না-তোলাই ভালো। তারা ক্ষুব্ধ হলে বিপদ হতে পারে। এই বিদেশী দলটার বৈশিষ্ট্য হল, এখানে মাতৃভাষা ইংরাজী ও ইংরাজী নয়, দু-ধরনের লোকই আছে। এর নেতা হিসেবে আছেন মিসেস মুর। আমেরিকার ধনী ব্যবসায়ীর দ্বিতীয় স্ত্রী। এনার জন্যই, বাবা রাজি হলেও বিদেশীরা তাকে কিভাবে নেবেন, এ-সম্বন্ধে মাল্যবানের যে দ্বিধা ছিল, সেটা একেবারে কেটে গেল। আলাপ-পরিচয় হওয়ার পরই তিনি যে মাল্যবানকে একেবারে আপন করে নিলেন। হয়তো তার মুখে স্বতঃস্ফূর্ত ইংরাজী শুনে মিসেস মুর খুব খুশী হয়েছিলেন। আর মাল্যবান তো স্কুলে সারাক্ষণ ইংরাজিতে কথা বলতেই অভ্যস্ত। এইসব কথাবার্তার মধ্যেই মিসেস মুর আচমকা বাবাকে প্রশ্ন

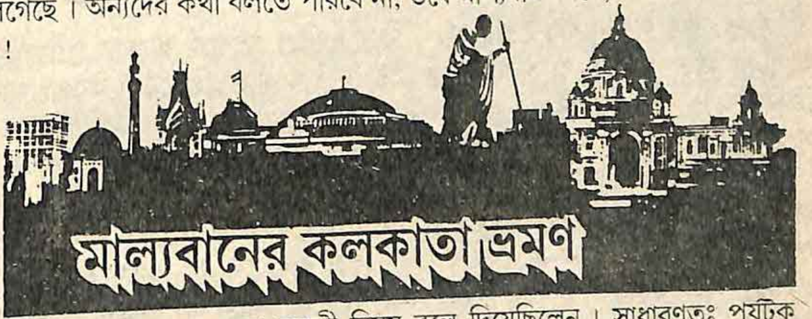


করলেন—"এক কথায় আপনি বলতে পারেন, কলকাতার বিশেষত্ব কি?"

বাবা একটু মাথাটা নীচু করে বললেন—"ম্যাডাম, একটু ধৈর্য ধরুন, কলকাতা আপনার সব প্রশ্নেরই উত্তর দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।"

এসব কথাবার্তা হচ্ছিলো বাসে ওঠার আগে গ্র্যান্ড হোটেলের লাউঞ্জে। চারপাশে সুসজ্জিত ওয়েটাররা নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করছে। তখন থেকেই মাল্যবানের ভেতরটা উত্তেজনায় ভরপুর। হৃদপিণ্ডের গতি যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ও তখন প্রাণপণে ঈশ্বরকে ডাকছিলো। যেন বিদেশীদের কাছে আজকে কলকাতার সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। একটু পরেই ওরা রাস্তায় নামল। সকলে লাইন দিয়ে বাসে উঠছেন। একপাশে বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে মাল্যবান। শেষে এগিয়ে এলেন মিসেস মুর। বাসে ওঠার ঠিক আগে, হঠাৎ তিনি ওদের আগে বাসে উঠতে বললেন। তার অনুরোধকে ফেলাও যায় না, আবার স্বাভাবিক কারণেই ওরা অপেক্ষা করছে সকলের শেষে ওঠার জন্য। তখন বাবাই বলে উঠলেন—"ম্যাডাম, একটু আগেই আপনি কলকাতার বৈশিষ্ট্য জানতে চেয়েছিলেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন, কলকাতা তার বিশেষত্ব দেখাতে শুরু করেছে। আমরা মহিলাদের সম্মান করতে জানি। একমাত্র কলকাতাতেই বাসে-ট্রামে মহিলাদের আলাদা বসার জায়গা আছে। এটাই কলকাতার মানবিক বৈশিষ্ট্য।" কথা শুনেই মিসেস মুর আনন্দে বাবার হাতটা জড়িয়ে ধরলেন। দৃশ্যটা দেখতে মাল্যবানের খুবই ভাল লাগছিলো।

উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করার পর মাল্যবান কি করবে, এখনো তেমনভাবে কিছু ভাবেনি। ওর মায়ের খুব ইচ্ছে ডাক্তারী পড়ানোর। কিন্তু মাল্যবানের ইচ্ছে, ও বড়ো হয়ে একজন গাইড হবে। হয়তো বাবাকে দেখে দেখেই এমন ইচ্ছেটা মাথায় এসেছে। কিন্তু অসুস্থ রোগী দেখার চেয়ে, দেশ-বিদেশে সুস্থ মানুষ দেখার আগ্রহ, তাদের জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহটাই মাল্যবানের বেশি। এই কারণে ও ইতিমধ্যেও শহরের অভিজাত ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে গাইড হওয়ার সম্বন্ধে বাবার কাছে অনেক কিছু জেনে নিয়েছে। তাই ও বাবা কিভাবে দলটাকে পরিচালনা করেন, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলো। এইটুকু সময়ের মধ্যেই মাল্যবান বুঝতে পেরেছে, এই ধরনের অভিযানে গাইডের বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনি যেমনভাবে কলকাতাকে তুলে ধরবেন, তার ওপরই নির্ভর করবে এই শহর তথা মানুষজনের সম্মান। এক কথায়, বিদেশীরা তাঁর চোখ দিয়েই কলকাতাকে দেখবেন। এই গুরুত্বকে মনে রেখেই ১৯৫৮ সাল থেকে গাইড ট্রেনিং কোর্স চালু করা হয়েছে। একদিকে ইতিহাস, ভূগোল সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান, অন্যদিকে সামাজিক জীবন তথা বিশেষ অঞ্চলের সংস্কৃতি সম্বন্ধেও ধ্যান-ধারণা গড়ে তোলার দায়িত্ব এই কোর্সের। এখন কলকাতায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত গাইড আছেন সাতাশ জন। তবে বাবার মতোই, কেউই পেশাদার নন। মাল্যবানের বাবা এই কাজ করছেন কুড়ি বছর ধরে। ফলে বিদেশী পর্যটকদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। এর আগে বছর দশেক শিক্ষকতা করেছেন। তখন থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে শুরু করেন। ভবিষ্যতে সাইডের কাজের জন্য তাঁর শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতাটা বিশেষ কাজে লেগেছে। অন্যদের কথা বলতে পারবে না, তবে মাল্যবান জানে, বাবা এই পেশাকে কি গভীরভাবে ভালোবাসে!

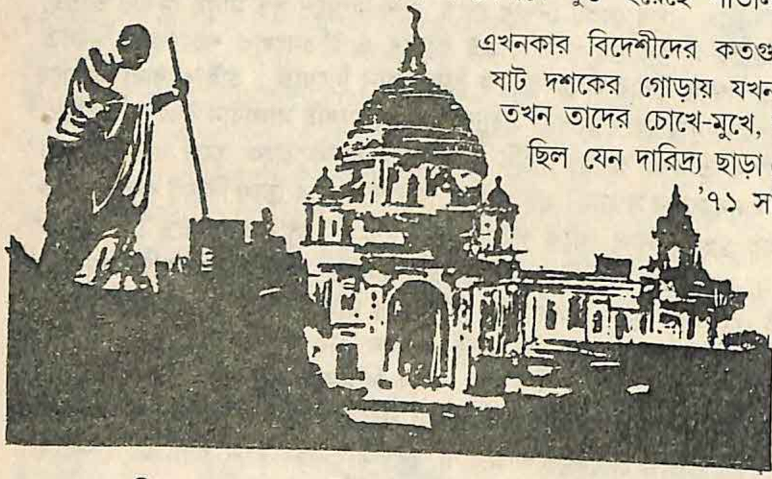


বাসে ওঠার আগে শান্তিবাবু মাল্যবানকে কতগুলো জরুরী বিষয় বলে দিয়েছিলেন। সাধারণতঃ পর্যটক দেখা যায় দুধরনের। দেশী ও বিদেশী। কলকাতা দেখতে আসা দেশীয় লোকজন অধিকাংশই অবাঙালী। বিদেশীদের আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। উচ্চবিত্ত, স্বল্পআয়ের পর্যটক এবং তীর্থযাত্রী। বিদেশীরা এখানে আসেন মূলতঃ ভারতবর্ষকে জানার জন্য। বাবা বলেছিলেন—"দ্য ওয়ার্ল্ড ইস্ এ বিগ্ বুক, এ্যাণ্ড ইচ্ ডে উই রিড্ এ পেজ অব ইট্। মনে রাখবে, ভ্রমণের গোড়ার কথা এটাই এবং এই কারণেই পৃথিবীকে জানার জন্য তাদের উৎসাহের শেষ নেই। এছাড়াও ভারতবর্ষের দরিদ্র অবস্থার কথা বিদেশে বহুল প্রচারিত। প্রায় সকলেই জানতে চায়, তা সত্ত্বেও মানুষ এখানে বেঁচে আছে কিভাবে? তারা এখান থেকে পালায় না কেন?" অধিকাংশ বিদেশী পর্যটকদের বয়স পঞ্চাশের ওপরে। তার মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। সরকারী ব্যবস্থায় কলকাতাকে দেখানোর দায়িত্বে আছে দুটি সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'টুরিস্ট ব্যুরো' এবং কেন্দ্রীয়

সরকারের 'ভারতীয় পর্যটন উন্নয়ন সংস্থা।' মাথাপিছু দক্ষিণা ছাব্বিশ টাকা। এছাড়া আছে কিছু ব্যক্তিগত পর্যটন সংস্থা। যেমন মাল্যবানদের এই অভিযানের উদ্যোক্তা 'মপিং টুরস্' নামে অভিজ্ঞ এক সংস্থা। এর দক্ষিণাও অনেক বেশি। প্রায় তিরিশ ডলারের মতো।

পর্যটকরা কলকাতার কি কি দেখবেন, এটা নির্ভর করে তারা কোন দেশ থেকে এসেছেন, তার ওপর। ব্রিটিশরা খুশি হয় ইংরেজ শাসনের প্রভাব কিভাবে ভারতের ওপর এখনো আছে, তার নিদর্শন দেখতে। যেমন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, অন্ধকূপ হত্যা অথবা জর্জিয়ান ভাস্কর্য শোভিত চার্চ তাদের দর্শন-তালিকার প্রথমে থাকে। তাদের প্রধান প্রশ্নই থাকে—ব্রিটিশ রাজ তোমাদের কি উপহার করেছে ? আবার তারা রেল-স্টেশনও দেখতে চায়, কারণ বিখ্যাত 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফি' পত্রিকায় ভারতের স্টেশনগুলোর প্রশংসা করা হয়েছে।

কিন্তু আমেরিকান বা অন্য ইয়োরোপীয়ানদের মূল আগ্রহ থাকে কালীঘাট মন্দির, মাদার টেরেসা, রাস্তার দৃশ্য অথবা ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের নিদর্শন মিউজিয়াম সম্বন্ধে। ব্রিটিশ শাসনের কোনো প্রভাবে তারা আদৌ উৎসাহিত নয়। রাশিয়ানরা পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শাসনের কথা জানেন। তারা দেখতে চান বামপন্থীদের কাজকর্ম এবং তাদের প্রতি মানুষের আগ্রহকে। দেশীয় টুরিস্টরা প্রায় সকলেই কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর বা বেলুড় ইত্যাদি তীর্থস্থান দেখতে চান। ইদানিং সেখানে যুক্ত হয়েছে পাতাল রেলের নাম।



এখনকার বিদেশীদের কতগুলো জিনিষ লক্ষ্য করার মতো। ষাট দশকের গোড়ায় যখন বিদেশীরা কলকাতায় আসতেন, তখন তাদের চোখে-মুখে, ব্যবহারে থাকত তাচ্ছিল্য। ভাবটা ছিল যেন দারিদ্র্য ছাড়া এখানে কিছুই দেখার নেই। কিন্তু '৭১ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে যুদ্ধের পর ভারত সম্পর্কে তাদের ধারণা অনেকটাই বদলায়। যুদ্ধে বিজয়ী দেশ নিশ্চয়ই হেলা-ফেলার যোগ্য নয়। তখন থেকেই বিদেশীদের আচরণে ভারতের প্রতি সম্মানবোধ তৈরি হয়। কিন্তু দারিদ্র্য সম্পর্কে ধারণার পুরোপুরি বদল হয়নি। এখন তারা আধুনিক মুভি ক্যামেরা বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি দেখিয়ে আত্মতৃপ্তি ভোগ করে। হয়তো আমাদের কাছেও একই জিনিষ আছে, তবু অতিথিদের খুশির জন্য স্বীকার করতে হয়, এমন জিনিষ আগে আমরা দেখিনি। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও তাদের মনে থাকে, কি কষ্টসাধ্য জীবনের মধ্যে মানুষ এখানে হাসিমুখে বেঁচে আছে।



বাসটা চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে মাল্যবানের মনের মধ্যে একধরনের উত্তেজনা হচ্ছিল। তবে মাইক হাতে বাবাকে দেখে অবাকও হচ্ছিল কম নয়। যে বাবাকে ও প্রতিদিন বাড়িতে দেখে, তার সঙ্গে এই মানুষটার কোনো মিলই নেই। কেমন যেন অচেনা, কিন্তু বাবা যে এত ভালো ইংরেজী বলতে পারে, কে জানতো ! এমনিতে বাবা বাড়িতে বাংলায় কথা বলেন, ইংরেজী বললে রাগ করেন, কিন্তু বিদেশীদের সামনে তার নিখুঁত উচ্চারণ শুনে মাল্যবানের বাবার জন্য গর্ববোধ হচ্ছিল।

যেহেতু এই বাসের মধ্যে ইয়োরোপের বিভিন্ন অংশের লোকজন আছেন, সেই কারণে আজকে দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো বাছা হয়েছে সকলের কথা মনে রেখেই। আজকে তাই গন্তব্যের মধ্যে আছে, মাদার টেরেসার শিশুনিবাস, জৈনমন্দির, হাওড়া ব্রিজ, অন্ধকূপ হত্যা, সেন্ট পল্‌স চার্চ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও মিউজিয়াম। মোট সময় লাগবে চার ঘণ্টা। এখন সকাল আটটা। বারোটার মধ্যে ওরা গ্র্যান্ড হোটেলে ফিরে আসবে। কেন এই সময়টাকে বেছে নেয়া হয়েছে, সেটাও বাবার থেকে শুনেছিল মাল্যবান। এটাই সাধারণ রেওয়াজ, ভিড়ের মধ্যেই একটা শহরকে ভালোভাবে চিনে নেয়া যায়।

প্রাথমিক উত্তেজনাটা মাল্যবানের চোখ থেকে এখনো কাটেনি। একই অবস্থা বিদেশীদের। মুখে-চোখে তাদের অবাক বিস্ময়, ঠোঁটে পাতলা কৌতুকের হাসি। তবে মাল্যবানের এই উত্তেজনার কারণও আছে। বাসে

ওঠার আগের মুহূর্তে যখন একজন ভিখিরি মিঃ ডগলাসের হাতটা ধরে পয়সা চাইছিলো, কলকাতাবাসী হিসেবে নিজেকে ভাবতে মাল্যবান তখন বেশ লজ্জা বোধ করছিলো। এটা কেন হলো, ও জানে না। তবে আমাদের দারিদ্র্যকে বিদেশীদের সামনে এইরকম নগ্নভাবে প্রকাশের জন্য দায়ী কে ? সেই মুহূর্তে সকলের ব্যর্থতাকে ঢাকা দেওয়ার দায় যেন মাল্যবানের কাঁধে। কিন্তু পরক্ষণেই বাবার কথাগুলো শুনে যে আনন্দ হচ্ছিলো, তাকেও কি মিথ্যে বলা যায় ? সত্যিই কি প্রতিদিনের কষ্টকে আমরা সবাই হাসিমুখে ভোগ করি না ? এই দুধরনের আবেগই সারাক্ষণ মাল্যবানের সঙ্গে ছায়ার মতো আটকে ছিলো। কখনো বিষাদ, লজ্জা—আবার কখনো বা গর্ব, আনন্দ।

বাসটা তখন ছুটে চলেছে মৌলালি ছাড়িয়ে মল্লিকবাজারের দিকে। পথেই পড়বে মাদার টেরেসার শিশুনিবাস। মাইকে বাবার গলা শোনা গেল—"বাসে ওঠার সময় যে ভিখিরি মহিলাকে কোলে বাচ্চা নিয়ে দেখলেন, দারিদ্র্য ছাড়াও তার অন্য চেহারা আছে। যদি আপনারা কেউ দশ বছর পরে গ্র্যান্ড হোটেলে আসেন, তখনও আপনি এই মহিলাকেই রাস্তায় দেখতে পাবেন। তার কোলে একই চেহারার বাচ্চা। তখন যেন অবাক হবেন না। কারণ ভিক্ষাবৃত্তি তার কাছে প্রফেশান। সেইজন্য বিভিন্ন চেহারার বাচ্চা ভাড়া পাওয়া যায়। আপনারা লক্ষ্য করুন রাস্তার দিকে। কলকাতা, পৃথিবীর বৃহত্তম শহরকে বোঝার চেষ্টা করুন। এখানে দশ মিলিয়ন মানুষ ৬৪ রকম ভাষায় কথা বলে। আজকে আমরা ৪২৭ রকম মানুষকে দেখতে পাব, যারা রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছে।"



প্রতিটি কথায় মাল্যবানের বিস্ময়ের স্তরগুলো যেন ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। ওর ঠিক পেছনের সিটে বসা মিসেস মুর তো বলেই উঠলেন—"আমি যদি এখানে থাকতে পারতাম।" শুনে মাল্যবানের মনটা আনন্দে ভরে উঠল। প্রতিদিনের দেখা শহরটাকে তখন সম্পূর্ণ অচেনা মনে হচ্ছিলো। বইতে তো কতো কিছুই জানা যায়। পূর্ণেন্দু পত্রীর কলকাতা বিষয়ক সব কটা বই-ই প্রায় ও পড়েছে। কিন্তু চোখে দেখার সঙ্গে পড়ার বোধহয় অনেক তফাৎ। রাস্তার চলমান মানুষ, ঝুলন্ত বাসযাত্রী ইত্যাদি দৃশ্য তো রোজই দেখা যায়। কিন্তু মাল্যবানের নিজেকেই বিদেশী বলে মনে হয়, যখন গাইড বলেন—"কলকাতার মানুষেরা ৮৪৫ রকম ডায়ালেক্টে কথা বলে। শুধু বাঙালী ছাড়াও এ শহরে ভারতের সব অঞ্চলের মানুষ আছেন। এখানে প্রতি দশ জনে চারজন অবাঙালী। এদের সংস্কৃতি আলাদা, জীবনযাত্রাও এক নয়। খুঁজলে এখানে ২৯ রকম বিবাহ-প্রতীক পাওয়া যাবে। যেমন উত্তর ভারতের মানুষের মেঁটে সিঁদুর, পূর্ব-ভারতে গাঢ় লাল। আবার কাশ্মিরের বাসিন্দাদের বিবাহের চিহ্ন মাথায় লকেট। পশ্চিম ভারত থেকে যারা কলকাতায় এসেছেন, তাদের শাড়ির আঁচল থাকে ডানদিকে, বাঙালীদের বাঁ-দিকে। দক্ষিণ ভারতের মেয়েদের শাড়ির আঁচল থাকে পায়ের তলা দিয়ে। কলকাতায় শাড়ি বা ধুতি পড়ার অন্ততঃ চল্লিশ রকম কায়দাকানুন আছে।"



ততক্ষণে বাসটা এসে দাঁড়িয়েছে মাদার টেরেসার শিশু-নিবাসের সামনে। তার মধ্যে বিদেশীরা জেনে গেছেন, মাদার ছাড়াও আরও তিনজন নোবেল লরিয়েট কলকাতার মর্যাদা বাড়িয়েছেন। ১৯০২ সালের ম্যালেরিয়ার ওষুধ আবিষ্কারক স্যার রোনাল্ড রস, গ্রেট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিজ্ঞানী সি· ডি· রমণ। সম্ভবতঃ একই শহরের চারজনের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ঘটনা খুব বেশি নেই। শিশুনিবাসের গেটের সামনে অনেক মানুষের লাইন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সেখানে বিনামূল্যে দুধ বিতরণ করা হচ্ছে। তবে জ্বালানির অভাবে গুঁড়ো দুধ। বাড়ানো হাতের ডেক্‌চি-থালার পাহাড় ডিঙিয়ে বিদেশীরা ভেতরে ঢুকলেন। এখানে আশ্রয় পায় দুধরনের শিশুরা। মানসিক জড়তাসম্পন্ন শিশুর সংখ্যাই বেশি। এছাড়া আছে পরিচয়হীন অনাথ শিশুরা। মিনিট পনেরোর মধ্যেই পুরো বাড়িটা ঘোরা হয়ে গেল। গাড়িতে ওঠার পরই বাবা মাইকটা হাতে নিলেন—"কলকাতার দারিদ্র্যের আরও একটা চেহারা এখানে দেখতে পাবেন। লক্ষ্য করুন, শিশুনিবাসের পাশেই একটা দুধের দোকান আছে। লোকজন গুঁড়ো দুধ সংগ্রহ করেই পাশের দোকানে বিক্রি করে দেন।

মাদার অবশ্যই এটা জানেন। কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁর কিছুই করার নেই। তারা এতটাই দরিদ্র যে, দুধ জ্বাল দিয়ে খাওয়ার মতো পয়সাও তাদের হাতে নেই।"

শিশুনিবাসের চারপাশে এলোমেলোভাবে রাস্তায় বসেছিলো বেশ কিছু মানুষ। তাদের পরণে নোংরা ধুতি, খালি গা। কেউ বা রাস্তার কলে চান করছিলো। সেদিকে তাকিয়ে গাইড বলে দিলেন—"কলকাতায় আমরা তিনভাবে জল পাই। আর এই যে মানুষগুলো দেখছেন, এদের মধ্যে অনেকেই ভিখিরি, তবে কিছু সাধারণ মানুষও আছেন। ভিখিরিদের বৈশিষ্ট্য, তারা চান করেন না, মাথায় চিরুনী ছোঁয়ায় না। প্রায় এক লক্ষ ভিখিরি প্রতিদিন ফুটপাতে থাকে। অনেকেই এদের মধ্যে রাস্তা থেকে কাগজ তুলে পেপার মিল-এ বিক্রি করে। তবে এদের রোজগার বেশ ভালো। দৈনিক তিরিশ টাকার মতো। দেখা গেছে, কলকাতার একজন প্রাথমিক শিক্ষকের থেকে গড় উপার্জন এদের বেশি।"

হঠাৎ তখন মাল্যবানের মনে পড়লো মুজতবা আলীর সেই গল্পটা। যেখানে লাটসাহেবের কুকুরের জন্য মাসিক খরচা পণ্ডিতমশাইয়ের মাইনের প্রায় তিনগুণ। মনে আছে, গল্পটা পড়তে পড়তে মাল্যবানের দুচোখ ফেটে অঝোরে জল পড়েছিলো। বাস তখন ছুটে চলেছে উত্তর কলকাতার জৈন মন্দিরের দিকে। পরেশনাথের মন্দির নামেই সেটা বেশি পরিচিত। মাঝখানে দুটো জায়গায় মিনিট দুয়েকের জন্য বাসটা থেমেছিলো। মৌলালির মোড়ে সকালবেলা অনেক মানুষ কাজের আশায় বসে থাকেন। এদের রোজগার অনিয়মিত। গাইড বলে দিলেন—"জার্নালিজমের ভাষায় এদের বলা হয় হ্যান্ডি-পিপল। কলকাতার আশপাশ থেকে প্রতিদিন প্রায় দু'লক্ষ হ্যান্ডি পিপল কাজের আশায় শহরে আসেন।" বিদেশীদের মধ্যে কেউ একজন প্রশ্ন করেন—"কলকাতার বাড়িগুলোর এত জীর্ণ চেহারা কেন?" তার কারণ তিনি ব্যাখ্যা করলেন এইভাবে—ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমার ভয়ে বাড়ির মালিকরা খুবই কম ভাড়ায় ভাড়াটে বসিয়ে কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। তারপর আজ অবধি সেই ভাড়ার পরিমাণ বাড়ানো যায়নি। অথচ বাড়ি দেখাশোনার খরচ অনেক বেড়ে গেছে। কলকাতায় এই মালিকদের চেয়ে ভাড়াটেরা অনেক ধনী। বাড়ি মেরামত ও রং করার মতো যথেষ্ট অর্থ মালিকের হাতে নেই। তাই কলকাতার বাড়ি-ঘর অধিকাংশই নোংরা। তার সঙ্গে রুচির কোনো সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয়বার বাসটা থেমেছিলো শিয়ালদা ব্রীজের ওপর। সেখান থেকে বিপিন বিহারী স্ট্রীটের রাস্তাটা দেখে বিদেশীরা মুগ্ধ প্রায়। বাবাও তখন আবেগে বলে চলেছেন—"যদি প্রকৃত কলকাতাকে বুঝতে হয়, তবে আপনাকে এই দৃশ্যটা মনে রাখতেই হবে। এখানে আপনারা ছবিও তুলতে পারেন। লক্ষ্য করুন, মাথায় ভারি মালপত্র নিয়ে কিভাবে লোকজন যাতায়াত করছে। এটাকে বলা হয় শিয়ালদা মার্কেট। এরকম প্রায় দু'শটা ছোটবড়ো মার্কেট সারা শহরে ছড়িয়ে আছে। এইসব মার্কেটে অধিকাংশ মাল-বওয়ার কাজই করে অবাঙালীরা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসে একদিন এরা কলকাতারই বাসিন্দা হয়ে যান। কি আশ্চর্য প্রাণশক্তি এদের। ইয়োরোপের কোনো শহরে এই ধরনের মানুষ দেখতে পাবেন না। এদের হাঁটার ভঙ্গি দেখে আপনাদের হয়তো নৃত্যরত নটরাজের মূর্তির কথা মনে হতে পারে। আর এত অগণিত মানুষজন দেখছেন, এরা এখন শহরতলী থেকে কলকাতায় আসছেন অফিস অথবা অন্যান্য কাজকর্মে। আমেরিকার স্টেশনে টিউব-রেল থামার পর যে জনস্রোত ছুটে চলে, তারই কলকাতা-সংস্করণ এই বিশাল মানুষের স্রোত। ডানদিকে তাকালে কলকাতার দুটো প্রধান স্টেশনের মধ্যে শিয়ালদা স্টেশনকে আপনারা দেখতে পাবেন।"



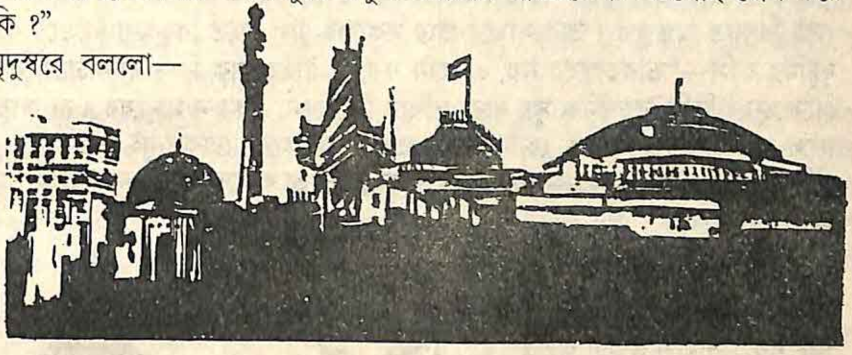
জৈনমন্দিরে ঢুকে ব্রিটিশ পর্যটকরা স্বভাবতই বেশ খুশি হলেন। কেননা, মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বাহাদুর শাহ ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক রত্নব্যবসায়ী। তিনি তার ইংরেজ ক্রেতাদের খুশি করার জন্য মন্দির নির্মাণের সময় ভিক্টোরিয়ান সভ্যতার অনেক নিদর্শন সাজিয়ে রেখেছেন। এখনও সেখানে ইংরেজ প্রহরীর মূর্তি অথবা ব্রিটিশ সভ্যতার চিহ্নস্বরূপ সিংহের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। জৈনধর্মকে বাবা যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন, সেটা শুনে মাল্যবানের ব্যাপারটা বেশ সহজ হয়ে গেল। অল্প কথায় বলার ভঙ্গিটা দেখে বিদেশীরাও মুগ্ধ। ইয়োরোপে যেমন মার্টিন লুথার কিং, যিনি শান্তির সপক্ষে ধর্মের কথা বলেছিলেন, অথচ পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করতেন না—জৈনধর্ম হচ্ছে লুথেরান স্টাইল অব ইণ্ডিয়ান রিলিজিয়ন।

এখন ঘড়িতে বাজে প্রায় দশটা। মাঝখানে কোথা দিয়ে যেন কেটে গেছে দু'ঘণ্টা সময়। মাল্যবানের খুবই ভালো লাগছে। প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে গিয়ে এখন ওর চোখে-মুখে বিস্ময়ের ঘোর। কলকাতার কোন সমস্যা নিয়ে এরপর আর বোধহয় হালকাভাবে আলোচনা করা যাবে না। নিজের জন্মস্থানকে কেন মায়ের সঙ্গে

তুলনা করা হয়, আজকে মাল্যবান তা বুঝতে পারছে। আজকে থেকে বাবার প্রতি শ্রদ্ধাও যেন অনেক বেড়ে গেল। কি আশ্চর্য ক্ষমতায় তিনি বিদেশীদের সামনে নিজের শহরটাকে তুলে ধরছেন। তার ভালোমন্দ, লজ্জা-অহংকার, আনন্দ-বিষাদ—সবকিছু। আবার এইটুকু সময়ের মধ্যে বিদেশীরা যেখানে যাবেন না, সেইসব জায়গা সম্বন্ধেও অনেককিছু বলে দিয়েছেন তিনি। যেন শহরটা সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ধারণা গড়ে তোলা যায়। যেমন দক্ষিণেশ্বরের মন্দির তথা রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথা। অন্যদিকে রাজভবনের ইতিহাসও এখন বিদেশীদের অজানা নয়। মাল্যবান বেশ বুঝতে পেরেছে, শুধু জ্ঞান থাকলেই গাইড হওয়া যায় না, তার জন্য নিজের শহরকেও মনেপ্রাণে ভালোবাসতে হয়। কিন্তু একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধরেই ওর মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। জৈনমন্দির থেকে এখন যাওয়া হবে হাওড়ার ব্রীজ দেখতে। বাসে উঠে একফাঁকে ও বাবাকে বললো—"আচ্ছা, আমার মনে হচ্ছে, এখনও অবধি তুমি শুধু কলকাতার দারিদ্র্যের দিকগুলোই বেশি করে বলছো। এর কারণটা কি ?"

বাবা একটু হেসে মৃদুস্বরে বললো—

"বলতো পারো, এটা ধরন। দীর্ঘদিনের আমার কাজের একটা



অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, টুরিষ্টদের প্রথমেই যদি ভালো দিকগুলোর কথা বলা যায়, তাহলে তারা সেটা বিশ্বাস করে না। এখনও অনেক বিদেশীই ভারতবর্ষকে অন্ধকারের দেশই ভাবে। তবে একটু ধৈর্য ধরে দ্যাখো। অন্যদিকটাও একেবারে বাদ যাবে না। আমাকে তো কলকাতার প্রকৃত চেহারাটাই তুলে ধরতে হবে।"

হাওড়ায় যাওয়ার পথে দুটো বিশেষ ঘটনা ঘটেছিলো। বড়বাজারের কাছে একটা সিগারেটের দোকানে দড়িতে আগুন ঝোলানো ছিল। মিসেস গ্রীণ এই ব্যাপারটা কি জানতে চাইলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর চলে এলো—"কলকাতার অধিকাংশ মানুষ সিগারেট খায়। কিন্তু তার লাইটার বা দেশলাই পকেটে রাখেন না। তাই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। একে আমরা বলতে পারি, 'পাবলিক লাইটার।'

দোকানের পাশেই ছিল একটা শিবমন্দির। সেদিকে বিদেশীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বাবা বলে দিলেন—"দেখুন, এক সুন্দর পোশাক পরিহিত স্মার্ট যুবক মন্দিরে প্রণাম করছেন। সম্ভবতঃ এই সকালবেলা সে কাজে বেরুচ্ছে। তার আগে মন্দিরে সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাইছেন। শহরের রাস্তা-ঘাটে হামেশাই এই দৃশ্য দেখতে পাবেন। এখানে প্রতিটা কাজে আমরা ধর্মের প্রভাবকে দেখতে পাব। এটাও কলকাতার বিশেষত্বের একটি দিক।"

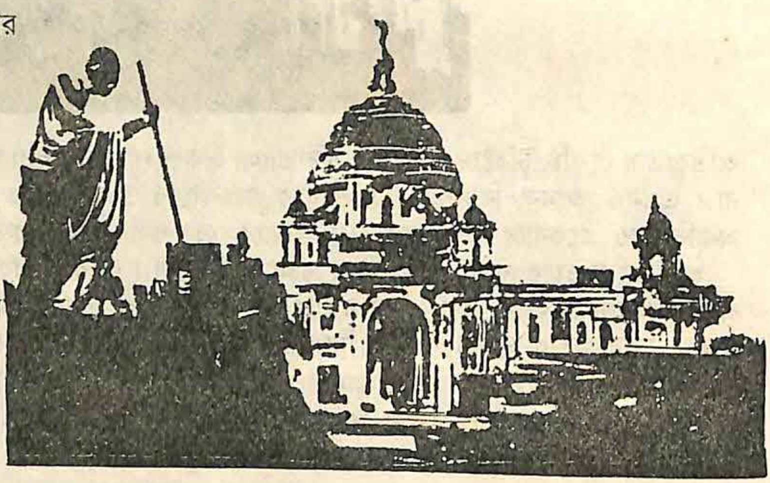
হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার জন্য বিদেশীদের কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। তবে গঙ্গায় অসাধারণ স্নিগ্ধ সৌন্দর্য দেখে তাদের হাবে-ভাবে প্রচণ্ড বিস্ময় খেলা করতে থাকে। "এই গঙ্গা কী কলকাতার প্রাণ।" তাকে দুহাতে জড়িয়ে রেখেছে, আগলে রেখেছে। সেইজন্যই এই নদীকে হিন্দুরা মায়ের মতো সম্মান করে, ভালোবাসে। গঙ্গা আমাদের কাছে দেবীর মতো—দুধারের অসংখ্য পুণ্যার্থী ও ভবঘুরে লোকের দিকে তাকিয়ে গাইডের গলা শোনা গেল—"কলকাতার অন্যতম সমস্যা হচ্ছে জনসংখ্যা। প্রায় পাঁচ কোটি। এছাড়া হাওড়া ও অন্যান্য জেলা থেকে প্রতিদিন অনেক মানুষ এখানে আসেন। পৃথিবীর কোনো শহর কি এতো বিশাল মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে। আমাদের দারিদ্র্যের মূল কারণও এই জনস্ফীতি। এখানে প্রতি সাত মিনিটে একজন শিশুর জন্ম হয়।"

ফেরার পথে হাওড়ার উড়াল পুলের মাঝামাঝি জায়গায় বাসটা থেমেছিলো। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে মহাত্মা গান্ধী রোডের দৃশ্যটা দেখতে পাওয়া যায়। সেদিকে তাকিয়ে একটু হেসে বাবা বললেন—"এটাই কলকাতার অন্যতম কর্মব্যস্ত রাস্তা মহাত্মা গান্ধী রোড। রাস্তাটা চলে গেছে শিয়ালদা স্টেশন পর্যন্ত। এটা আবার বিজনেস-সেন্টারও বটে, এক মিনিটে এখানে কোটি কোটি টাকার লেনদেন চলে। অধিকাংশ ব্যবসায়ীদের

বাসস্থান এখানেই। আর গান্ধীজী সম্পর্কে নতুন কিছুই বলার নেই। জাতির জনক তিনি, প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে শ্রদ্ধেয়। এই দুটো তথ্য মিলিয়ে কয়েক সংখ্যা আগে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো। সেখানে বেশ ব্যঙ্গ করেই বলা হয়েছিলো, কলকাতার ব্ল্যাক-মার্কেটিয়াররা যে অঞ্চলে থাকেন, সেই রাস্তার নাম মহাত্মা গান্ধী রোড, যিনি ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ারদের দেশ থেকে তাড়ানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন।"

এবার মাল্যবানের গন্তব্য ডালহৌসী স্কোয়ার অর্থাৎ অফিসপাড়া। সেখানেই ঘটেছিলো বিখ্যাত অন্ধকূপ হত্যা। তখন বাংলার শাসক সিরাজৌদ্দোলা। ১৭৫৬ সালে তিনি এক বিশেষ কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে ১৪৬ জন ব্রিটিশ সৈন্যকে বন্দী করে রাখেন মাত্র ৩৩ স্কোয়ার ফুট একটা ঘরে। শেষপর্যন্ত ১২৩ জন সৈন্যের মৃত্যু হয়। ঘটনাটা এভাবেই প্রকাশিত, এর সত্যতা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যেও মতভেদ আছে। তবে ঘটনাটা ইয়োরোপের প্রতিটা স্কুলে পড়ানো হয়। এখন যেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিশাল বাড়ি, তার ঠিক সামনেই ছিল সেই বিখ্যাত অন্ধকূপ। তার সামনে প্রায় সকলেই টুপি হাতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবার চোখে তখন দুষ্টুমির হাসি—"ভারতবর্ষের নয়, একজন ফরাসী ঐতিহাসিক কিন্তু ঘটনাটাকে সম্পূর্ণ আজগুবী বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক সূত্র ধরে দেখিয়ে দিয়েছেন, একজন মানুষের জন্য জায়গা লাগে দুই স্কোয়ার ফুট। ফলে ৩৩ স্কোয়ার ফুটের ছোট ঘরে এতজন লোককে ঢোকানোই সম্ভব নয়।" বিদেশীরা কথাগুলোকে অবিশ্বাস করল কিনা, অনেক চেষ্টা করেও মাল্যবান তা বুঝতে পারল না। তবে তাদের মুখে তখনও বিষণ্ণতার ছায়া।

সকাল এগারটার অফিস পাড়ার ভীড়কে কল্পনা করা মোটেই শক্ত নয়। সামনে একটা ঝুলন্ত বাসের দিকে তাকিয়ে গাইড বলে ওঠেন—"প্রতিদিনই এভাবে কলকাতার মানুষদের কাজের জায়গায় যাতায়াত করতে হয়। কারণ লোকসংখ্যার তুলনায় বাসের সংখ্যা কম। রাস্তাগুলো ও ছোট ছোট। এই চ্যালেঞ্জ-- এর মধ্যেই



আমাদের বেঁচে থাকতে হয়। আমার সন্দেহ হয়, যদি আমেরিকা বা ইংলন্ডে এই ধরনের অবস্থা থাকত, তবে খুবই কমজনই বোধহয় রোজ কাজে যেতো।"

"আমরা এখন হার্ট অব দ্য সিটিতে দাঁড়িয়ে আছি।" রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনের ফুটপাতের ওপর বিদেশীরা দাঁড়িয়ে বাবার কথা শুনছে। মাল্যবান বাবার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। দুপাশে অসংখ্য মানুষের স্রোত, হকার্সদের চিৎকার, কয়েকজন বিদেশীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করছে। আশেপাশের শব্দের জন্য বাবার গলার আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে।

"এখানে আপনারা দেখতে পাবেন, চারপাশে অনেক লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন। এরা এসেছেন বিভিন্ন অফিসে অস্থায়ী কাজের আশায়। তবে যে দারিদ্র্যকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, একটু ভাবলেই তার কারণটা বোঝা শক্ত নয়। এমন একটাও দেশ আমাকে দেখাতে পারেন, যারা আমাদের মতো দীর্ঘ দুশ বছর পরাধীন ছিলো? আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি মাত্র চল্লিশ বছর। তার মধ্যেই ভারতবর্ষ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম জায়গা পেয়েছে। স্বাধীনতার আগে এখানে একটা সূঁচও তৈরি হতো না। আর এখন এই লাক্সারী বাস, জামাকাপড়, ইস্পাত, খাদ্য সবই আমরা তৈরি করতে পারছি। দীর্ঘদিনের এই পরাধীনতার কারণে এখনও রাস্তার দোকানগুলোতে দেখতে পাবেন, সেখানে সাইনবোর্ডের ভাষা অধিকাংশই ইংরাজী।"

বাবার শেষদিকের কথাগুলো শুনে মাল্যবানের বেশ ভালো লাগছিলো। কিন্তু রহস্যময়ী কলকাতাকে জানার বোধহয় শেষ নেই। তাই চমকে উঠল পরের কথাগুলো শুনে—"ভারতবর্ষের মোট মূলধনের অধিকারী

বারোটা পরিবার। তার মধ্যে অন্যতম বিড়লা পরিবারের আদি বাসস্থান কলকাতায়। এদের বাৎসরিক লাভের পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা। এদের মূল ব্যবসা গাড়ির। দিনে প্রায় ১২০ টা গাড়ি এখানে তৈরি হয়। তার পঞ্চাশ ভাগ ক্রেতাই কলকাতার। সাধারণত উচ্চবিত্তরাই গাড়ি কিনে থাকেন। আবার এই শহরেই সত্যজিত রায়, মৃণাল সেন বা রবিশংকরের মূল বাসস্থান। এই উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিতদের জন্যই শহরে বিভিন্ন ভাষায় ২৩টারও বেশি সংবাদপত্রে মোট বিক্রির পরিমাণ ৪০ লক্ষ। বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত কাগজটির নাম 'আনন্দবাজার পত্রিকা'।

সেন্ট পলস্ চার্চে সকলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য বসলেন। ঘুরে দেখার ইচ্ছে বিশেষ নেই, সকলেই বেশ ক্লান্ত। কয়েকজন ঘুরে ঘুরে দেয়ালে ঝোলানো বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলো দেখছে। মাল্যবানের মনের ভেতরটা আনন্দে ভরে উঠেছে। কলকাতাকে আপন করে জানার এই আনন্দের কোনো শেষ নেই। এর মধ্যে কিছুক্ষণ আগে বাবা মাল্যবানকে ডেকে বলে দিয়েছেন—'এই অভিযানের কি কি ত্রুটি আছে বলে তোমার মনে হচ্ছে, আমাকে বাড়িতে গিয়ে বলবে ? কেন একথাটা বাবা বললেন, সেটাও জানে না। তবে কয়েকটা জিনিষ মাল্যবানের একেবারেই ভালো লাগেনি।

তবে চার্চের এই শান্ত পরিবেশ সবকিছুই ভুলিয়ে দিতে পারে। যীশু, এই শব্দটি শুনলেই মাল্যবান যেন মায়ের কোমল স্পর্শ টের পায়। এরমধ্যে কয়েকটা তথ্য বিদেশীদের জানা হয়ে গেছে। যেমন, কলকাতার আশি ভাগ মানুষই হিন্দু। তাদের মন্দিরের সংখ্যা দু হাজার। তাদের জন্য শ্মশানঘাট আছে চারটে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মও যে এখানে সম্পূর্ণ নিরাপত্তায় টিকে আছে, তারও নমুনা কম নেই। মুসলমানদের জন্য কলকাতায় আছে ছ'শ মসজিদ। এছাড়াও আছে ৪৫টা চার্চ, ৫টি সিনেগগ্ [ইহুদিদের উপাসনালয়], শিখদের জন্য ১২টা গুরুদ্বোয়ারা ও একটি পার্শী উপাসনালয়।

মাল্যবান মনোযোগ দিয়ে ভাবার চেষ্টা করছিলো, আর কি কি বিষয় থাকলে এই অভিযান আরো সুন্দর হতো। আবার কিছু জিনিষ ভ্রমণের পক্ষে অসুবিধাজনকও বটে।যে রাস্তা দিয়ে বাস চলছে, তার অধিকাংশই এমন নোংরা যে, লজ্জিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ঘটে। একজন যুবক জৈনমন্দিরের ছবি তুলতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে বাধা পেয়েছিলেন। কিন্তু মাল্যবানের মনে হয়েছিলো, অন্যান্য দেশের মতো মূর্তি ছাড়া মন্দিরের ছবি তুলতে দেয়া উচিত। তা আমাদের দেশটাকে বুঝতে সাহায্য করবে। সবচেয়ে দুঃখজনক যা মাল্যবানকে আহত করেছে, তা হলো, কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাড়িকে রাখা হয়নি। অথচ ইংলন্ডে শেকস্পীয়ারের বাড়িটা বিদেশীদের কাছে মন্দিরের মতো। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে কি কলকাতাকে ভাবা যায় ? তিনি না থাকলে কে দেবে অন্ধজনে আলো, মৃতজনে কে দেবে প্রাণ ? মাল্যবান এই তিনটে বিষয় মনে মনে ভেবে রাখে, বাড়ি গিয়ে বাবাকে বলতে হবে।

বিদেশীদের আরো দুটো জায়গা দেখা বাকি ছিল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর মিউজিয়াম। প্রথমটি অবশ্যই ব্রিটিশদের জন্য। ভিক্টোরিয়ার মূর্তির কাছে গিয়ে তাদের বিনম্র ভঙ্গী দেখে মাল্যবান মুগ্ধ হ'ল। নিজের দেশকে তারা কতখানি ভালোবাসে। আমেরিকানরা ততক্ষণে ব্যস্ত হয়েছেন দেয়ালের ফ্রেসকো ও কারুকার্য দেখতে। বোঝা যাচ্ছে, সকলেই বেশ পরিশ্রান্ত, দুপুরের রোদ থেকে অনেকেই মাথা বাঁচাতে চাইছেন। ঘড়ির কাঁটায় তখন বারোটা বাজতে মিনিট পনের বাকি। ঘণ্টাচারেক সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, বোঝাই গেল না। বাস তখন চলতে শুরু করেছে মিউজিয়ামের দিকে। ভিক্টোরিয়ায় তারা যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন ব্রিটিশ রাজের দাপটে, মিউজিয়ামে এসে তারাই আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন প্রতিটি ইটের ইতিহাস জানতে। তার মধ্যে বাবার একটি কথাই মাল্যবানের খুব ভালো লেগেছে—"মনে রাখবেন এই মিউজিয়াম আসলে মৃত। কিন্তু একটু আগে আপনারা যে শহরকে দেখেছেন, তা প্রায় মিউজিয়ামের মতোই বৈচিত্রময় কিন্তু জীবিত। ক্যালকাটা ইস্ এ লিভিং মিউজিয়াম।"

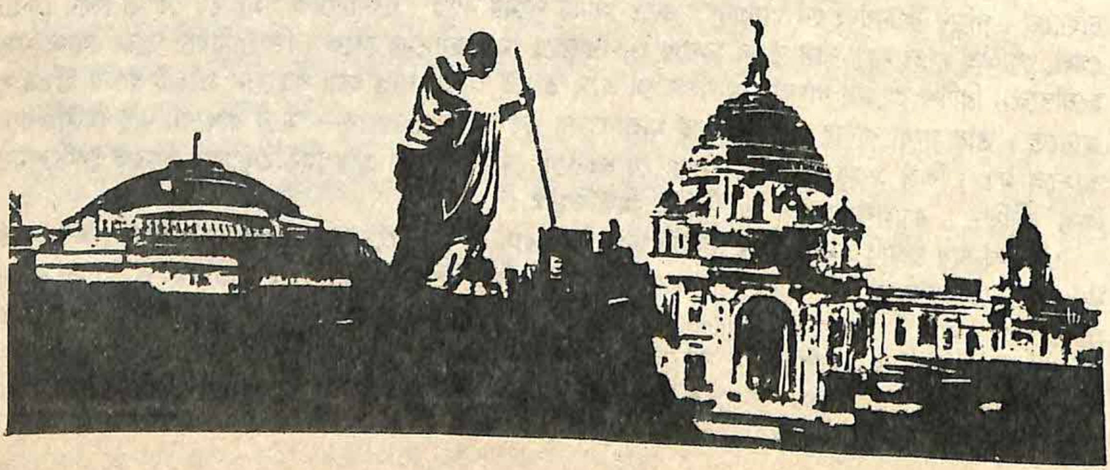


এই দীর্ঘ চার ঘণ্টার ভ্রমণে ক্লান্ত টুরিস্টদের নিয়ে বাস এগিয়ে চেছে গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে। সকলেরই মনপ্রাণ ছেয়ে আছে একটা শহরকে আবিষ্কারের আনন্দে। কিন্তু শেষ চমকটা বোধহয় অপেক্ষা করছিলো গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে। গেটের বেশ খানিকটা দূরে একজন ভিখিরি রাস্তায় বসেছিলো। তাঁর পরণে শতছিন্ন নোংরা জামাপ্যান্ট।বাস থেকে নেমে সকলেই যখন হোটেলে ফেরার জন্য ব্যস্ত, হঠাৎই মিসেস মুর এগিয়ে গেলেন তার দিকে। কৌতূহলে সকলেই তার পিছু নিলেন। একপাশে বাবার সঙ্গে মাল্যবানও। মিসেস মুর তাকে প্রশ্ন করলে—তুমি এখানে কেন ?

বাবা সেটা তর্জমা করে বলতেই ভিখিরিটা অল্প হেসে স্পষ্ট বাংলায় বললো–"ভগবানের ইচ্ছেতেই আজ আমি এখানে। তুমি গতজন্মে নিশ্চয়ই কোনো পুণ্য করেছিলে, তাই আজ তুমি গাড়িতে চড়তে পারছো। আর আমি কোনো পাপ করেছিলাম, সেইজন্যই আজ আমি রাস্তার ভিখিরি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুক।"

কথাগুলো ইংরাজীতে অনুবাদ করে বলতেই মিসেস মুর সমেত সকলের মুখেই তখন বিষাদের গাঢ় প্রলেপ। লোকটার কথাগুলোর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা শুনে সকলের মনই দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মাল্যবান একদৃষ্টে তাকিয়েছিল লোকটার দিকে। চোখের গোড়ায় জল। কি আশ্চর্য উদাসীনতায় ভিখিরিটা সব কথাকে অবলীলায় উড়িয়ে দিতে পারে। কোনো আক্ষেপ নেই, অনুতাপ নেই। কলকাতার এও এক নতুন রূপ, জীবনের জ্ঞান এখানে প্রতিটা মানুষের আয়ত্বে।

একটু বাদে গ্র্যান্ড হোটেলের লাউঞ্জে বসেছিলো মাল্যবান। ওয়েটার এসে এককাপ চা দিয়ে গেছে। একটু দূরে বাবা দাঁড়িয়ে। সেই সুগন্ধী চায়ের মধ্যেও যেন সেই লোকটার মুখটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো মাল্যবান।





চোখের পাতারা আর উঁচু হয়ে থাকতে চেয়েও পারছে না। খুব নরম অন্ধকার রঙের ঠাণ্ডা ঘুম আলতো করে টেনে এনে বুজিয়ে দিচ্ছে চোখ দুটোকে—এখনও না ফোটা দুটি ফুলের কুঁড়ির মত দেখাচ্ছে যেন। ঘুমের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে মার গলার স্বর ফুলের গন্ধ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা ঘরে, বিছানায়, ছোট ছেলেটি নয়তো ছোট মেয়েটির লক্ষ্মী সোনার মতো দেখতে, ঘুম ঘুম ভাব মাখানো শান্ত ঠাণ্ডা শরীরে, মনের ছোট্ট বাগানে। মা গল্প বলছে। ঘুম আসছে। ঘুম এসে গেছে। মা এখনও গল্প বলেই যাচ্ছে। কি সুন্দর গল্প, ফুলের গন্ধ হয়ে সারা পৃথিবীর ছোট ছেলেকে মেয়েকে এক এক করে ঘুম পাড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে রাত্রির অন্ধকারে!

এদিকে চুপচাপ বসে আছে—ঝিমোতে ঝিমোতে অপেক্ষা করছে কয়েক জন উঁচু সাদা পাথরের তৈরি এক মিনারের ওপর। কাচের জানলা দিয়ে আকুল হয়ে চেয়ে আছে গ্রীম ভাই দু-জন। কখন ডাক পড়ে? যদি কেউ ডাকে? কোন মা, ঠাকুমা কিংবা নার্স। তা হলে গল্প হয়ে তাদের স্বরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে দেবে। একটু আগেই ত হান্স এন্ডারসনকে ডাকল এক মা। অনেক দূরের থেকে

ডাক এল । বোধহয় আমেরিকা কিংবা কানাডা বা ব্রাজিল ট্রাজিল হবে । জোস্নার অক্ষরে ছাপা ছোটদের গল্পের বইটা নিয়ে গেল হান্স । এখান থেকে শোনা যাচ্ছে । সে বেশ গল্প বলছে—'সমুদ্রে থাকত তিন জল কন্যা···' ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে ।

টুংটাং করে সময় এগিয়ে যাচ্ছে । রাত বাড়ছে । একটা মেয়ে, কেঁদে উঠল । 'চুপ ! চুপ !' মা'র গলা থেকে বৃষ্টি পড়ার মত শব্দ হচ্ছে 'টুপ ! টুপ !··· একজন লোক ছিল সে সবার কাছে খুঁত ধরে বেড়াত । তার নাম ছিল ফ্রিয়েম মাজীর'····

এই ত গ্রীম ভাইদের গল্প বলছে এক মা, না, দিদিমা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না । কাচের জানলা খুলে গ্রীমভাই দু-জন অন্ধকার বয়ে ভেসে চলল, ভারতবর্ষের এক বাড়িতে নীল ডিমলাইট জ্বালান ঘরে, এক মেয়ের আস্তে আস্তে ঘুম আসছে, দিদিমা গল্প বলছে, স্বর হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে গ্রীম ভাই আর তাদের গল্পগুলো—এ পাশে মেয়েদের মধ্যে একা একা বসে আছেন ঠাকুমা । বসে থাকতে পারছেন না । ঘুমের সঙ্গে কুস্তি করতে হচ্ছে ভীষণ । তুলোর চেয়ে নরম ঘুমের মোটা মোটা হাত দিয়ে জড়িয়ে, স্বপ্নের মেঝের ওপর তাঁকে ফেলে দিয়ে চোখে মুখে, ঘাড়ের ওপর চেপে বসতে চাইছে ঘুম । তবু ঠাকুমা ফোকলা মুখে অতি কষ্টে বসে আছেন যদি কেউ ডাকে । কোন মা, ঠাকুমা কিংবা নার্স । কেউ ডাকছে না । কত রাত হয়ে যাচ্ছে ! সব লোক কি তাঁকে ভুলে গেল ? স্বদেশ ভারতবর্ষের লোকদেরও কি তাঁকে মনে পড়ছে না ! ওপাশে হাঁটুতে মুখ গুঁজে, শীত বলে আগুনের তাপ নিচ্ছে ঈশপ । সারাদিন খাটাখাটনির পর তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে । ঈশপের অবস্থা খুব খারাপ । রাত্রিবেলার চেয়েও তাকে দিনের মধ্যে হাজার হাজার বার, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন লোকেরা বিভিন্ন সময়ে মনে করে । ওকেও ছুটে ছুটে যেতে হয়—কমলালেবুর মত পৃথিবীর এ মাথা থেকে ও মাথা । চেরী ফুলের দেশ থেকে কফিস্রাব, প্যাপিরাসের বন, উইলো গাছ থেকে কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটা দেশে বিদেশে । তবু ওর মনে দুঃখ, ক-টা দিন ধরে ওকে আর আর 'সেই যে ঈশপের গল্পে আছে—' ! বলে লোকে চেঁচিয়ে উঠছে না বা ডাকছে না আর তেমন করে । এমনি মনের দুঃখে দুঃখে ঘুমের পরতে পরতে ভরে রয়েছে এই শ্বেত পাথরের তৈরি মিনারের ওপর মেঘের বুক ছোঁয়া ঘরটা । এক কোণে শাহরাজাদ আর তার দুই বোন বসে । বুকের মধ্যে সরাবের মতো টলমল করছে কতো গল্প । তা বলে বলে রাতের পর রাত কেটে গিয়েছিল আরব বাদশা শারিয়রের ।

কখন ডাক পড়ে, তাই অপেক্ষা করছে দেয়াল ঘেঁষে বসে বসে অস্কার ওয়াইল্ড, ওয়াল্ট ডিজনি, দূরে দেয়াল ঘেঁসে বসে আছে আরও কয়েকজন । এদের সবার সুন্দর সুন্দর রূপকথার বই আছে, আকাশের পাতায় পাতায়, তারার অক্ষরে লেখা, জোৎস্না দিয়ে মলাট দেয়া । ক-টা দিন কেমন বিচ্ছিরি হয়ে কাটছে । ক-টা দিন বলতে ঠাকুমার কাছে—তা প্রায় এক কুড়ি বছর হবে । এখন মানুষ যেন কেমন হয়ে গেছে ! তেমন করে আর রূপকথা শুনতে চায় না । গ্রামোফোন রেকর্ডে গান শুনে, গান-নাটক শুনে ঘুমিয়ে পড়ে । বাইরে থেকে দেখতে নরম পেটের মধ্যে আগুন ভরা বাজ লুকোন, বুক-কাঁপানে ডিটেকটিক্ (ইংরেজী না শেখা ঠাকুমা 'ডিটেকটিভ' শব্দটির একটু ভুল উচ্চারণ করে ফেলেছেন) গল্প পড়ে মন ভোলায় । তাঁকে আর বিশেষ ডাকাডাকি করে না কেউ ।



আগে প্রতি রাতে ঝুলি ভর্তি সব গল্প উজাড় হয়ে যেত ! পাশে পড়ে থাকা ঝুলিটার দিকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকালেন ঠাকুমা । ঝুলিটা শান্ত একটা ফাঁকা রেশনের থলিত মত পড়ে আছে । হাওয়ায় মৃদু কেঁপে কেঁপে উঠছে কাপড়টা । ওর ভেতরেই মন্ত্র বলে অদৃশ্য হয়ে আছে দৈত্যি, দানো, রাজকন্যা, রাজপুত্তুর, ব্যাঙ্গে ব্যাঙ্গমা -বেঙ্গমী, শুকসারী আর কয়েকজন পরী ।

ঘুম এসে জড়িয়ে ধরেছে ঠাকুমাকে । শণের মত জট পড়া চুলগুলো নিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠছেন, 'দূর অ ! দূর অ মুখ পোড়া ঘুম ! এত কাল সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে এলাম আর আজ আমাকেই ঘুমোতে বলিস । দূর হ দূর হ চোখের সামনে থেকে ।

জানালা খুলে আস্তে আস্তে আরবের সুন্দরী মেয়ে দুটি, ওয়াল্ট ডিজনি, অসকার ওয়াইল্ড চলে গেল । অসকারের নাইটিংগেল গল্পটা বলছে কে যেন । আর কি কেউ ডাকছে—এত রাত হয়ে গেল ? তবু চারকুড়ি দশ বয়স হওয়া গর্তে ঢোকা চোখ নিয়ে বাইরের অন্ধকারে চেয়ে আছেন ঠাকুমা এত রাতে যদি কোন বাচ্চা ঘুম ভেঙ্গে কেঁদে ওঠে ! যদি কেউ ডাকে !

লেখক পরিচিতি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯৩৪। ঢাকা। প্রথম জীবনে শিক্ষকতা। বর্তমানে যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গল্পকার, ঔপন্যাসিক। একাধিক সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। এ যাবৎ প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। ছোটদের জন্য তিনুকাকাকে নিয়ে প্রায় ১৪টি গল্প লিখেছেন।

অজেয় রায় : ১৯৩৭। শান্তিনিকেতন। দুঃসাহসিক অভিযানের ও বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লেখায় পারদর্শী। খেলাধূলা, বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ে চর্চা করেন। ছোটদের উল্লেখযোগ্য বই—আমাজনের গহনে, কেল্লা পাহাড়ের গুপ্তধন, মুঙ্গু ইত্যাদি।

অরূপরতন ঘোষ : ১৯৫৯। উলুবেড়িয়া। নাটক বিষয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক। নানা কাগজে ছোটদের জন্য গল্প, প্রবন্ধ, ফিচার, কবিতা লেখেন। এখনও কোন বই প্রকাশিত হয় নি।

আশাপূর্ণা দেবী : ১৯০৯। কলকাতা। পেশা হিসেবে সাহিত্যচর্চাকে বেছে নিয়েছেন। শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ছোটদের জন্য উল্লেখযোগ্য বই : হত্যারহস্য, রাজকুমারের পোশাকে, গজ উকিলের হত্যারহস্য ইত্যাদি।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী : ১৮৬৩—১৯১৫। ময়মনসিংহ। কবি, গল্পকার, চিত্রশিল্পী, নাট্যকার, প্রবন্ধকার, সঙ্গীতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক। 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। আধুনিক বাঙলা শিশুসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। উল্লেখযোগ্য বই—ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, টুনটুনির বই, সেকালের কথা ইত্যাদি।

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য : ১৯০৯। বরিশাল। বিশিষ্ট অধ্যাপক ও ছাত্রদরদী। 'রামধনু' পত্রিকার সম্পাদক। শিশু-সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শিশু সাহিত্যিক হিসেবে নানা পুরস্কারে ভূষিত। উল্লেখযোগ্য বই : বিজ্ঞানবুড়ো, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, লুপ্তধন, তুষারলোকের রহস্য, আকাশের গল্প, জন্মদিনের উপহার ইত্যাদি।

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯২২। কলকাতা। প্রধানত ছোটদের জন্য লেখেন। উল্লেখযোগ্য বই—ববির বন্ধু, হনুমানুষ, সেই জলছবি ইত্যাদি।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় : ১৮৪৭-১৯১৯। চব্বিশ পরগণা। নানান কর্মে দক্ষতা দেখালেও সাহিত্যিক হিসেবেই তাঁর পরিচয় সমধিক। 'Wealth of India' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার কাজে জড়িত ছিলেন। বাঙলা সাহিত্যে উদ্ভট হাস্যরসের প্রবর্তক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ অনেক : কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, ফোকলা দিগম্বর, মুক্তামালা, মজার গল্প, ডমরু চরিত ইত্যাদি।

দিব্যেন্দু পালিত : ১৯৩৯। বিহারের ভাগলপুর। কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রবন্ধকার। বিপণন, বিজ্ঞাপন, জনসংযোগ বিশেষজ্ঞ এই লেখক বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মূলতঃ প্রাপ্তমনস্কের লেখক। বড়দের জন্য তাই তাঁর অনেক বই প্রকাশ পেলেও ছোটদের এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য বই ইয়ামিন ইয়াসিন।

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯৪০। ভূতাত্ত্বিক। মূলত ছোটদের জন্য লেখেন। সম্প্রতি 'বাঙলার বাতায়ন' সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। প্রকাশিত বই ঃ শিলং পাহাড়ে টিলং, মিঠুয়ার বন্ধু, ডলফিন, অভ্রখনির ভূত, দুর্গপাহাড়ে বন্দী ইত্যাদি।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯৪২। আসানসোল। কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক। ছোটদের সাহিত্য রচনায় বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। একাধিক সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত। কর্মসূত্রে আনন্দমেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বই : হেমন্তের বিষ, আপেল কিংবা ধ্বংসস্তূপ ইত্যাদি।

নলিনী দাশ : ১৯১৬। কলকাতা। 'সন্দেশ'এর অন্যতম সম্পাদক। বেথুন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা। মূলত ছোটদের জন্য লেখেন। উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই : অঞ্জনগড়ের রহস্য, গোয়েন্দা গণ্ডালু, মধ্যরাতের ঘোড়সোয়ার, রা-কা-যে-টে-না-পা

নবনীতা দেব সেন : ১৯৩৮ । কলকাতা । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপিকা । কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক । স্মৃতিচিত্র ও ভ্রমণকাহিনীতেও দক্ষতা দেখিয়েছেন । ছোটদের উল্লেখযোগ্য বই : সমুদ্রে সন্ন্যাসিনী ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : ১৯০৪ বারাণসী । কালি-কলম, বাংলার কথা, বঙ্গবাসী, নবশক্তি, রংমশাল প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ও সহসম্পাদক হিসেবে যুক্ত ছিলেন । কল্লোল-গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক । সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত । গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৭০ । একসময় চলচ্চিত্র পরিচালনা, চিত্রনাট্য রচনা ও প্রযোজনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন । বহু সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে এই প্রবীণ সাহিত্যিককে সম্মান জানানো হয়েছে । ছোটদের উল্লেখযোগ্য বই : ঘনাদার গল্পের নানা সংগ্রহ ছাড়াও ছড়া যায় ছড়িয়ে, ড্রাগনের নিশ্বাস, পিঁপড়ে পুরাণ ইত্যাদি ।

পূর্ণেন্দু পত্রী : ১৯৩৩ । বাগনান । বর্তমানে প্রতিক্ষণ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক । চলচ্চিত্রকার ও চিত্রশিল্পী হিসেবেও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন । বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন এই সাহিত্যিক স্থানীয় ইতিহাস সম্বন্ধেও নিয়ত আগ্রহী । ছোটদের জন্য উল্লেখযোগ্য বই : কলকাতার রাজকাহিনী, কি করে কলকাতা হল, ছড়ায় মোড়া কলকাতা, দাঁড়ের ময়না, ইল্লিবিল্লি ইত্যাদি ।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় : ১৯৩৮ । উত্তর ২৪ পরগণা । সাংবাদিক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক । বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । বড়দের ও ছোটদের লেখাতে সিদ্ধহস্ত । উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই : কায়রোর রহস্য, সুন্দরগড়ের রহস্য, নাগিণীর অভিশাপ, ভূত-অদ্ভূত, বাজপাখির চোখ ইত্যাদি ।

প্রণব সেন : ১৯৫০ । কলকাতা । কবি, অনুবাদক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক । 'মনোভূমি' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক । ছোটদের জন্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'টুবলুর মন ।' ছোটদের লেখার বিষয় হিসেবে শিশু-মনের উপর গুরুত্ব দেন ।

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় : ১৯৫৯ । কলকাতা । পরিচয় ও প্রতিক্ষণ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত । গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক । মূলত বড়দের জন্য লেখেন । কিন্তু ছোটদের বিষয়েও সমান উৎসাহী এবং ছোটদের জন্য বেশ কয়েকটি চমৎকার গল্প লিখেছেন । কোনো বই এখনো প্রকাশিত হয় নি ।

মহাশ্বেতা দেবী : ১৯২৬ । ঢাকা । অধ্যাপিকা । বর্তিকা-র সম্পাদিকা । সামাজিক সমস্যার গবেষক ও **লেখিকা** । অনেক পুরস্কারে ভূষিতা । প্রধানত বড়দের জন্য লেখেন । ছোটদের জন্য উল্লেখযোগ্য বই : সোনা নয় রূপো নয়, বিপন্ন আয়না, ঝাঁসির রানী, রাজা ইত্যাদি ।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার : ১২৭৩-১৩৪৪ । চব্বিশ পরগণা । শিশু-সাহিত্যিক । বাঙলা শিশুসাহিত্য রচনায় পথিকৃতের সম্মান লাভ করেছেন । এদেশে শিশুশিক্ষা শুরু হয়েছে তাঁর রচিত ছড়া 'অজগর আসছে তেড়ে আমটি আমি খাব পেড়ে' দিয়ে । তাঁর সঙ্কলিত 'হাসি ও খেলা' (১৮৯১) গ্রন্থটি বাঙলায় শিশুদের জন্য রচিত প্রথম বই । তাঁর রচিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থ ৩০ । উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ছড়া ও ছবি, রাঙা ছবি, গল্পসঞ্চয়, হিজিবিজি, পশুপক্ষী, বনে জঙ্গলে ইত্যাদি ।

রাধারাণী দেবী : ১৯০৩ । কোচবিহার । এঁর স্বামী নরেন দেব । কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রবন্ধকার । অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন । অপরাজিতা দেবী ছদ্মনাম । উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই : গল্পের আলপনা ।

লীলা মজুমদার : ১৯০৮ । কলকাতা । 'সন্দেশ' পত্রিকার একজন সম্পাদক । বড়দের জন্য ও ছোটদের জন্য গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, জীবনী, নাটিকা রচনা করেছেন । অনেক পুরস্কারে ভূষিতা হয়েছেন । উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই : দিনদুপুরে, পদি পিসির বর্মি বাক্স, জোনাকি, গুপির গুপ্ত খাতা, খেরোর খাতা, ভূতোর ডাইরি, হলদে পাখির পালক ইত্যাদি ।

শিবরাম চক্রবর্তী : ১৯০৫ ?-১৯৮০ মালদহ । ছোটদের জন্য এবং বড়দের জন্য সরস গল্প-উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হয়েছেন । চিন্তাশীল প্রবন্ধ রচনাতেও দক্ষতা দেখিয়েছেন । উল্লেখযোগ্য বই—বাড়ি থেকে পালিয়ে, হাতির সঙ্গে হাতাহাতি, যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন, দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ইত্যাদি ।

শিশিরকুমার মজুমদার : ১৯২৩ । কলকাতা । গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক । প্রধানতঃ ছোটদের জন্য লেখেন । উল্লেখযোগ্য বই—তুফান দরিয়ার পরাণ মাঝি, সিন্ধুতলের সন্ধানী, আকাশে আগুন পাতালে আগুন, দাম্ভোরের ভয়ঙ্কর ইত্যাদি ।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় : ১৯৩৫ । ঢাকা । এ সময়ের উল্লেখযোগ্য গল্পকার, ঔপন্যাসিক, রম্য-রচয়িতা । কর্মসূত্রে আনন্দবাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । বড়দের জন্য অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন । নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন । ছোটদের উল্লেখযোগ্য বই : হেতমপুরের গুপ্তধন, মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি, গৌরের কবচ, নৃসিংহ রহস্য, হারানো কাকাতুয়া ইত্যাদি ।

শেখর বসু : ১৯৪০ । কলকাতা । গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, ছোটদের সাহিত্য রচনায় উল্লেখযোগ্য নাম । একাধিক সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত । উল্লেখযোগ্য বই : ভূতেরা চাউমিন ভালোবাসে, চোর এসে বই পড়েছিল, ভূতেরা মোটেই ভীতু নয়, সাত বিলিতি হেরে গেল, সোনার বিস্কুট ইত্যাদি ।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় : ১৯৪০ । হাওড়া । গল্পকার, ঔপন্যাসিক, কবি, প্রাবন্ধিক । ভ্রমণ বিষয়েও লিখে থাকেন । ছোটদের জন্য লেখা 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' বিখ্যাত ।

সুকুমার রায় : ১৮৮৭-১৯২৩ । কলকাতা । সাহিত্য সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট খ্যাতনামা পরিবারে জন্ম । কাব্য, নাটক, গল্প ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন । গায়ক ও অভিনেতা হিসেবেও দক্ষতা দেখিয়েছেন । কাব্যগ্রন্থ—আবোল তাবোল, খাই খাই । নাটক ৭টি । তার মধ্যে অবাক জলপান, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, চলচ্চিত্ত চঞ্চরি, শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি বিখ্যাত । গল্প সংগ্রহ—হ-য-ব-র-ল, পাগলা দাশু, বহুরূপী । এছাড়াও ইংরেজি ও বাঙলায় প্রবন্ধ লিখেছেন । তাঁর আঁকা ছবিগুলিও কল্পনাশক্তি ও রসিক মনের পরিচয় ।

সতীকান্ত গুহ : ১৯১০ । সুনামগঞ্জ । বিশিষ্ট কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রবন্ধকার । দর্শন বিষয়ে নিয়ত আগ্রহী । একাধিক পুরস্কারে ভূষিত । বড়দের ও ছোটদের লেখায় সমান দক্ষ । ছোটদের জন্য উল্লেখযোগ্য বই : নূতন দিনের রূপকথা, বেনামী নিশান, ইতিহাসে নেই, দূরন্ত কাহিনী, লালকমল নীলকমল ইত্যাদি ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : ১৯১৯ । কৃষ্ণনগর । পরিচয় ও সন্দেশের প্রাক্তন সম্পাদক । বিশিষ্ট কবি, রাজনীতিক ও ভাষাবিদ্ । ছোটদের জন্য বেশি লেখেন নি ।

সমরেশ বসু : ১৯২৪ । ঢাকা । খ্যাতিমান গল্পকার, ঔপন্যাসিক । কবিতাও লেখেন । প্রথম গল্প 'আদাব' এর মধ্যে নিজেকে চিহ্নিত করে নেন । নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন । ছোটদের লেখাতেও সমান সিদ্ধ ।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : ১৯৩০ । মুর্শিদাবাদ জেলার খোশাবামপুর । গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক । একাধিক সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত । উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই : বনের আসর, টোরাদ্বীপের ভয়ঙ্কর, ভয়-ভুতুড়ে, নিঝুম রাতের আতঙ্ক ইত্যাদি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : ১৯৩৪ । ফরিদপুর । কৃত্তিবাস আন্দোলনের প্রধান পুরুষ । বর্তমানে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন । নিজের নামে ছাড়াও সনাতন পাঠক, নীললোহিত, নীল উপাধ্যায় ছদ্মনামে লেখেন । ভারতের প্রায় সবকটি প্রধান ভাষায় এঁর গল্প অনূদিত হয়েছে । নানা পুরস্কারে ভূষিত এই লেখকের গ্রন্থের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে গেছে । ছোটদের উল্লেখযোগ্য বই : সবুজ দ্বীপের রাজা, পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক, ভয়ঙ্কর সুন্দর, ডুংগা, জলদস্যু, আঁধার রাতের অতিথি ইত্যাদি ।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : ১৯৩৬ । বরাহনগর । গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও কবি । সঙ্গীত ও চিত্রকলাতেও দক্ষ । কর্মসূত্রে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । একাধিক পুরস্কারে ভূষিত । উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই : ইতি পলাশ, অ্যাকোরিয়ম, দুই মামা, নবেন্দুর দলবল, কলকাতার নিশাচর, রুকুসুকু ইত্যাদি ।

সুধীন্দ্র সরকার : ১৯৪৮ । খুলনা । কবি, গল্পকার, ছড়াকার । অভিনয়ে ও আবৃত্তিতেও দক্ষ । উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই—টাক-ডুমা-ডুম ।

